ভারতবর্ষের ইতিহাস

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন
পরীক্ষার্থীদিগের জন্য অনুমোদিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক
ডক্টর **শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**, এম. এ., পি. আর. এস., পি-এচ. ডি.
এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক
ডক্টর **শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার**, এম. এ., পি. আর. এস., পি-এচ. ডি.
প্রণীত

বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রলাল সরকার
বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৩৭ দ্বিতীয় সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৩৭
তৃতীয় সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৩৮ চতুর্থ সংস্করণ—জানুয়ারি, ১৯৪০
পঞ্চম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৪০ ষষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩
সপ্তম সংস্করণ—জুন, ১৯৪৫ অষ্টম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭
নবম সংস্করণ—জানুয়ারি, ১৯৫১

মূল্য : তিন টাকা চার আনা মাত্র

মুদ্রাকর শ্রীনলিনীরঞ্জন দাশ
সবিতা প্রেস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধান অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার (Syllabus) অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষা-বোর্ডের নির্দ্ধারিত পাঠ্য বিষয়গুলিও পরিত্যক্ত হয় নাই। ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকখানিতে অনেকগুলি বিশেষভাবে অঙ্কিত মানচিত্র ও বহু ঐতিহাসিক চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক পাত্র ও স্থানের নাম বানান করিতে আমরা প্রচলিত অশুদ্ধ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব শুদ্ধ রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তথ্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ আধুনিক লেখকগণের মতামত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভারতের আধুনিক শাসন পদ্ধতির ক্রমবিকাশের প্রতি আমরা স্বতন্ত্রভাবে ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পুস্তকখানি শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট আশাতীত সমাদর লাভ করায় অল্প সময়ের মধ্যে ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থের আদ্যন্ত সংশোধন এবং নানাস্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইহাকে ছাত্রগণের অধিকতর উপযোগী করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তথাপি আমরা যে সর্ব্ববিধ ভ্রান্তি ও ত্রুটি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছি, এমন ভরসা করি না। আশা করি, সুপণ্ডিত শিক্ষকবর্গ পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন।

কলিকাতা
১০ই জানুয়ারী, ১৯৫১

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

এই পুস্তকের নিম্নলিখিত অংশগুলি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক লিখিত—উপক্রমণিকা, প্রথম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত উড়িষ্যা ও বিজয়নগরের ইতিহাস, অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বিংশ অধ্যায় হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায় এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আধুনিক কালের ইতিহাস। অন্যান্য অংশগুলি শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।

পরিমার্জ্জিত সপ্তম সংস্করণের জন্য অধ্যাপক সরকার গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণ সমূহেও তিনি ইহাকে বারবার সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন।

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

প্রাচীন যুগ

বর্ত্তমান যুগ

পরিশিষ্ট

মানচিত্র

প্রাচীন যুগ

[প্রাচীনতম কাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত]

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা চারিটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—প্রাগৈতিহাসিক যুগ, আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের যুগ এবং হিন্দু জাতির পতনের যুগ।

ভারতবর্ষে মনুষ্যের বসতির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীতে আর্য্য জাতির আগমন পর্য্যন্ত সময়কে আমরা **প্রাগৈতিহাসিক যুগ** (Pre-historic Age) নামে অভিহিত করিতে পারি। এই যুগের ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্প্রতি হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসী প্রাচীন সুমের (Sumerian) জাতির সভ্যতার সহিত ইহার সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ দ্রাবিড় প্রভৃতি কয়েকটি জাতি সুসভ্য ছিল।

আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীতে **আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের যুগ** আরম্ভ হয়। কালক্রমে আর্য্যগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এবং আর্য্য-সভ্যতা দেশের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীন জাতিসমূহের সহিত এবং পারস্যের প্রাচীন আর্য্য অধিবাসিগণের সহিত ভারতীয় আর্য্যদিগের যোগসূত্র বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এই যুগের সভ্যতা ও রীতিনীতির আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে **সাম্রাজ্যবাদের যুগ** আরম্ভ হয়। এই যুগের প্রারম্ভে জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে মগধ রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে। মগধরাজ বিম্বিসার, তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু এবং অজাত-

শক্রর পরবর্ত্তী মগধরাজগণ ক্রমে ক্রমে বহু রাজ্য জয় করিয়া মগধকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন পাটলিপুত্রে এই রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নন্দবংশীয় রাজগণ যখন পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন মগধ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বিপাশা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নন্দরাজগণ দাক্ষিণাত্যেরও কিয়দংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গঙ্গাধৌত আর্য্যাবর্ত্তের জনপদসমূহ যখন একে একে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৮ হইতে ৪৮৬ অব্দের মধ্যে পারস্য দেশের সম্রাট্ কাইরস (Cyrus) এবং ডেরায়স (Darius) সিন্ধু নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পারস্যের রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্ব নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরে গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা মহাবীর আলেক্জাণ্ডার ৩৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পারস্য জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। বিপাশা নদীর পশ্চিম দিকের রাজ্যসমূহ জয় করিয়া আলেক্জাণ্ডার দেশে ফিরিলেন; পথিমধ্যে ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ব্যাবিলনে (Babylon) তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র ভারতীয়গণ মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের নায়কতায় গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব পুনরুদ্ধার করিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকস্ সিরিয়া (Syria) এবং পশ্চিম-এশিয়ার আধিপত্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হন। চন্দ্রগুপ্ত কাবুল অঞ্চলের অধিকার লাভ করেন। এই সময় হইতে পশ্চিম-এশিয়ার গ্রীক্রাজ-গণের সহিত মগধেশ্বরদিগের মিত্রতা স্থাপিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে মহিসূরের দক্ষিণস্থ চারিটি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য্য সম্রাট্গণের অধীন ছিল। অশোক পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা ও ইউরোপের গ্রীক্রাজগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর পূর্ব্ব ও মধ্যভারতে শুঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি বংশ রাজত্ব করিতে থাকে। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের অন্ধ্রজাতীয় শাতবাহনগণ

পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে বাহ্লিক দেশীয় গ্রীক্গণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে এবং পঞ্জাব অঞ্চলে গ্রীক্‌রাজ্য স্থাপিত হয়। গ্রীকগণের পরে ক্রমান্বয়ে মধ্য-এশিয়া হইতে আগত শক (Saka, Scythian) জাতি, খোরাসান অঞ্চলের পারদ (Parthian) জাতি এবং তাহাদের পরে উত্তর-পশ্চিম চীনের য়ুয়েচি (Yuechi) জাতির কুষাণ (Kushana) নামক একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কুষাণ বংশের পরাক্রান্ত নরপতি কণিষ্কের সাম্রাজ্য বারাণসী হইতে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক পেশোয়ারে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি চীনরাজকে পরাজিত করিয়া একজন চীনরাজকুমারকে জামিনস্বরূপ নিজ রাজ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পাটলিপুত্র পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিল। ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্তবংশীয় পাটলিপুত্ররাজগণ নানা রাজ্য জয় করিয়া উত্তর-ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য ছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহ আরব ও ইউরোপীয় বণিক্‌গণের সহিত বাণিজ্যের ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে একজন পাণ্ড্য দেশীয় রাজা রোমসম্রাটের রাজসভায় বাণিজ্যদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দাক্ষিণাত্যের বহু রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং আর্য্যাবর্ত্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপসমূহের অধিপতিরা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ বংশীয় শাহি রাজগণ তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীন দেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে যবদ্বীপ প্রমুখ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) বন্দর হইতে বড় বড় বাণিজ্যপোত সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরান্তবর্ত্তী দেশসমূহে বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিত। পঞ্চম শতাব্দীর অবসানে গুপ্তবংশীয় রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পাটলিপুত্রের প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হূণ নামক বৈদেশিক জাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম

কারণ। এই সময়ে মধ্য-এশিয়া হইতে মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত হূণ অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার ভগিনীপতি মৌখরীবংশীয় গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর ফলে কনৌজ রাজ্যও তাঁহার হস্তগত হয়। হর্ষবর্দ্ধন কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরী উত্তরাপথের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। তিনি পূর্ব্বে বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমে কাঠিয়াবার পর্য্যন্ত নিজ রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষের সময়ে পশ্চিম-বাংলার গৌড় রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের চালুক্য ও পল্লব রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত ছিল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সহায়তায় তিনি গৌড়রাজ শশাঙ্কের উত্তরাধিকারীদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন; কিন্তু মহারাষ্ট্রের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। হর্ষের সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন চীনসম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্যদেশীয় সম্রাটের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, এবং উত্তরাপথের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সময় হইতে **হিন্দুজাতির পতনের যুগ** আরম্ভ হয়; কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। এই সময়ের পরেও ভারতবর্ষে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু মনীষিগণ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুলতান মহ্মুদের আক্রমণের সময় হইতে হিন্দুশক্তির পতনের সূচনা হইল বলা যাইতে পারে।

হর্ষের পরে কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় রাজারা বারবার কনৌজ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর ও কনৌজের রাজগণ তৎকালীন চীন দেশের সম্রাটের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতেন। অতঃপর অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গৌড় ও মগধের পাল, রাজপুতনার গুর্জ্জর-প্রতীহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজারা উত্তর-ভারতের প্রভুত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইলেন। প্রথমে পাল বংশের পরাক্রান্ত রাজা ধর্ম্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া আপনার একজন অনুগত

ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপিত করেন ; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণের শত্রুতায় দীর্ঘকাল তিনি কনৌজ অঞ্চলে আপনার প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অতঃপর গুর্জ্জর-প্রতীহারবংশীয় বীরগণ কনৌজ অধিকার করিলেন। প্রতীহাররাজ ভোজ এবং তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল উত্তর ভারতে বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপালের সময়ে কনৌজ রাজ্য পূর্ব্বে বাংলার উত্তরাংশ হইতে পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহারা পালরাজগণের নিকট হইতে মগধ ও বাংলা অধিকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদিগের প্রভাবে দক্ষিণ দিকে প্রতিহার রাজগণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন নাই। এদিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণ পশ্চিম-এশিয়া, মিশর এবং ইউরোপের অন্তর্গত স্পেন অধিকার করার পর ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সিন্ধুদেশ ও মূলতান অধিকার করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সহিত তাহাদের সদ্ভাব ছিল বটে, কিন্তু কনৌজের প্রতীহারদিগের সহিত তাহাদের মিত্রতা ছিল না। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রতীহার-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল এবং মধ্যপ্রদেশের কলচুরিগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ওদিকে দশম শতাব্দীর শেষদিক হইতে গজ্‌নী রাজ্যের তুর্কিজাতীয় মুসলমান অধিপতিগণের সহিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাহি রাজাদিগের বিবাদ চলিতেছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গজ্‌নীর সুবিখ্যাত সুলতান মহ্‌মুদ আরব মুসলমানগণের মূলতান রাজ্য এবং পঞ্জাবের শাহিরাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি কনৌজ এবং আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েকটি রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। মহ্‌মুদ কেবল বিজিত দেশ ছারখার করিয়া এবং মথুরা, থানেশ্বর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের হিন্দু মন্দিরসমূহ হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘূর রাজ্যের তুর্কিজাতীয় মুসলমান রাজারা গজ্‌নী অধিকার করেন। জনৈক ঘূররাজের ভ্রাতা মুহম্মদ ঘূরী গজনীর শাসক নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ভারতবর্ষস্থিত সুল্‌তান মহ্‌মুদের বংশধরগণের অধিকৃত জনপদসমূহ জয় করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী ও আজমেরের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজকে তরাঈনের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে মুসলমানপ্রাধান্যের সূত্রপাত করেন।

উত্তর-পশ্চিম-ভারত যখন বারবার মুসলমানদিগের আক্রমণে উপদ্রুত হইতেছিল এবং উত্তর ভারত যখন ধীরে ধীরে তুর্কি মুসলমানগণের করতলগত হইতেছিল, দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত রাজগণ তখন কেবল পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া বিব্রত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটদিগের পর কল্যাণীর চালুক্যবংশ মহারাষ্ট্র ও কানাড়া অঞ্চলে পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সুদূর-দক্ষিণের শক্তিশালী চোল সম্রাট্‌গণের সহিত ক্রমাগত বিবাদের ফলে শীঘ্রই তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া তিনটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল—দেবগিরির যাদব রাজ্য, দোরসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য এবং বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য। সুদূর দক্ষিণের চোলরাজগণের মধ্যে প্রথম রাজেন্দ্রচোল মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। সুল্‌তান মহ্‌মুদ যখন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ বিধ্বস্ত করিয়া সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের হিন্দু মন্দির সমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যগণ তখন পূর্ব্বদিকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত জয় করিতেছিল এবং সমুদ্র-পথে ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয়ের কল্পনায় মত্ত ছিল।

মধ্য যুগ

[ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত]

ভারবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসকে আমরা **পাঁচটি** ভাগে বিভক্ত করিতে পারি,—তুর্কিস্থলতানদিগের যুগ, আফ্‌গান সুলতানগণের যুগ, আফ্‌গান-মুঘল সংঘর্ষের যুগ, মুঘল সম্রাটগণের যুগ, এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে মুহম্মদ ঘূরীর জয়লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তুঘ্‌লুকবংশীয় শেষ সুল্‌তান মহ্‌মূদ শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়কে আমরা **তুর্কিস্থল্‌তানগণের যুগ** নামে অভিহিত করিতে পারি। এই যুগে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলে তুর্কী শাসন এবং মুসলমান সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে।

মুহ্‌ম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১২০৬) ভারবর্ষের সহিত গজ্‌নী ও ঘুর রাজ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং দিল্লীতে তুর্কিস্থল্‌তানেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। দাসবংশীয় সুল্‌তানগণ প্রায় ৮৪ বৎসরকাল (১২০৬-৯০) রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য—কুতবউদ্দীন (১২০৬—১০), ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-৩৬) এবং ঘিয়াসউদ্দীন বল্‌বন (১২৬৬-৮৭)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দিল্লীর সুলতানগণের আধিপত্য স্থাপিত হয়; কেবলমাত্র আসাম, কাশ্মীর এবং রাজপুতানার অন্তর্গত কয়েকটি রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

দাস বংশের পতনের পর খল্‌জী বংশ ত্রিশ বৎসর (১২৯০-১৩২০) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলাউদ্দীন খল্‌জীর (১২৯৬-১৩১৬) নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি মুসলমান রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং দেবগিরির যাদবরাজকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার সময়ে গুজরাত দিল্লীর অধীন হয়। তিনি রাজপুতানায় রণথম্ভোর ও চিতোর অধিকার করেন। ইহার

পর তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যে কেবল দিগ্বিজয়ী-রূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি সমগ্র ভারতব্যাপী মহা-সাম্রাজ্যের কঠোর শাসনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং আমীর খুস্রু প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারি-গণের দুর্ব্বলতাবশতঃ সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি ও অবনতি হয়।

অতঃপর দিল্লীতে তুঘ্লুক্ বংশের অধিকার (১৩২০-১৪১৩) স্থাপিত হয়। ঘিয়াস্উদ্দীন তুঘ্লুক (১৩২০-২৫) এবং মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুকের (১৩২৫-৫১) যত্নে কাশ্মীর, রাজপুতানার কিয়দংশ এবং আসাম ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু মুহম্মদের অস্থিরচিত্ততা ও অত্যাচারের ফলে তাঁহার জীবনের শেষভাগে দাক্ষিণাত্য এবং বাংলাদেশ দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে বহ্মনী বংশের মুসলমান রাজ্য এবং বিজয়নগরে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। ফীরুজ শাহ্ (১৩৫১-৮৮) প্রভৃতি মুহম্মদের উত্তরাধিকারি-গণ এই সকল প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দের অধিপতি তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে তুঘ্লুক বংশের ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল। এই প্রসঙ্গে জৌনপুর, বাংলা, মালব ও গুজরাত রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তুঘ্লুকবংশীয় শেষ সুল্তান মহ্মুদ শাহের মৃত্যু হইলে **আফ্গান সুলতানগণের যুগ** (১৪১৩-১৫২৬) আরম্ভ হয়। এই যুগে দিল্লীর সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বাংলা, জৌনপুর, মালব, গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর সুলতানের প্রভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

১৪১৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সৈয়দবংশের চারিজন সুল্তান ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের পতনের পর লোদীবংশীয় তিনজন সুল্তান ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর শাসনভার পরিচালনা করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে জৌনপুর পুনরায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়। বহ্লুল লোদী (১৪৫১-৮৮) এবং সিকন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুল্তান ইব্রাহীম লোদী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে কাবুলের অধিপতি বাবুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ (অর্থাৎ মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুকের শেষজীবন হইতে আকবরের উত্তর-ভারত জয়) পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। দিল্লীর সুল্তানগণের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে বহু স্বাধীন মুসলমান ও হিন্দু রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মালব, গুজরাত, জৌনপুর ও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলেও উহা কখনও দিল্লীর সুল্তানগণের অধীনতা স্বীকার করে নাই। দক্ষিণ ভারতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয় নগরের পতন হয়। ইহার পূর্ব্বেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে বহ্মনী রাজ্য পাঁচটি খণ্ডরাজ্যে পরিণত ইয়াছিল। (১৪৯০-১৫২৭)।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৈমুরবংশীয় বাবুর, হুমায়ূন ও আকবরের সহিত লোদী ও সূরবংশীয় আফগানগণের সংগ্রাম এই যুগের প্রধান ঘটনা। অতএব এই ত্রিশ বৎসরকাল **আফ্গান-মুঘল সংঘর্ষের যুগ** নামে অভিহিত হইতে পারে। বাবুর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন, এবং খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৬) মেবারের পরাক্রান্ত রাণা সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করিয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতে স্বীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ূনের সময় আফগানেরা প্রবল হইয়া উঠে। অবশেষে সূরবংশীয় শের্শাহ্ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন (১৫৪০)। পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর শের শাহের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে হুমায়ূন পারশ্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শের শাহের বংশধরগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তিনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার বালক পুত্র আক্বর (১৫৫৬-১৬০৫) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তখনও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতের কয়েকটি প্রদেশ আফ্গানগণের করতলগত ছিল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফ্গানদিগকে পরাজিত করিয়া আক্বর ও তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁ মুঘল-প্রভুত্বের সূত্রপাত করেন। এই ঘটনার বহুদিন পরে (১৫৭৬) আক্বর আফ্গানদিগকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হইতে ঔরংজীবের মৃত্যু) পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মুঘল-শাসন বদ্ধমূল ছিল ; সেজন্য ইহাকে **মুঘল সম্রাট্‌গণের যুগ** বলা যায়। আক্‌বর সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ (খন্দেশ ও আহ্‌মদনগরে) মুঘল-প্রাধান্য স্থাপন করেন। জহাঙ্গীরও (১৬০৫-২৭) দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহান (১৬২৭-৫৮) আহমদনগর জয় করেন। অবশেষে ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭) দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যসমূহ বিনষ্ট করিয়া কাবেরী নদী পর্য্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। মুঘল সম্রাট্‌গণের সুদৃঢ় শাসনের ফলে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। ফলে শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি এবং সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

ঔরংজীবের রাজত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ধর্ম্মবিষয়ক অনুদারতার ফলে রাজপুত, জাঠ এবং (শিবাজীর নেতৃত্বে) মরাঠাগণ মুঘল প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধ তিনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৭০৭) **মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ** আরম্ভ হইল। রাজপুত, জাঠ ও শিখ জাতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। মারাঠাগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিল ; মারাঠা সৈন্যদল উত্তরে পঞ্জাব ও পূর্ব্বে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অযোধ্যা, বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। ঔরংজীবের দুর্ব্বল বংশধরগণ এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। পারস্যরাজ নাদির শাহ্‌ একবার (১৭৩৯) এবং আফ্‌গানিস্থানের অধিপতি আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্দালী বারবার (১৭৪৮-৬৭) ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিলেন। পঞ্জাব আব্দালীর হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকেরা (ইস্‌ট্‌-ইণ্ডিয়া কোম্পানি) দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল ঘটনার ফলে তথাকথিত মুঘল সম্রাটগণের ক্ষমতার চিহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার ১৪ জন বংশধর সম্রাট্ পদবী উপভোগ করেন ; কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন বদ্ধমূল হয়।

শেষ সম্রাট্ দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্ সিপাহী বিদ্রোহের পর (১৮৫৮) ইংরেজগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

প্রায় ছয় শত বৎসর কাল (১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার পর্য্যন্ত) দিল্লী মুসলমানগণের অধীন ছিল। মুসলমান রাজগণের মধ্যে অধিকাংশই (মুঘল সম্রাট্গণ পর্য্যন্ত) তুর্কিজাতীয় ছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে তুর্কিস্থান, পারস্য, আরব ও আফ্গানিস্থান হইতে বহু মুসলমান রাজকার্য্য প্রাপ্তি বা বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভের আশায় ভারতবর্ষে আগমন করিত। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া দেশ হইতে হাবসি নামে পরিচিত মুসলমানেরাও ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে ও বাংলা দেশে) আসিয়া রাজকার্য্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। এই যুগে মধ্য-এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া এবং লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহের সহিত ভারতবর্ষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বগ্দাদের খলিফাগণ এবং মিশরের সুল্তানেরা মধ্যে মধ্যে ইল্তুৎমিস্, মুহম্মদ বিন্ তুঘলুক প্রভৃতি দিল্লীর সুল্তানদিগের নিকট দূত ও উপহার প্রেরণ করিতেন, এমন কি, ভারতবর্ষের নামে আকৃষ্ট হইয়া আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কো দেশবাসী পর্য্যটক ইবন্ বতুতা মুহম্মদ বিন্ তুঘলুকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চীনদেশের সহিত যে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুহম্মদ বিন্ তুঘলুক ইবন্ বতুতাকে স্বীয় দূতরূপে চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং চীন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই নিজ রাজ্যে তামার নোট প্রচার করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান শাসনের ফলে হিন্দুর সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। বহু হিন্দু নানা কারণে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; যাহারা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই তাহারাও ভাষায়, ভাবে পোষাক-পরিচ্ছেদ ও আচার-ব্যবহারে অনেকটা মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়াছিল। কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত মিলন সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আক্বর স্বয়ং গোবধ নিবারণ এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঐক্য সাধনে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম ও সভ্যতা হিন্দুপ্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। ফার্‌সি ও আর্‌বি শব্দের সহিত হিন্দি ব্যকরণের সম্মিলনের ফলে উর্‌দু ভাষার উৎপত্তি হয়। মুসলমান যুগের শিল্পকলায় হিন্দু-প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। শাসন-কার্য্যে হিন্দুর সহায়তা ব্যতীত মুসলমানদিগের পক্ষে রাজ্যপরিচালনা সম্ভবপর হইত না। মুসলমান লেখকেরা হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত জীবনযাত্রা ও সাধনার ফলে নূতন এক ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ গঠিত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইউরোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া এই জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি নব রূপ ধারণ করে।

বর্ত্তমান যুগ

[অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত]

সম্রাট্ ঔরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন বিরাট্ মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারতে ইংরেজ বণিকের ধীরে ধীরে বাণিজ্য-বিস্তার কাহিনীই বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসের মূল সূত্র।

প্রথমতঃ ফরাসি বণিক্গণের সহিত ইংরেজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় দুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসিরা এবং ক্লাইভের নেতৃত্বের ইংরেজগণ দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইল। তিনটি যুদ্ধের পর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা পারাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এদিকে ক্লাইভের কৃতিত্বে ইংরেজগণ বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং মীর কসিমকে পরাজিত করিয়া (১৭৫৭ এবং ১৭৬৪) বাংলা দেশে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলম কোম্পানিকে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি (অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা) অর্পণ করেন।

বাংলাদেশে ইংরেজদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইলেও চারিদিকে শত্রুর অভাব ছিল না। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ১৭৬১ মারাঠাগণ ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। আবার হায়দর আলি ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র তীপূর নেতৃত্বে মহিসুর রাজ্যে নব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইংরেজগণ তিনটি যুদ্ধের ১৭৭৫-৮২, ১৮০৩-০৫, ১৮১৭-১৯) ফলে মারাঠাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে এবং চারিটি যুদ্ধে (১৭৬৭-৬৯, ১৭৮০-৮৪, ১৭৯০-৯২, ১৭৯৯) মহিষূরের মুসলমান রাজবংশ ধ্বংস করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই অযোধ্যার নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম ও রাজপুত রাজগণ ইংরেজের সহিত অধীনতামুলক মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অতঃপর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে রাজ্যবিস্তার আরম্ভ হয়। রণজিৎসিংহের অধীনে পঞ্জাবের শিখজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রণজিৎ ইংরেজদিগের মিত্র ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর (১৮৩৯) পর দুইটি যুদ্ধের (১৮৪৫-৪৬, ১৮৪৯) ফলে শিখজাতির স্বাধীনতা নষ্ট হয় এবং পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসাম, এবং তিনটি যুদ্ধের (১৮২৪-২৬, ১৮৫২, ১৮৮৫) ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। লর্ড্ ডাল্হোসীর সময় (১৮৪৮-৫৬) বিনা যুদ্ধে অযোধ্যা, সাঁতারা, ঝান্সী, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যে ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা সম্বন্ধে ইংরেজগণকে আফগানিস্থানের সহিত তিনটি যুদ্ধে (১৮৩৯-৪২, ১৮৭৮-৮০, ১৯১৯) লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু ভারবর্ষের ইংরেজ শাসনের ইতিহাস কেবলমাত্র যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী নহে। বাংলাদেশ অধিকার করিয়াই ইংরেজগণ সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস্, লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্, লর্ড্ বেন্টিঙ্ক, লর্ড্ ডাল্হৌসী প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণের নাম ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষ শাসনের ভার সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির হাতে না রাখিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভা ক্রমশঃ স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানির কর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয় (১৮৫৮) এবং ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের সহিত ভারতবর্ষ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সিপাহী বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সামরিক বিদ্রোহ মাত্র; আগ্রা অযোধ্যা অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র ইহার সহিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বেই শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের প্রতি ইংরেজ গভর্ন্মেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সম্পর্কে লর্ড্ বেন্টিঙ্ক ও লর্ড্ ডাল্হৌসির শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় পাশ্চাত্য রীতিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত হইল। লর্ড্ রিপনের সময়ে (১৮৮০-৮৪) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতবাসিগণ নিজের দেশের শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণের দাবি করিল। এই আন্দোলনের পরিচালক হইল কংগ্রেস নামক জাতীয় মহাসভা। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে দেশবাসীর

জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে লাগিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এক সংস্কার আইন দ্বারা জনসাধারণের প্রতিনিধিকে কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক অধিকার প্রদত্ত হইল। ভারতবাসিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এক সংস্কার আইন দ্বারা ভারতবাসিগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হয়। তাহাতেও অসন্তোষের নিবৃত্তি হইল না। অতঃপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন অনুসারে প্রদেশসমূহে আত্মকর্ত্তৃত্ব (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনে বৃটিশ-শাসিত ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্মিলিত করিয়া এক যুক্তরাষ্ট্র (Federation) স্থাপনেরও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নানা কারণে ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল।

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। যুদ্ধান্তে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট্ ভারত সচিব লর্ড্ পেথিক লরেন্স্ প্রমুখ তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী লইয়া গঠিত এক মিশন (Cabinet Mission) ভারতে প্রেরণ করেন। ঐ মন্ত্রিত্রয় এদেশে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট্ কর্ত্তৃক এদেশবাসীর হাতে ভারতের শাসনভার ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনা-সম্বলিত এক রাষ্ট্রীয় দলিল (State Paper) প্রচার করেন। তদনুসারে আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের নায়ক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ভাইস্ প্রেসিডেণ্টরূপে এক অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর মনোনীত শাসনতন্ত্র-পরিষদের (Constituent Assembly) সদস্যগণ ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সমবেত হন। পরে ঐ পরিষদের আলোচনায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গও যোগদান করিবেন এবং ভারতীয়গণের সমবেত চেষ্টায় সমগ্র ভারতের শাসনতন্ত্র (Constitution) রচিত হইবে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় এরূপ ব্যবস্থা থাকে। ইতিমধ্যে ভারতের অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ হইয়া আমেরিকা, প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত রাজদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু মুসলমানেরা ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিমস্থিত মুসলমান অধিবাসিবহুল অঞ্চলগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রলাভের দাবি জানাইতেছিল। কংগ্রেস যখন বুঝিল যে, এই ভাবে ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে দ্বিখণ্ডিত

করিতে স্বীকার না করিলে দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, তখন অগত্যা ইহাতে রাজী হইল। অতঃপর বৃটিশকর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্থান নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইল এবং ভারতীয়গণের হস্তে উহার শাসনভার অর্পিত হইল। সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ব্ববাংলা এবং শ্রীহট্ট নবীন মুস্লিম রাষ্ট্র পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহাতে খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ক্ষীণ হইল সন্দেহ নাই; কিন্তু নবীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অগণিত দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হওয়ায় এই ক্ষতির কিছু পূরণ হইল এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইল। ভারতের শেষ বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড্ মাউণ্ট্ব্যাটেনের পর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যটেল যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধান মন্ত্রীরূপে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সর্দ্দারজীর অক্লান্ত চেষ্টায় দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণরাষ্ট্রে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয় বিগত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫০) এই কর্ম্মবীর পরলোকগমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র পরিষদে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রচিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত একটি স্বশাসক গণরাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হইইয়াছে। এখন হইতে বৃটেনের রাজা ও পার্লামেণ্টের ভারত শাসনে আর কোন কর্ত্তৃত্ব রহিলনা।

ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ নানা বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারার সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারে নাই। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি সংকীর্ণ ও অনুদার রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইংরেজ জাতির শাসনাধীন হইয়া ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিয়া স্বীয় প্রাচীন সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই বাসনা সফল হইয়াছে। এইবার ভারত বিশ্বে আপনার যোগ্য স্থান লাভ করিবে এবং ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হইবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

উপক্রমণিকা

প্রাকৃতিক ভূগোল ও তাহার প্রভাব

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব—ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার একটি আদি পীঠস্থান। পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশে সুপ্রাচীন যুগে সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। আধুনিক কালে ইংরেজ প্রভৃতি যে সমস্ত সভ্যতাভিমানী জাতি পরাক্রান্ত হইয়া জগতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ যখন সভ্যতার আলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল, তখনও আমাদের দেশ জ্ঞানগরিমায় সভ্যতার একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। বিশ্ব-সংস্কৃতির কেন্দ্র

'ভারতবর্ষ' নামের উৎপত্তি—পৌরাণিক কিংবদন্তী মতে অতি প্রাচীনকালে ভরত নামে একজন বিখ্যাত নরপতি আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহারই নাম অনুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। রাজা ভরত

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ধৌত করিয়া সুবিশাল সিন্ধুনদ প্রবাহিত; আর্য্যগণ এই সিন্ধু-বিধৌত প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্যদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ সিন্ধুকে 'হিন্দু' রূপে উচ্চারণ করিতেন। গ্রীক ও রোমান লেখকগণের উচ্চারণে আবার 'হিন্দু' শব্দটি 'ইন্দুস্' (Indus) রূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহা হইতেই আমাদের দেশের **'হিন্দুস্থান'** এবং **'ইণ্ডিয়া'** (অর্থাৎ সিন্ধু-বিধৌত দেশ)—এই দুইটি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। নাম দুইটী মূলতঃ সিন্ধুতীরবর্ত্তী দেশকে বুঝাইত। কালক্রমে উহা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রযুক্ত হয়। পশ্চিম-দেশীয় প্রতিবেশিগণের নিকট এই দেশের অধিবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইয়াছিল। সিন্ধু ও হিন্দু

প্রাকৃতিক পরিচয়—ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। আয়তনের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা আয়তন ও জনসংখ্যা

এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার আয়তন রাশিয়া ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান, এবং, জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।*

সীমা

ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তে সুবিশাল হিমালয় পর্ব্বতমালা প্রাচীরের ন্যায় কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিমেও হিমালয়েরই শাখা-পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর বিশাল পরিখার ন্যায় এই দেশের তিন দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণ ভারত

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী এবং উহার শাখা-পর্ব্বত-সমূহ বিস্তৃত। উহা দেশটিকে উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকের অংশকে সাধারণতঃ **আর্য্যাবর্ত্ত** বা **উত্তরাপথ** বলা হইয়া থাকে; ইহার দক্ষিণ দিকের অংশ **দাক্ষিণাত্য** বা **দক্ষিণাপথ** নামে পরিচিত। দাক্ষিণাপথ একটি বিস্তীর্ণ ত্রিভুজাকৃতি মালভূমি। এই মালভূমিতে নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বদিকে সুদীর্ঘ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণী। ঐতিহাসিক আলোচনার সুবিধার জন্য পণ্ডিতগণ এই দক্ষিণ ভারতকে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে অংশ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, উহা অনেক সময় **সুদূর-দক্ষিণ** নামে অভিহিত হয়।

হিন্দু ও মুসলমান

অধিবাসী ও ভাষা—বিশালকায় নদীসমূহ এবং সমুচ্চ পর্ব্বতমালা প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অভাব নাই; কিন্তু উহাই এদেশের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। ইহার অধিবাসিগণ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তন্মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের সংখ্যাই

---

* সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে এই দেশটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং ভারত ও পাকিস্থান নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালীন ইতিহাসের আলোচনায় এই দেশবিভাগের কোন গুরুত্ব নাই। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আধুনিক কালের বিবরণ প্রসঙ্গে এই রাজনৈতিক বিভাগের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অধিক। সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু। হিন্দুগণ বহু-সংখ্যক জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আবার বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে ভাষা ও আচারগত পার্থক্যও বড় কম নহে। উত্তর ভারতে প্রচলিত বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষা মূলতঃ আর্য্যভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু, কানাড়ি প্রভৃতি দ্রাবিড় জাতীয় ভাষার সহিত সংস্কৃতের ব্যাকরণগত কোন সাদৃশ্য নাই। আবার সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি অসভ্য জাতিগুলির ভাষা আর্য্যভাষা এবং দ্রাবিড় ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান যে ভাষায় কথা বলে, উহার নাম উর্দু; উহাকে আরবি এবং ফারসি শব্দবহুল একপ্রকার হিন্দি-ভাষা বলা যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় এত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং সভ্যতার সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরের এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক অপর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর্য্য ও অনার্য্য ভাষা

উর্দু

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাকৃতিক প্রভাব—ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা এই দেশের ইতিহাস এবং দেশবাসীর স্বভাব গঠন বিষয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতবর্ষ সমুদ্র ও পর্ব্বত দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন; তাই এই দেশের সমাজ এবং সভ্যতা অন্য দেশের সংস্কৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া একটি বিশিষ্ট আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জগতের কোন দেশের সমাজনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ভারতের বিস্তীর্ণ সমতল-ক্ষেত্রে শস্যাদি মনুষ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে উৎপাদিত হয়। কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, হীরকাদিও এ দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দেশের এই সমৃদ্ধি অধিবাসিগণের সহজ জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল হওয়ায় তাহারা শিল্প ও কাব্য-দর্শনাদির চর্চ্চায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের অসামান্য উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

অকঠোর জীবন যাত্রা

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সমুদ্র বা পর্ব্বত কোনটাই ভারতবর্ষকে বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য করিতে পারে নাই। ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সমৃদ্ধ বন্দরসমূহ প্রাচীনকালেই বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ইউরোপীয় ও আরব বণিকগণ সমুদ্র পথে ভারতে

বাণিজ্য করিতে আসিত। সমুদ্রপথেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং হিন্দুচীনে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভারতীয় ভাবধারার বিস্তারের কাহিনীও উল্লেখযোগ্য। আবার ভারতের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া বিদেশীয় আক্রমণকারিগণ বহুবার স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে গিরিশ্রেণীর মধ্যে স্থানে স্থানে অপ্রশস্ত গিরিপথসমূহ রহিয়াছে। বিদেশী আক্রমণকারিগণের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম গিরিপথগুলি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে; সহজ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত শান্তিপ্রিয় ভারতবাসিগণ প্রায় কখনই তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্ক

ভারতবর্ষের আয়তন অতি বিশাল। এদেশে নদী এবং পর্ব্বতের সংখ্যাও কম নহে। এই সকল বাধার জন্য প্রাচীন ও মধ্য যুগে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ মিলিত হইয়া একতাবদ্ধ এক মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সমগ্র দেশটিকে স্থায়িভাবে এক রাজশক্তির অধীনে আনয়নের চেষ্টা প্রায়ই সফল হয় নাই। অতীতকালে অশোক, আলাউদ্দীন খল্‌জী, মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লক্, ঔরংজীব প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণ প্রায় সমগ্র দেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কিছুদিন পরেই দেশটি পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশের শক্তি ক্ষীণ এবং শান্তি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। একতার অভাবে ভারতীয় রাজগণ বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই।

জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধক

মূলগত একতা—ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার অন্তরালে আবার একটি আভ্যন্তরীণ একতার ভাবও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিমাচল এবং সমুদ্র দ্বারা সীমাবদ্ধ এই দেশটিকে একটিমাত্র অখণ্ড দেশরূপে কল্পনা করা হইত। পরাক্রান্ত নৃপতিগণ এই সমগ্র দেশের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইবার স্বপ্ন দেখিতেন। অশ্বমেধ প্রভৃতি

ভৌগোলিক একতা

দিগ্বিজয়মূলক যজ্ঞাদিও এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য এবং ভৌগোলিক একতার আদর্শ প্রচার করিত। বর্ত্তমান সময়েও দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু; বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর প্রতি, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মবীর এবং রাষ্ট্রবীরগণের প্রতি এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বারাণসী প্রভৃতি প্রধান তীর্থসমূহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দু নর-নারী একই উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া থাকে। এদেশে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সকল প্রদেশের সুশিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে সংস্কৃত সাধারণ-ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইত। আজিও ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সমাদর আছে। হিন্দুর পরে ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক। ইহাদের ব্যবহৃত উর্দুভাষা এবং হিন্দি ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য নাই। বহুদিন একত্র বাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সাংস্কৃতিক প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য আদিম অধিবাসিগণও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেবদেবী

সংস্কৃত ভাষা

ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার একটি প্রাচীন কেন্দ্র। ভারতের বেদ মনুষ্যজাতির অন্যতম সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম এশিয়ার নানা দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রাচীন জগতে ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের অসামান্য সমাদর ও প্রভাব দেখা যায়। রাজর্ষি অশোকের ন্যায় পূতচরিত্র নরপতি জগতের ইতিহাসে বিরল। প্রাচীন ভারতের পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পল্লীগ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা আজিও ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়োদ্রেক করে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দান অসামান্য। ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। উহা উপেক্ষার বস্তু নহে।

Model Questions

1. Estimate the influence of the physical features of India on the character and political destiny of the Indian people.
2. What do you know about the fundamental unity linking together different peoples of India ?

প্রথম অধ্যায়

আদিমকালের বিবরণ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ—ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্যের একটি প্রধান কারণ এই যে, বহু জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি এই দেশে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাবধারা কালক্রমে ভারতবর্ষের সম্পদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীর উদারতার ফলে এই দেশে বিভিন্ন সভ্যতা ও আদর্শের মিলন সাধিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র

ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিদেশাগত জাতির সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলন এবং এই মূলগত ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন,
> শক-হূণ-দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।
> ... ...
> রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে
> ভেদি' মরুপথ গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
> তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
> আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তা'র বিচিত্র সুর।"

আদিমযুগের অসভ্য জাতিসমূহ—অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ নিবিড় বনরাজিতে পূর্ণ ছিল। এই সকল অরণ্যে বন্য জন্তুর ন্যায় একপ্রকার অসভ্য মানুষ বাস করিত। ইহাদিগকে **প্রত্নপ্রস্তর যুগের মনুষ্য** (Palæolithic Man) বলা হইয়া থাকে। ইহারা সম্পূর্ণরূপে সভ্যতাবর্জ্জিত ছিল। প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অরণ্যচারী বন্য পশু বধ করিয়া উহাদের কাঁচা মাংসে ইহারা উদরপূরণ করিত।

ইহাদের পরবর্ত্তী যুগের অধিবাসিগণ **নব্যপ্রস্তর যুগের মনুষ্য** (Neolithic Man) নামে পরিচিত। ইহারা প্রস্তরের অস্ত্রগুলিকে মসৃণ ও তীক্ষ্ণ করিয়া লইত এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন ও অগ্নিদ্বারা

রন্ধন করিবার কৌশল অবগত ছিল। ইহারা মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিত এবং মৃতের জন্য প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সমাধি নির্ম্মাণ করিত। সুতরাং দেখা যায়, প্রত্নপ্রস্তর যুগের অধিবাসিগণ অপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতি এই নব্যপ্রস্তর যুগের প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতীয় আদিম অধিবাসিগণের (Proto-Australoids বা Austro Asiatics) বংশধর। নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা

সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন সময়ে অনেক জাতি স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তের পর্ব্বতপথে একটি মোঙ্গোলীয় বন্য জাতি আসিয়াছিল; এই জাতি **তিব্বত-ব্রহ্ম** (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসী লেপ্‌চা, ভুটিয়া, নাগা, খাসি প্রভৃতি জাতি ইহাদের বংশধর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ দিয়াও কতিপয় অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল।

দ্রাবিড় জাতি—এই সকল জাতির পরে যাহারা ভারতে আগমন করে, তাহারা দ্রাবিড়, (বা দ্রবিড়, Dravidian) নামে পরিচিত। দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ পশ্চিম-এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। এই দ্রাবিড় জাতি এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী হইয়াছিল। ইহারা নগর বা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে এবং জলপথে বিচরণ করিবার উদ্দেশ্যে নৌকা প্রস্তুত করিতে জানিত। কালক্রমে ইহারা সাহিত্যচর্চ্চা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে পারদর্শিতা লাভ করে। দ্রাবিড়গণ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাহারা উপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিত এবং নানা দেবতা ও উপদেবতার পূজা করিত। বর্ত্তমানে দক্ষিণ-ভারতের যে সকল অধিবাসী তামিল, তেলুগু, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশ দ্রাবিড় জাতির বংশধর। দ্রাবিড় সংস্কৃতি

সিন্ধুবিধৌত দেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা—আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে এতদিন আমরা প্রায় কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত **মোহেঞ্জোদড়ো** এবং পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী **হরপ্পা** নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে

প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র



মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত
শীলমোহর—বৃষমূর্ত্তি

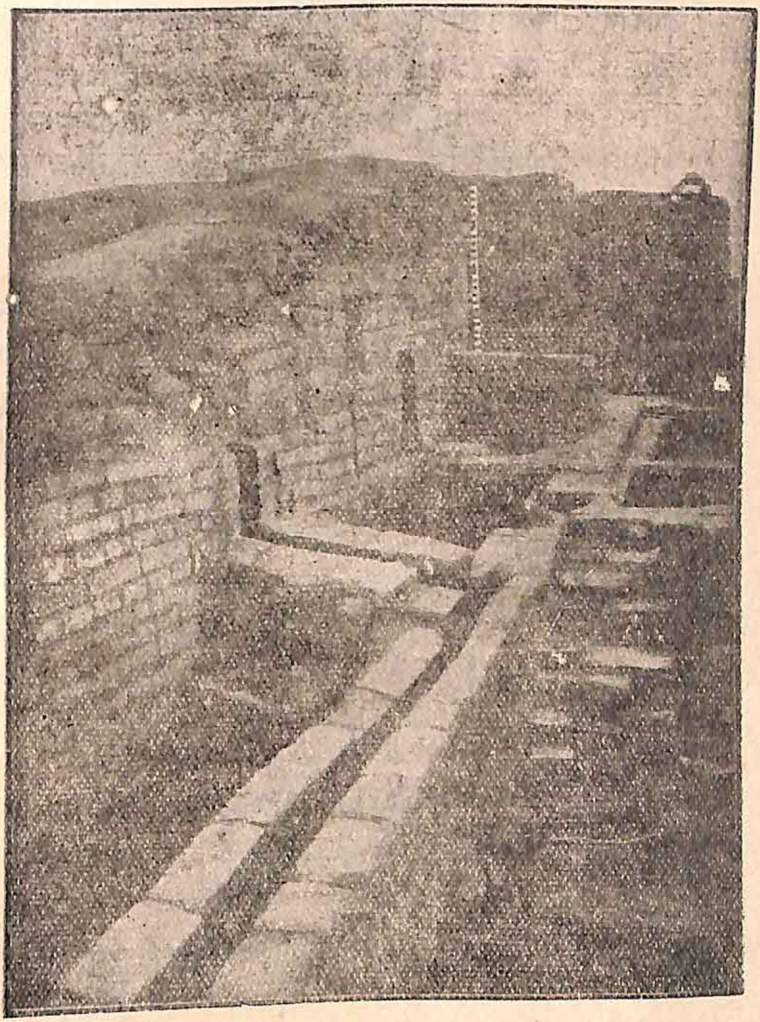
বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বেও সিন্ধু উপত্যকায় অত্যুন্নত সভ্যতার অধিকারী এক জাতি বাস করিত। তাহারা পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার প্রভৃতি সমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ সেই সুপ্রাচীন যুগেও লিখিতে এবং নানা জীবজন্তুর অত্যুৎকৃষ্ট আলেখ্য প্রস্তুত করিতে জানিত। সে সময়ের অনেক সুচিত্রিত মৃত্তিকাপাত্র, অলঙ্কার এবং চিত্রলিপিসম্বলিত কতকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এই গুলিতে বৃষাদি পশুর প্রতিকৃতিসমূহ এমন জীবন্ত যে, আমরা সে যুগের ভারতীয় শিল্পিগণের অসামান্য দক্ষতার কথা ভাবিয়া অবাক্ হই। এই যুগের সিন্ধুবাসিগণ লৌহের ব্যবহার জানিত না, কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করিত। তাহাদের সমাজে শিব, জগন্মাতা ও বৃক্ষদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। তাহারা মৃতদেহ ভস্ম করিবার এবং উহার দগ্ধ অস্থিখণ্ড মৃৎপাত্রে বা ইষ্টকাধারে রক্ষা করিবার প্রথা অবগত ছিল। পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসী প্রাচীন সুমের জাতির সভ্যতার (Sumerian Civilisation) সহিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার সংযোগ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দ্রাবিড়গণই সিন্ধুপ্রদেশের এই প্রাচীন সভ্যতার জন্মদাতা। এতদিন মিশর, সুমের এবং চীনকে মানবসভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইত। এখন ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বের এই উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে, ভারতবর্ষও বিশ্ব সভ্যতার একটি সুপ্রাচীন কেন্দ্র।

সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতি

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

দ্রাবিড়গণের পরবর্ত্তী বৈদেশিক জাতিসমূহ—দ্রাবিড় জাতির পরে **আর্য্য** নামে পরিচিত একটি সভ্য জাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া



মহেঞ্জোদড়ো—পয়ঃপ্রণালী

ভারতবর্ষে আগমন করে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকগণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ জয় করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল **গ্রীক**রাজগণ রাজত্ব করেন। ইহাদের পরে **শক**, **কুষাণ**, **হূণ** প্রভৃতি মধ্য-এশিয়াবাসী যাযাবর জাতিসমূহ দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। পারস্যদেশ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণের অধীন হইলে কতিপয় **পারসিক** স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিম ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে; ইহাদের বংশধরগণ অধুনা এদেশে পার্সী নামে পরিচিত। অতঃপর ভারতের পশ্চিমদিকস্থ তুর্কিস্থান, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশসমূহ মুসলমানগণের দ্বারা বিজিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। মুসলমানেরা পরে ভারতবর্ষও জয় করিয়াছিল। তখন নানাদেশের নানাজাতীয় **মুসলমান** ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মুসলমান-গণের রাষ্ট্রীয় অবনতির যুগে অপর একটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করে; ইহারা ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত **ইংরেজ** জাতি। সম্প্রতি ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে।

ভারত সমাজের অন্তর্লীন বিদেশী জাতি

উত্তরকালীন বৈদেশিকগণ

Model Questions

1. Give an account of the Non-Aryan peoples of ancient India.

2. What do you know about the Dravidians ?

3. Write what you know about the pre-historic civilisation of the Indus Valley.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগের বিবরণ

আর্য্যজাতির ভারতে আগমন—দ্রাবিড় জাতির পরে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা কোন্ দেশে বাস করিতেন, তাহা আজিও স্থিররূপে নির্ণীত হয় নাই। বিভিন্ন পণ্ডিত মধ্য বা পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর মেরু, মধ্য-ইউরোপ এবং রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলকে আর্য্যজাতির পিতৃভূমি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা যে এক সময়ে পশ্চিম-এশিয়ায় মেসোপোটেমিয়ার নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালক্রমে তাঁহারা দলে দলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন। আর্য্যজাতির কয়েকটি শাখা প্রাচীনকালে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ; ইহারাই গ্রীক, রোমান, ইংরেজ, ফরাসি, জার্ম্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষ। এই জাতির অপর একটি বৃহৎ দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং কালে উহার একাংশ পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ দলের অপরাংশ অগ্রসর হইতে হইতে উত্তর-পশ্চিম গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারাই ভারতের হিন্দু সভ্যতার জনক। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে হিন্দু, পারসিক এবং পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ একই দেশে বাস করিতেন এবং একই ভাষায় কথা বলিতেন। কোন্ সময়ে ইহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা যে খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আর্য্যগণের আদিবাসস্থান

ভারতে আর্য্য

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য্য উপনিবেশ—আর্য্যগণ প্রথমে সরস্বতী, সিন্ধু এবং উহার উপনদীসমূহের সলিলসিক্ত প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন

করেন। এই প্রদেশকে তাঁহারা **সপ্তসিন্ধু** বলিতেন; ইহাই প্রাচীন পারসিকগণের বর্ণিত 'হপ্তহিন্দু'। এই দেশের কৃষ্ণবর্ণ এবং চেপ্টানাসিকা-বিশিষ্ট আদিম অধিবাসিগণ পরাজিত হইয়া আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং অনেকে পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ইহারা আর্য্যগণের নিকট **দস্যু** বা **দাস** নামে পরিচিত ছিল। পরে ইহাদিগকে **অনার্য্য** বলা হইত। ইহাদের অধিকাংশ দ্রাবিড় ও প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতীয় ছিল। ইহারা আর্য্যগণের উপাস্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত না এবং যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন উপস্থিত করিত; কিন্তু ইহারা সকলেই অসভ্য ছিল না। কোন কোন অনার্য্যজাতি উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল।

অনার্য্যগণের পরাজয়

সেকালে ভারতীয় আর্য্যগণ যদু, ভরত প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত ছিলেন। তাঁহারা কোন একটি সার্ব্বভৌম রাজশক্তির অধীন ছিলেন না। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা আদিম অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত। তাঁহারা মাটিতে দাঁড়াইয়া অথবা রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। তীর, ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি সেকালের আর্য্যগণের যুদ্ধাস্ত্র ছিল।

আর্য্যগণের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন আর্য্যসাহিত্য—আর্য্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের নাম **বেদ**। 'বেদ' শব্দটীর অর্থ জ্ঞান। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, বৈদিক মন্ত্রগুলি অপৌরুষেয় (অর্থাৎ ভগবানের বাণী, কোন মানুষের দ্বারা রচিত নহে)। বেদের অপর নাম **শ্রুতি** (অর্থাৎ শ্রুত বাণী)। বেদমন্ত্র **ঋক্, যজুঃ, সাম** এবং **অথর্ব্ব** এই চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদের আবার দুইটি ভাগ আছে—**সংহিতা** ও **ব্রাহ্মণ**। বেদের সংহিতা ভাগ পদ্যে এবং ব্রাহ্মণাংশ গদ্যে লিখিত। **আরণ্যক** এবং **উপনিষদ্** সমূহ ব্রাহ্মণ বিভাগের অন্তর্গত।

বেদের বিভাগ

বেদের সংহিতাগুলির মধ্যে ঋক্ সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত স্তবস্তুতি এবং নানাবিষয়ক প্রার্থনাসম্বলিত কতকগুলি মন্ত্র বা কবিতার সমষ্টি। সামবেদের মন্ত্রগুলি সঙ্গীতরূপে গীত হইত। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ঋক্ সংহিতা হইতে গৃহীত। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য বহুসংখ্যক মন্ত্র আছে। অথর্ব্ব-

বৈদিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বেদ প্রধানতঃ কতকগুলি ভৌতিক এবং আভিচারিক মন্ত্রের সংগ্রহ। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকগুলি যাগযজ্ঞ এবং ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় পরিপূর্ণ। উপনিষদ্-সমূহে পরমাত্মা সম্পর্কে অনেক গভীর তত্ত্বের আলোচনা আছে।

বেদের পরবর্তী সাহিত্য

বেদ বা শ্রুতির পরে **সূত্র** নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের **ষড়্‌দর্শন** এবং বেদাঙ্গগুলি এই সূত্র সাহিত্যের অন্তর্গত। **সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব-মীমাংসা** এবং **উত্তর-মীমাংসা** বা **বেদান্ত**—হিন্দু দর্শন এই ছয় ভাগে বিভক্ত। কপিল **সাংখ্যের,** পতঞ্জলি **যোগের,** গৌতম **ন্যায়ের,** কণাদ **বৈশেষিকের,** জৈমিনি **পূর্ব্ব-মীমাংসার** এবং ব্যাস **উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের** প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত আছে। শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ এবং কল্প (ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিধান)—এই ছয়টী বিষয় **বেদাঙ্গ** নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে এই সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ (অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা), স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও প্রাচীন আর্য্যগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যের কাল

আর্য্যগণের প্রাচীন গ্রন্থগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋক্ সংহিতা আনুমানিক ১২০০-১০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ, অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ১০০০-৮০০ খৃঃ পূঃ, উপনিষদ্ ৮০০-৬০০ খৃঃ পূঃ এবং সূত্রগ্রন্থগুলি ৬০০-২০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।

বৈদিক দেবতা

আর্য্যগণের ধর্ম্ম—আর্য্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাঁহাদের মনে ভয় বা বিস্ময়ের উদয় হইত, সেগুলিকেই তাঁহারা দেবতারূপে কল্পনা করিতেন। তাঁহারা সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ (অর্থাৎ বায়ু), উষা, পৃথিবী প্রভৃতিকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিতেন। আর্য্যগণের নিকট অনন্ত আকাশ ছিল দেবতা **দ্যৌঃ**; এই দেবতাই প্রাচীন গ্রীকগণের উপাস্য জিউস (Zeus) এবং রোমানদিগের জুপিটার (Jupiter)। নক্ষত্রখচিত আকাশের দেবতা **বরুণ** আর্য্যগণের প্রধান দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ছিলেন **ইন্দ্র**; পরে ইনি দেবতাগণের মধ্যে প্রধানরূপে কল্পিত হন।

আর্য্যগণ বহুসংখ্যক দেবদেবীর উপাসনা করিতেন; কিন্তু তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন দেবতা একই মহাশক্তির বিকাশমাত্র। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য বস্তু—এই ধারণা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈদিক যুগের শেষ দিকে আর্য্যগণ কর্ম্মফল এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। প্রথমে উপাসনার প্রণালী সরল ছিল। আর্য্য উপাসক নিজেই স্তব পাঠ করিতে করিতে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে খাদ্য ও পানীয় আহুতি দিতেন। কিন্তু পরে নানা বিধানের ফলে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা জটিল হইয়া উঠিল। তখন ঐ সকল বিধি-বিধানে পারদর্শী **পুরোহিত** নামক একটি যাজক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

আর্য্য ধর্ম্মের ক্রমবিবর্ত্তন

৶ আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থা—বৈদিক যুগের আর্য্যগণ দুগ্ধ, ফল, শাক-সব্জী এবং মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। সোমলতার রস এবং সুরা নামক দুইটী মাদক পানীয়ও তাঁহাদের প্রিয় ছিল। তাঁহারা নৃত্য-গীত, মৃগয়া এবং পাশা খেলায় যোগদান করিয়া অবসর বিনোদন করিতেন। নীবি (কটীবাস), পরিধান (পরিধেয় বস্ত্র) এবং অধিবাস (উত্তরীয়)—এই ত্রিবিধ বস্ত্রে তাঁহারা দেহাবরণ করিতেন। এই সকল বস্ত্র পশম দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আর্য্য নরনারীগণ নানাবিধ অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিতেন।

অশন বসন

বৈদিক সমাজে স্ত্রীজাতির বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেন; এমন কি, কোন কোন আর্য্য নারী বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। নারীগণ গৃহকর্ম্ম করিতেন এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল।

স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা

কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন প্রাচীন আর্য্যগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল। তাঁহারা নৌকা নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন এবং বোধ হয় জলপথে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহারা এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন। সম্ভবতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যে মুদ্রাও ব্যবহৃত হইত। আর্য্যগণ বয়নশিল্প, দারুশিল্প, ধাতুশিল্প এবং চর্ম্মশিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

কৃষি ও বাণিজ্য

প্রাচীন আর্য্য সমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় **চতুর্ব্বর্ণ**। প্রাচীনতম বৈদিক সমাজে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না তখন কেবল গৌরবর্ণ আর্য্য এবং কৃষ্ণবর্ণ দাস—এই দুইটি জাতি ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজে লোকদিগের অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ বা শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। যাগযজ্ঞের বিধান জটিল এবং সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা এই সকল বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া যজ্ঞাদি সম্পাদনে পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা পৌরোহিত্যকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে **ব্রাহ্মণ** শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। আদিম অধিবাসীদিগের অধিকার হইতে নূতন নূতন স্থান কাড়িয়া লওয়া এবং তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশশাসন অপর দলের কার্য্য হইল। এইরূপে **ক্ষত্রিয়** নামক বর্ণ গড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরাপর আর্য্যগণ কৃষি, শিল্প, পশুপালন এবং বাণিজ্যকে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইঁহারা **বৈশ্য** নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। দাসগণের মধ্যে যাহারা আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা **শূদ্র** নামে পরিচিত হইল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা করাই তাহাদের কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথমে জাতিভেদ কঠোর ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আপন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেন; পরস্পর বিবাহ এবং পান-ভোজন নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই জাতিভেদের কঠোরতা বাড়িতে লাগিল। অসবর্ণ বিবাহের ফলে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া গেল; কিন্তু ব্যবসায় অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী বিভাগের জন্য জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অল্পাধিক আর্য্য ভাবাপন্ন নানা অনার্য্য উপজাতি নির্দ্দিষ্ট জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

বর্ণভেদ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র

জাতিভেদের কঠোরতা

আর্য্যগণের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল **চতুরাশ্রম**। তাঁহাদের জীবন **ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ,** এবং **সন্ন্যাস** (যতি বা ভৈক্ষ্য)—এই চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আর্য্য শিক্ষার্থিগণ গুরুগৃহে থাকিয়া সংযম, সদাচার ও বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা গৃহে ফিরিতেন এবং

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য

গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহিত গৃহস্থজীবন যাপন করিতেন। গৃহস্থের কর্ত্তব্যপূর্ণ জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। বানপ্রস্থাশ্রমে বনে কুটীর বাঁধিয়া তাঁহারা তপস্বীর ন্যায় দিনযাপন করিতেন। সন্ন্যাসাশ্রমে আর্য্যগণ সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কেবল মুক্তির চিন্তায় জীবনের অন্তিম দিনগুলি অতিবাহিত করিতেন। অবশ্য সকলের পক্ষে সবগুলি আশ্রম অবলম্বন করা সম্ভব হইত না।

আর্য্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও শাসন পদ্ধতি—পূর্ব্বে আর্য্যগণ অনেকটা যাযাবর-প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহারা স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। পারিবারিক জীবনই বৈদিক আর্য্যগণের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের মূল। কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গ্রাম এবং কয়েকটি গ্রাম হইয়া একটি **বিশ্** বা **জন** গঠিত হইত। গ্রামের নায়ক **গ্রামণী** এবং বিশের নায়ক বিশ্‌পতি বা **রাজা** আখ্যা পাইতেন। প্রাচীন যুগে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল; তাঁহাকে **সভা** ও **সমিতি** নামক জনসাধারণের দুইটি প্রতিষ্ঠানের মতানুসারে চলিতে হইত। কালক্রমে রাজার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। বৈদিক যুগের শেষদিকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে পরাক্রান্ত রাজার প্রতিবেশী রাজগণের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইবার প্রয়াস পাইতেন। একচ্ছত্র সম্রাট হইবার বাসনায় রাজারা অনেক সময় অশ্বমেধ প্রভৃতি দিগ্বিজয়মূলক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। এই যুগে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না থাকিলেও, সাধারণতঃ তাঁহারা স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণ তাহা লঙ্ঘন করিতেন না।

পরিবার ও বিশ

সভা ও সমিতি

রাজা ও সম্রাট

Model Questions

1. What do you know about the civilisation of the Vedic Aryans.

2. Write notes on (i) the four Varnas and (ii) the four Asramas.

3. Give an account of the society, relig ion and administration of the Vedic Aryans.

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-বৈদিক যুগ ও পরবর্ত্তী কালের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার ও বিকাশ

উত্তর-ভারতে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার—ঋগ্বেদের সময়েই আর্য্য জাতির কোন কোন শাখা পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা নদী এবং বোধহয় সরযু নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বিদেহ (অর্থাৎ বিহারের উত্তরাংশ) পর্য্যন্ত আর্য্য উপনিবেশ বিস্তৃত হয়। দিল্লী-মীরাট অঞ্চলে আর্য্য জাতির কুরুনামক শাখা কুরুরাজ্য স্থাপন করিল। পঞ্চালগণ রোহিলখণ্ড অঞ্চলে, মৎস্যেরা জয়পুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানে, শূরসেনগণ মথুরায়, কোশলেরা অযোধ্যায়, কাশীগণ বারাণসীতে এবং বিদেহজাতি ত্রিহুতে রাজ্য স্থাপন করে। ইহার পরে অঙ্গ ও মগধে (অর্থাৎ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বিহারে) এবং তাহারও পরে বাংলাদেশে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হয়। পূর্ব্বসীমান্তস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ (বর্ত্তমান আসাম) দেশও শীঘ্রই আর্য্য-সভ্যতায় প্রভাবিত হইল। মনুসংহিতার সময় হিমালয়, বিন্ধ্য, পূর্ব্বসাগর (বঙ্গোপসাগর) এবং পশ্চিমসাগর (আরব সাগর)—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত (অর্থাৎ আর্য্যগণের দেশ) বলা হইত।

মধ্যদেশ

পূর্ব্ব-ভারত

দক্ষিণ-ভারতে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার—বৈদিক যুগের শেষদিকে আর্য্যজাতির নানা শাখা বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সাত্বতগণ আধুনিক বেরার অঞ্চলে বিদর্ভ রাজ্য এবং নাসিক অঞ্চলে দণ্ডক রাজ্য স্থাপন করে। পরে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গোদাবরীর নিকটে ইক্ষাকুগণ কর্ত্তৃক অশ্মক ও মূলক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র দক্ষিণভারতে আর্য্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিতে বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল। এই স্থানে দ্রাবিড়জাতি বহুদিন পর্য্যন্ত আপনাদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়। দক্ষিণাপথে আর্য্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার পর আদিম অধিবাসিগণ আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল

মহারাষ্ট্র

দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সংস্কৃতি

বটে, কিন্তু আজিও প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির নানা চিহ্ন ঐস্থান হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। উত্তর-ভারতে যেমন আর্য্যসভ্যতা প্রাচীন অনার্য্যগণের ভাষা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, দক্ষিণ-ভারতে সেরূপ করিতে পারে নাই।

মহাভারত ও রামায়ণ—বৈদিক যুগে রচিত গ্রন্থাদিতে ইতিহাস, পুরাণ, উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী কালের 'মহাকাব্য' (epic) ও পুরাণসমূহ সূচিত হইয়াছিল। মহাভারত এবং রামায়ণ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের দুইটি বিশাল গৌরবস্তম্ভ। এই দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

মহাভারত—এই গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচীন ভারতবংশের কৌরবশাখা এবং উহার পাণ্ডব উপশাখার মধ্যে গৃহবিবাদের কাহিনী লইয়া লিখিত। হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার পিতৃব্য পাণ্ডুর পুত্রগণকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করেন। পাণ্ডবেরা পঞ্চাল, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজগণের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। ইহার ফলে বিখ্যাত **কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ** সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দুর্য্যোধন পরাজিত ও নিহত হন এবং পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী ব্যতীত দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতির বহুসংখ্যক উপাদেয় উপাখ্যান আছে। ভগবদ্গীতার ন্যায় অনেক উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক রচনাও মহাভারতের অঙ্গে গ্রথিত আছে। বস্তুতঃ মহাভারতের ন্যায় বিরাট এবং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বিষয় সমন্বিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পৃথিবীর আর কোন ভাষাতে নাই।

কৌরব ও পাণ্ডব

রামায়ণ—এই সুমধুর গ্রন্থখানি আদিকবি বাল্মীকির রচিত। ইহার নায়ক অযোধ্যার কোশলবংশীয় রাজপুত্র রাম, এবং নায়িকা তাঁহার পত্নী বিদেহরাজদুহিতা সীতা। পিতার সত্যপালনের জন্য বনবাসী হইয়া রাম পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্য-মধ্যবর্ত্তী গোদাবরী-তীরস্থিত পঞ্চবটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে লঙ্কার অনার্য্য

রামায়ণ কাহিনী

রাজা কর্তৃক সীতা অপহৃতা হন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য রাম কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যের বানর নামক অনার্য্য জাতির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করেন। ফলে রাবণ পরাজিত ও নিহত হন। রামায়ণের কাহিনী হইতে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের প্রাথমিক ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায়।

হিন্দুগণের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যে এই দুই **'মহাকাব্যের' প্রভাব** অসামান্য। রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণকে হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজা করেন। এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত পূতচরিত্র নরনারী চিরকাল হিন্দুসমাজের আদর্শ। কালিদাস প্রমুখ পরবর্ত্তী যুগের কবিগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশেরই আখ্যানভাগ এই দুই 'মহাকাব্য' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম

বুদ্ধের জন্ম	...	আনুমানিক	৫৬৩ খৃঃ পূঃ
মহাবীরের মৃত্যু	...	"	৪৯৮ খৃঃ পূঃ
বুদ্ধের মৃত্যু	...	"	৪৮৩ খৃঃ পূঃ

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের নীরস অনুষ্ঠান, পশুবধ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা এবং জাতিভেদের কঠোরতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। ইহার ফলে দেশের নানাস্থানে বৈদিকধর্ম্মবিরোধী অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পূর্ব্ব-ভারতের জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

মহাবীর—পণ্ডিতগণের মতে জৈনধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তকের নাম **পার্শ্বনাথ**। জৈনগণ ইঁহাকে তাঁহাদের ত্রয়োবিংশ 'তীর্থঙ্কর' (অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষ) বলেন। জীবহিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা এবং পরদ্রব্য গ্রহণ না করাই পার্শ্বের উপদেশের সার ছিল।

কিন্তু জৈনধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক ছিলেন চতুর্ব্বিংশ ও সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর **মহাবীর** বা **বর্দ্ধমান**। উত্তর-বিহারে বৈশালীর নিকটে জ্ঞাতৃক

নামক এক ক্ষত্রিয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ত্রী, একমাত্র কন্যা এবং পরিজনগণের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।



বর্দ্ধমান মহাবীর
(পরবর্ত্তী কালের কল্পিত মূর্ত্তি)

জিন ও জৈন

অতঃপর তিনি দ্বাদশবৎসরব্যাপী কঠোর সাধনা ও ধ্যানের ফলে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া 'জিন' (অর্থাৎ জয়ী) এবং 'মহাবীর' নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার অনুগামিগণ 'নিগ্রন্থ' (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত) এবং 'জৈন' (অর্থাৎ জিনের মতাবলম্বী) নামে পরিচিত হইলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্দ্ধমান প্রাণত্যাগ করেন।

জৈনধর্ম্মমত—মহাবীর জৈনসন্ন্যাসীদিগের দিগম্বর (অর্থাৎ উলঙ্গ) থাকিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ইহা হইতেই জৈন সম্প্রদায় 'শ্বেতাম্বর'

এবং 'দিগম্বর' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার সময়ে পার্শ্বনাথ-প্রবর্ত্তিত চারিটি নিয়মের সহিত যে একটী নিয়ম যুক্ত হয় উহা জিতেন্দ্রিয় থাকিবার সঙ্কল্প বিষয়ক। জৈনগণ বেদের প্রামাণ্যে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কঠোর সাধনার ফলে যাঁহারা জিনত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জৈনেরা দেবতা মনে করেন। তাঁহারা যাগযজ্ঞ এবং পশুবলিকে ঘৃণা করেন। অহিংসা, সর্ব্বজীবে দয়া এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন জৈনমতে পুণ্যার্জ্জনের উপায়। জৈনগণ বেদ এবং পরব্রহ্মে বিশ্বাসী না হইলেও ধর্ম্মকার্য্যে অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেন; কতিপয় প্রধান হিন্দু দেবতাকেও তাঁহারা ভক্তি করিয়া থাকেন। অহিংসা

বুদ্ধ—প্রায় মহাবীরের সমকালেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক **গৌতম** (বা **সিদ্ধার্থ**) বর্ত্তমান নেপালের দক্ষিণাংশে অবস্থিত প্রাচীন কপিলবস্তু নগরে শাক্যনামক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির একজন নায়ক ছিলেন। সিদ্ধার্থ শৈশবে মাতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীলতা এবং সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্য তাঁহার স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহাকে সংসারধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য শুদ্ধোদন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রের ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গোপা বা যশোধরা নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। একদিন সিদ্ধার্থ একজন জরাতুর বৃদ্ধ, জনৈক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, একটি শবদেহ, এবং এক প্রফুল্লকান্তি সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিলেন। সংসার যে অনিত্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সংসারের মায়া ক্রমেই তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবে, এই ভয়ে একদিন রাত্রিতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া শান্তিলাভের আশায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। তিনি একাধিক গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুজনিত দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় মিলিল না। অবশেষে গয়ার নিকটবর্ত্তী (আধুনিক ফল্গু-লীলাজন) নদীতীরে বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া সিদ্ধার্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এইবার তিনি জীবনের দুঃখরাশির কবল হইতে মুক্তি বা

বাল্য ও যৌবন

সংসার ত্যাগ

বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ

নির্ব্বাণ লাভের পথ আবিষ্কার করিলেন এবং **বুদ্ধ** (অর্থাৎ জ্ঞানী) নামে বিখ্যাত হইলেন। কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে তিনি প্রথমে নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৮০ বৎসর



বুদ্ধ

বুদ্ধের জীবনকালে তাঁহার কোন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই। তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণের বহুকাল পরে দেবতারূপে বুদ্ধের মূর্ত্তি পূজার প্রথা প্রচলিত হয়। তখন নানারূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল।

বয়সে বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কুশীনগর আধুনিক কাসিয়া) নামক স্থানে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মমত—বুদ্ধ বেদের অবিসংবাদিতা এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করিতেন না। কঠোর তপশ্চর্য্যার প্রতিও তাঁহার আস্থা ছিল না। তিনি জন্মগত জাতিভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের স্বকৃত কর্ম্মই তাহার ভাগ্য গঠিত করে; সংকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে পরিণামে মুক্তি বা **নির্ব্বাণ** লাভ করিতে পারে। নির্ব্বাণের পর আর পুনরায় জন্মগ্রহণের দুঃখভোগ করিতে হয় না। নির্ব্বাণ লাভের জন্য ঈশ্বর বা দেবদেবীর উপাসনা অনাবশ্যক। তিনি সংকর্ম্ম, সত্যবাক্য, সংসঙ্কল্প, সংচেষ্টা, সংভাবে জীবনযাপন এইগুলিকে নির্ব্বাণ লাভের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মূল সূত্র। কিন্তু অহিংসানীতি জৈনগণ যতটা কঠোরতার সহিত পালন করিতেন, বৌদ্ধেরা সেরূপ করিতেন না। **মুক্তির উপায়**

*বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ **সূত্র** (বুদ্ধের বাক্য ও কার্য্যাবলী), **বিনয়** (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের পালনার্থ অনুশাসনাবলী) এবং **অভিধর্ম্ম** (দার্শনিক তত্ত্বালোচনা)—এই **ত্রিপিটকে** (অর্থাৎ তিনটি পেটিকা বা ভাগে) বিভক্ত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সেকালের সাধারণ লোকের বোধগম্য পালি ভাষায় লিখিত।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য এবং পরিণাম—এই উভয় ধর্ম্মেরই মূলসূত্রগুলি হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্মের নিবৃত্তিমার্গ, কর্ম্মফল এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বেদের প্রমাণ্য, যাগযজ্ঞ এবং পশুবলির প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। আত্মা এবং ঈশ্বরের প্রশ্নও তাঁহারা এড়াইয়া চলিতেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই জাতিভেদের বিরোধী; কিন্তু জাতিভেদের প্রতি বিতৃষ্ণা জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মে অধিক তীব্র। উভয় ধর্ম্মই অহিংসায় বিশ্বাসী; তবে জৈনেরা বৌদ্ধগণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কঠোরতার সহিত অহিংসা-ব্রত পালন করেন। জৈনদিগের উলঙ্গ থাকিবার প্রথা এবং কঠোর তপশ্চর্য্যা বৌদ্ধেরা সমর্থন করেন না। **বৌদ্ধ ও জৈন মত**

হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা জৈনধর্ম্মের সাদৃশ্য বেশী। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু ধর্ম্ম কিংবা অপর কোন ধর্ম্মমতের সহিত জৈনধর্ম্ম কঠোর প্রতি-

যোগিতায় দণ্ডায়মান হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে, ভারতের বাহিরে প্রচার লাভ না করিলেও, জৈনধর্ম্ম আজও ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে। অপর দিকে, বুদ্ধের মৃত্যুর বহুদিন পরে অশোক প্রভৃতি পরাক্রান্ত নরপতির পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যেন দিগ্বিজয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ইহা এশিয়ার অনেক স্থলে, এমন কি ইউরোপ এবং আফ্রিকার কোন কোন স্থানে, প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরে বৌদ্ধগণের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইলে উহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের বেশী পার্থক্য রহিল না। অবশেষে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করিয়া লইল। তান্ত্রিক মতের প্রাধান্য লাভের ফলে আদিম বৌদ্ধমতের বিশুদ্ধতা রহিল না। ইহার উপর আবার লিঙ্গায়ৎ, শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, অনেক পরাক্রান্ত রাজবংশ কর্ত্তৃক পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নবাগত মুসলমান বিজেতৃগণের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ—এই সকল কারণে ভারতবর্ষ হইতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু আজিও চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত এবং সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিবর্ত্তন

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

বুদ্ধের যুগে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে ষোলটি বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ ষোলটি বৃহৎ রাষ্ট্র ইতিহাসে **ষোড়শ মহাজনপদ** নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। **গণ বা সংঘ** সংজ্ঞক রাষ্ট্রগুলিতে রাজা থাকিতেন না; প্রজাদের প্রতিনিধিরাই নায়করূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সে যুগে উত্তর-বিহারের বৃজি, লিচ্ছবি প্রমুখ জাতির **বৈশালী** রাষ্ট্রই গণতন্ত্রশাসিত জনপদসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। কুশীনগরের মল্ল এবং কপিলবস্তুর শাক্যগণের জনপদেও গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল।

গণরাষ্ট্র

রাজার অধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে **অবন্তি** (মালব), **বৎস** (এলাহাবাদ),

কোশল (অযোধ্যা) এবং **মগধ** (দক্ষিণ-বিহার) ক্রমে ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অবন্তির রাজা **প্রদ্যোত**, বৎসের রাজা **উদয়ন**, কোশলের রাজা **প্রসেনজিৎ** এবং মগধের রাজা **বিম্বিসার** বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। কাশী এবং শাক্যরাজ্য জয় করিয়া কোশলরাজ আপন রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে মগধ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

মগধের ক্রমোন্নতি—জরাসন্ধ নামে প্রাচীন মগধের একজন পরাক্রান্ত সম্রাটের বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার কাহিনী কতদূর ঐতিহাসিক তাহা বলা যায় না। বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সময় হইতেই মগধরাজ্যের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছিল। বিম্বিসার অঙ্গ (পূর্ব্ব-বিহার) অধিকার করিয়া মগধকে কোশলের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বিসারের বংশকে **হর্য্যঙ্ক**কুল বলা হইয়াছে। হর্য্যঙ্ক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি হরি (অর্থাৎ নাগ) বংশীয় ছিলেন।

বিম্বিসারের অঙ্গবিজয়

কথিত আছে, বৃদ্ধবয়সে বিম্বিসার তাঁহার পুত্র রাজ্যলোভী **অজাতশত্রু** কর্ত্তৃক নিহত হন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত অজাতশত্রুর যুদ্ধ হইয়াছিল। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়; কোশলরাজ অজাতশত্রুর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সময় হইতে মগধের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। এদিকে অজাতশত্রু বৈশালী রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করিলেন। এই বিশাল রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ (বর্ত্তমান রাজগির) পরিত্যাগ করিয়া অজাতশত্রুর পুত্র **উদয়ী** উত্তরদিকে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে (বর্ত্তমান পাটনার নিকটে) **পাটলীপুত্র** বা কুসুমপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রুর বৈশালী-জয়

নন্দবংশ—অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী যুগে মগধের ইতিহাস পরিষ্কাররূপে জানা যায় না। তবে শিশুনাগ ও অন্যান্য মগধরাজগণ যে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া মগধের আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে **মহাপদ্ম নন্দ** নামে একব্যক্তি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পশ্চিম দিকে

নন্দ সাম্রাজ্য

বিপাশা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করিয়া 'একরাট্' (অর্থাৎ একচ্ছত্র সম্রাট্) হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশও নন্দগণের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহাপদ্মের পর তাঁহার আটজন পুত্র রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে শেষ রাজার নাম **ধননন্দ**। ধননন্দের বিরাট্ সৈন্যদলে দুই লক্ষ পদাতিক, বিশ হাজার অশ্ব, চারি হাজার হস্তী এবং দুই হাজার রথ ছিল। ইঁহারই সময়ে গ্রীস দেশের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা **আলেক্‌জাণ্ডার** উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বৈদেশিক আক্রমণ

আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ৩২৭-২৪ খ্রীঃ পূঃ

কাইরস ও ডেরায়সের ভারত আক্রমণ—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্য দেশের সম্রাট্ কাইরস (Cyrus) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ সেকালে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিছুকাল পরে পারস্য-সম্রাট্ ডেরায়স (Darius) পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী ভূভাগ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। সেই সময় হইতে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ পারস্য-সম্রাটের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের দ্বারা শাসিত হইত।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক শাসন

আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ—ডেরায়সের সময়ের প্রায় দুইশত বৎসর পরে পারস্য সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে গ্রীকগণ পারস্য অধিকার করে। ম্যাসিডনের বিখ্যাত রাজা আলেক্‌জাণ্ডার প্রথমে সমগ্র গ্রীস পদানত করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং পারস্য-সম্রাট্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেন।

পারস্য বিজয়

অতঃপর পারসিকগণের দ্বারা বিজিত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পারস্যের অবনতির সুযোগে

উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ প্রায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার কাবুল নদীর উত্তরদিক্স্থিত পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে বর্ত্তমান রাবলপিণ্ডির নিকট অবস্থিত তক্ষশিলা রাজ্যের রাজা **অম্ভী** বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর আলেক্জাণ্ডার ঝেলম নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ঝেলমের পূর্ব্বতীরে জনৈক পুরুবংশীয় নরপতির (Porus) সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। **পুরুরাজ** ঝেলম ও চেনাবের মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আলেক্জাণ্ডার

পঞ্জাব বিজয়



আলেক্জাণ্ডার

তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?" পুরুরাজ সগর্ব্বে উত্তর দিলেন "রাজার মত।" আলেক্জাণ্ডার বন্দীর এই আত্মসম্মানবোধ লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুরুরাজকে মুক্তি দিয়া স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পুরুর বীরত্ব

ইহার পরে আলেক্‌জাণ্ডার বিপাশা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। বিপাশার পূর্ব্বদিকস্থিত গঙ্গা-যমুনার সলিলসিক্ত ভূখণ্ড তাঁহার জয় করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্যগণ আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে রাজি হইল না। বিপাশা অতিক্রম করিয়া পরাক্রান্ত নন্দ রাজার বিপুল বাহিনীর সহিত বল পরীক্ষা করিলে গ্রীকগণ বিজয়ী হইতে পারিত কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, অগত্যা আলেক্‌জাণ্ডার বিপাশা-তীর

ভারত ত্যাগ

হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হন। অবশেষে তিনি সিন্ধুনদের মোহনায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে ৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে একদল সৈন্যকে সমুদ্রপথে পারস্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্যসহ স্বয়ং বেলুচিস্থানের মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার স্বদেশে পৌছিতে পারেন নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকবিজিত রাজ্যগুলি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিল এবং গ্রীক-রাজপুরুষগণকে পশ্চিম দিকে বিতাড়িত করিয়া দিল।

আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের ফল—আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসিগণের অনেক দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার ফলে গ্রীকসভ্যতার সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ইহাতে এদেশ হইতে ইউরোপে যাতায়াতের পথ

ভারত ও ইউরোপ

সুগম হইল। গ্রীক আক্রমণের আঘাতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ শক্তিহীন হইয়া পড়াতে মৌর্য্যগণের পক্ষে ঐগুলিকে অধিকারভুক্ত করিয়া

রাষ্ট্রীয় একতা

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা সম্পাদন সহজ হইয়াছিল। আবার এই সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ইহার কিছুকাল পরে বাহ্লিকদেশ (Bactria) হইতে আগত গ্রীকগণ পঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ভাস্কর্য্য, জ্যোতিষশাস্ত্র,

গ্রীক প্রভাব

মুদ্রা প্রভৃতিতে এই গ্রীকগণের যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফলরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

Model Questions

1. Give an account of Aryan expansion over northern and southern India.

2. What is the importance of the two great epics of ancient India ?

3. Write what you know about (1) Gautama Buddha ; (2) Vardhamana Mahavira.

4. What were the teachings of the founders of Jainism and Buddhism ?

5. Wherein does Buddhism differ from Jainism and Hinduism ? What were the causes of the decline of Buddhism in India ?

6. Sketch the gradual expansion of Magadha.

7. Write notes on : (1) Darius ; (2) Porus.

8. Give an account of Alexander's invasion of India. What were the results of the invasion ?

———

চতুর্থ অধ্যায়

মৌর্য্য সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ—মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত

(আনুমানিক ৩২১-২৯৭ খৃঃ পূঃ)

বংশ পরিচয়—আলেক্‌জাণ্ডারের বিজিত রাজ্যাংশ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে যে গ্রীকগণ অবস্থান করিতেছিল, **চন্দ্রগুপ্ত** নামক এক বীরপুরুষ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশেরই সন্তান ; তাঁহার মাতা মুরার নাম হইতে তদীয় বংশের নাম **মৌর্য্য বংশ** হইয়াছে। কিন্তু একথা সত্য নহে। প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে পিপ্পলীবন নামক স্থানে মৌর্য্যসংজ্ঞক একটি ক্ষত্রিয়বংশ ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ঐ বংশের সন্তান। পিপ্পলীবনের মৌর্য্য

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য—আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিবামাত্র আনুমানিক ৩২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। তিনি **চাণক্য** বা **কৌটিল্য** নামক কুটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তায় নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্য স্থাপন

সাম্রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি **সেলিউকস** (Seleucus) পশ্চিমএশিয়ার গ্রীক-অধিকৃত জনপদসমূহের অধিকারী হন। তিনি পঞ্জাব পুনরধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং উহার নিকটবর্ত্তী গ্রীক রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশের (বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কিয়দংশ) দাবী পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন এবং **মেগাস্থিনিস** (Megasthenes) নামক একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মগধ সাম্রাজ্য পূর্ব্বে বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ দক্ষিণে সুদূর মহিশূর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত শেষজীবনে জৈনমত অনুসরণ পূর্ব্বক মহিশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

সেলিউকসের পরাজয়

সাম্রাজ্যের সীমা

মৃত্যু

চন্দ্রগুপ্তের শাসন —চন্দ্রগুপ্ত যে কেবল একজন অদ্ভুতকর্ম্মা যোদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহা নহে; রাজ্য পরিচালনেও তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁহার সাফল্যের মূলে ছিল তদীয় মন্ত্রী মহাজ্ঞানী চাণক্যের মন্ত্রণা। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-পদ্ধতি ও তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থও এ বিষয়ে আলোকপাত করে।

***মেগাস্থিনিসের বিবরণ**—বহুদিন মৌর্য্যরাজসভায় কাটাইয়া গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস সে যুগের ভারতীয় সমাজ ও শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন। উহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে ভারতবর্ষে দার্শনিক (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধাচার্য্য), কৃষক, পশুপালক ও শিকারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, পর্য্যবেক্ষক এবং অমাত্য—এই সাত শ্রেণীর লোক বাস করিত। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল এবং জীবনযাত্রা সরল ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না; ধনরত্নের প্রাচুর্য্য

দেশের অবস্থা

ছিল। অধিবাসিগণ উত্তম বস্ত্র এবং অলঙ্কার পরিতে ভালবাসিত। তাহারা সৎস্বভাবাপন্ন ও সত্যবাদী ছিল। যজ্ঞকাল ভিন্ন অন্য সময়ে কেহ মদ্যপান করিত না। চৌর্য্য এবং দাসত্বপ্রথা একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল।

রাজধানী পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই প্রাচীর-পিরখা-বেষ্টিত বিরাট নগর কিঞ্চিদধিক নয় মাইল দীর্ঘ ও দেড় মাইল প্রশস্ত ছিল। রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। নগর-প্রাচীরে ৫৭০টি স্তম্ভ এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। রাজধানীর শাসন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার ত্রিশজন সদস্য দ্বারা গঠিত একটি পৌরসভার উপর ন্যস্ত ছিল। এই পৌরসভা আবার পাঁচজন করিয়া সদস্য দ্বারা গঠিত ছয়টি কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে কোন সমিতি রাজধানীর জন্মমৃত্যু, লোকসংখ্যা প্রভৃতির বিবরণ রাখিত; কোনটি বৈদেশিকগণের তত্ত্বাবধান করিত; কোনটি ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিত। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করাইয়া ইহারা এক দশমাংশ শুল্ক আদায় করিয়া লইত।

রাজধানী

পৌরসভা

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলার ভার কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে অর্পিত ছিল। তাঁহারা ভূমিজরিপ, জলসেচন, রাজস্বসংগ্রহ এবং রাস্তা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে পঞ্জাবপর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাস্তার স্থানে-স্থানে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন থাকিত। আইনের বিধান অতি কঠোর ছিল। গুরুতর অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। দেশের অবস্থা রাজ-কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালী এবং প্রজার মনোভাব রাজাকে জানাইবার জন্য রাজার বহুসংখ্যক গুপ্তচর দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। মোটের উপর, চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে প্রজাগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাইত।

আভ্যন্তরীণ শাসন

ত্রিশজন সদস্য দ্বারা গঠিত অপর একটি সভার হস্তে রাজার বিরাট্ সৈন্যদলের শৃঙ্খলারক্ষা ও পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল। এই সভাও পাঁচজন করিয়া সদস্যদ্বারা গঠিত ছয়টি কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এই সমিতিগুলির উপর যথাক্রমে রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী এই পাঁচটি সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধান এবং রসদ যানবাহন প্রভৃতি

সেনা বিভাগ

সংগ্রহের ভার ন্যস্ত থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদলে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী এবং বহুসংখ্যক রথ ছিল। একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে একটি বিরাট্ নৌবহর ছিল। রাজকোষ হইতে সমুদয় সৈন্যের বেতন দেওয়া হইত।

অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক রাজনীতিবিষয়ক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ সেকালে ভারতবর্ষে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র নামক একখানি প্রাচীন রাজনীতি-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; অনেকে মনে করেন, কৌটিল্যই ইহার রচয়িতা। অনেকে আবার এই গ্রন্থখানিকে চন্দ্রগুপ্তের সময়ের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, ঠিক মৌর্য্য যুগের হউক বা না হউক এই গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং রাজ্য-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণের ন্যায় অর্থশাস্ত্রে সুশৃঙ্খল শাসন-পদ্ধতির উল্লেখ আছে। **মহামাত্য** ও **অমাত্য** উপাধিধারী মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া রাজা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। অকস্মাৎ কোন জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইলে **মন্ত্রিপরিষদ্** নামক একটি পরামর্শসভা রাজাকে মন্ত্রণা প্রদান করিত। **বলাধ্যক্ষ** নামক রাজপুরুষ সমর-বিভাগ পরিচালনা করিতেন। নগরের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার **নগরাধ্যক্ষ** নামক কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব আদায়ের এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রাম শাসনের সুব্যবস্থা ছিল। রাজার বহুসংখ্যক গুপ্তচর এবং স্ত্রী-প্রহরী থাকিত। সেকালে রাজকার্য্য তকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের রাজগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে হইলে যে সকল নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা কৌটিল্য লিখিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের মতে, রাজস্ব গ্রহণের বিনিময়ে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ন্যায় প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই রাজার কর্ত্তব্য। সেকালে রাজা প্রজাগণের মতামত মান্য করিয়া চলিতেন।

প্রাচীন ভারতের রাজ্য-শাসন-প্রণালী

বিন্দুসার

চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র **বিন্দুসার অমিত্রঘাত** সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পশ্চিম-এশিয়া এবং মিশরের গ্রীক রাজগণের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অশোক

আনুমানিক ২৭৩-৩২ খৃঃ পূঃ

রাজ্যলাভ—বিন্দুসারের মৃত্যুর পর আনুমানিক ২৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার ভুবনবিখ্যাত পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কলিঙ্গ জয়—রাজত্বের প্রারম্ভে অশোক বর্ত্তমান উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হন। তুমুল সংগ্রামে সহস্র সহস্র বীরের প্রাণনাশ করিয়া অশোক কলিঙ্গ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে অজস্র রক্তপাত এবং হত্যাকাণ্ডের মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় শোকে ও অনুতাপে অভিভূত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতঃপর আর অস্ত্রবলে কোন দেশ অধিকার করিবেন না; দেশ জয় করিতে হইলে **ধর্ম্মবিজয়** (অর্থাৎ প্রেম, অহিংসা এবং ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা সেই দেশের অধিবাসীদের হৃদয় জয়) করিবেন।

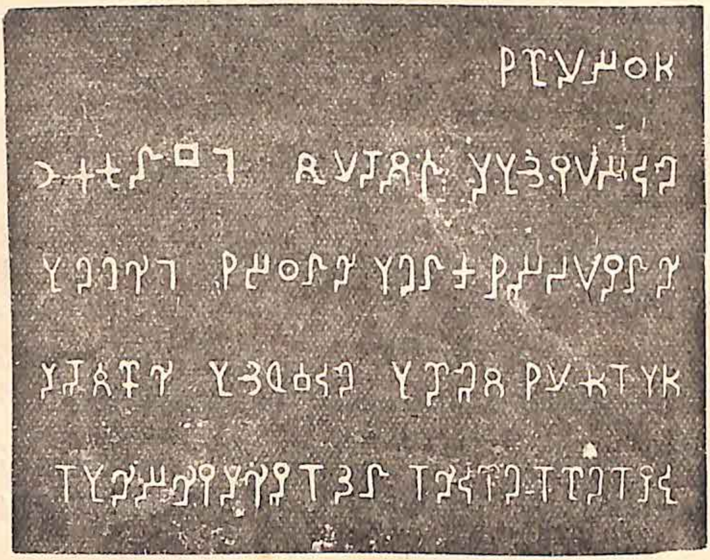
দেশ জয় পরিত্যাগ

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার—কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে যখন অশোকের মনে অহিংসা-ভাব প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময়ে উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন হইতে বুদ্ধের বাণী দেশে দেশে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। দীক্ষার পরে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশভ্রমণ এবং তীর্থস্থান দর্শন করিতে বাহির হইলেন। অশোক রাজকীয় রন্ধন-শালায় সহস্র সহস্র পশুপক্ষী বধের প্রাচীন ব্যবস্থা রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র অনর্থক প্রাণি-হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন না; দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যে এবং পশ্চিমে সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের গ্রীকরাজ্যসমূহে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার কন্যা

প্রাণিহত্যা নিষেধ

বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মপ্রচার

সংঘমিত্রা এবং পুত্র (বা ভ্রাতা) **মহেন্দ্র** পর্য্যন্ত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। নিজ রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার এবং প্রজাগণের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অশোক **ধর্ম্মমহামাত্র** নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে



রুম্মিনদেঈতে অবস্থিত অশোকস্তম্ভের লিপি

ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে পর্ব্বত এবং প্রস্তরস্তম্ভের গায়ে অশোক সহজ ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক **ধর্ম্মলিপি** উৎকীর্ণ করিয়া দিলেন। প্রজাগণ যাহাতে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে, মনুষ্য এবং সমস্ত জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করে, সত্যবাদী এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তজ্জন্য এই সকল ধর্ম্মলিপিতে বহুসংখ্যক উপদেশ লিখিত থাকিত। এই ক্ষোদিত লিপিগুলি পাঠ করিয়া আজিও আমরা শ্রদ্ধায় নতশির হই। অশোক নিজে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং হিন্দু ব্রাহ্মণকে সমান শ্রদ্ধা করিতেন; বৌদ্ধ হইয়াও তিনি কখনও হিন্দু, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করেন নাই! বুদ্ধের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে রাজগৃহে এবং বৈশালী নগরে

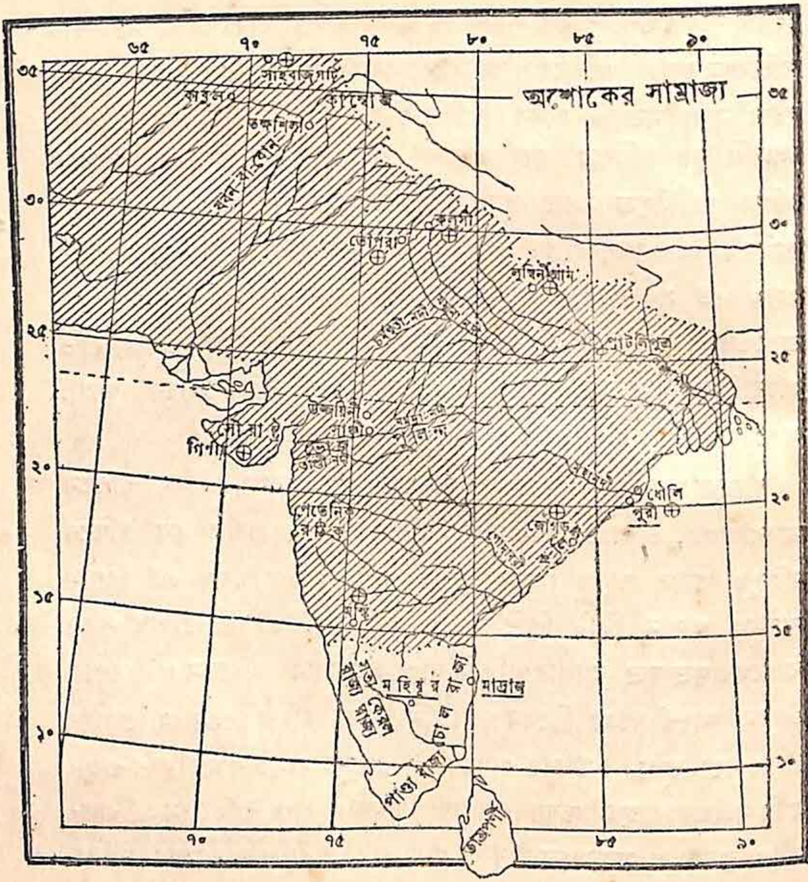
স্বরাজ্যে ধর্ম্মনীতি

নিরপেক্ষ ধর্ম্মনীতি

দুইবার বুদ্ধের উপদেশাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য দুইটি বৌদ্ধ মহাসভায় অধিবেশন হয়। অশোকের সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে বুদ্ধের বাণীর মর্ম্মার্থ লইয়া নানা মত ও দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মতবিরোধ ও দলাদলি দূর করিবার জন্য অশোক প্রবীণ বৌদ্ধাচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া পাটলিপুত্র নগরে **তৃতীয় বৌদ্ধমহাসভার** অধিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার খুব বেশী ছিল না। অশোক কর্ত্তৃক এই সকল উপায় অবলম্বনের ফলে সেই প্রাচীন যুগেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র এবং এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আজিও যে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, অশোকের প্রচার কার্য্য ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। পাটলিপুত্রের বৌদ্ধসভা

শাসন-পদ্ধতি—অশোকের সাম্রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে আরব সাগর ও পারস্যের সীমান্ত, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে মহিষূর পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্মানুরাগী হইলেও এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই। রাজ্যের সকল বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারও তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। অশোক একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, প্রজাগণ তাঁহার সন্তানতুল্য। তাঁহার শাসনকালে **রজ্জুক** নামক কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। রাজবংশীয় কুমারগণ **মহামাত্র**-নামক অমাত্যের সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। রাজ-পুরুষেরা যাহাতে প্রজাগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারেন, সে দিকে অশোকের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আদর্শ শাসক আভ্যন্তরীণ শাসন

জীবের মঙ্গলার্থ ব্যবস্থা—সমগ্র জীবজগতের মঙ্গলসাধন অশোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রার্থীরা যাহাতে প্রচুর ভিক্ষা পায়, সেজন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অশোক মনুষ্য এবং পশুগণের সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনমত ঔষধ প্রস্তুত করিবার সুবিধার জন্য সর্ব্বত্র নানাপ্রকার গুল্মাদি রোপণ করাইয়াছিলেন। কেবল নিজরাজ্যে এইরূপ মনুষ্য এবং পশুর চিকিৎসা-ব্যবস্থা করিয়াই তিনি মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসা

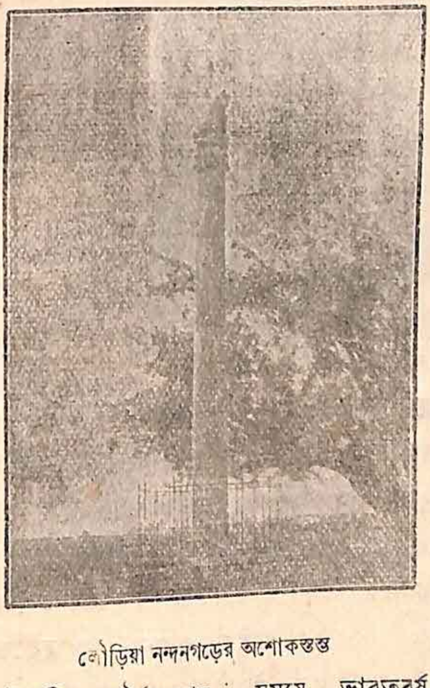


অশোকের সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তরে কাশ্মীর ও নেপাল, পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় এবং দক্ষিণে মহিষ্‌রের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন, এবং কলিঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান উড়িষ্যা অঞ্চল বাহুবলে অধিকার করেন। বাংলা দেশের অধিকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

সন্তুষ্ট ছিলেন না ; মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যে, তাম্রপর্ণী বা সিংহলে, এমন কি পশ্চিম-এশিয়া, মিশর ও ইউরোপের গ্রীকরাজগণের রাজ্যেও তিনি অনুরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। অশোকের মানবপ্রেমের ইহাই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। পথিকগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, এবং স্থানে স্থানে কূপ খনন ও বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। এই সকল কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে অশোক অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। আনুমানিক ২৩২ খৃষ্টাব্দে এই আদর্শ প্রজারঞ্জক নরপতি পরলোকগমন করেন।

বিশ্বপ্রেম

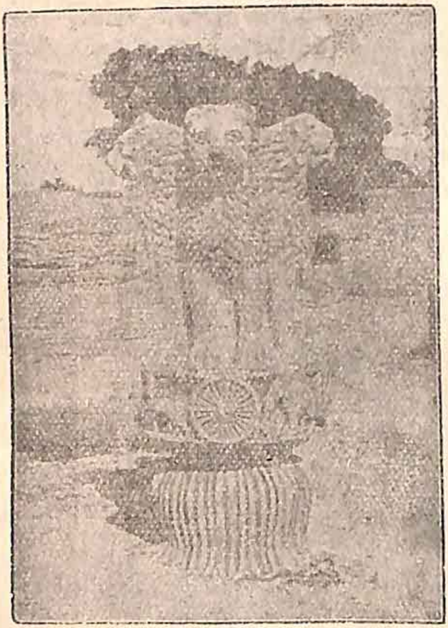
মৃত্যু



লৌড়িয়া নন্দনগড়ের অশোকস্তম্ভ

শিল্পের উন্নতি—মৌর্য্যগণের সময়ে ভারতবর্ষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অশোকের প্রস্তর স্তম্ভগুলির আশ্চর্য্যজনক মসৃণতা এবং স্তম্ভশীর্ষস্থ পশুমূর্ত্তিগুলির অদ্ভুত সজীবতা সে যুগের ভারতীয় শিল্পিগণের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাসাদের পরিবর্ত্তে অশোক প্রস্তরের বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড স্তূপ এবং কতিপয় গুহানিবাসও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প যথার্থই অতুলনীয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য



সারনাথের অশোকস্তম্ভশীর্ষে সিংহমূর্ত্তি

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন—অশোকের যুদ্ধবিগ্রহ-পরিত্যাগ-মূলক নীতির ফলে পরাক্রান্ত মৌর্য্যবাহিনীর ক্ষাত্রশক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের বলহীনতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ-গুলিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ শীঘ্রই মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া গেল। সুযোগ পাইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে বাহ্লিক (Bactria) দেশের গ্রীকরাজগণ নূতন উৎসাহে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিলেন। ইতিমধ্যে আনুমানিক ১৮৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য বংশের দশম রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণবংশীয় সেনাপতি **পুষ্যমিত্র শুঙ্গ** পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

Model Questions

1. Sketch the career of Chandragupta Maurya as a conqueror and a ruler.

2. What light does Megasthenes' account throw on the social and political institutions of the time of Chandragupta Maurya?

3. Sketch the career of Asoka as a ruler and a propagator of Buddhism within and outside his empire.

4. Describe the measures adopted by Asoka for the material, moral and religious advancement of the people.

5. Sketch briefly the history of the Mauryas.

6. Give an account of Maurya administration.

7. Why is Asoka regarded as one of the greatest rulers of the world?

পঞ্চম অধ্যায়

মৌর্য্যদিগের পরবর্ত্তী রাজবংশসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ—পূর্ব্ব ও মধ্য ভারত

শুঙ্গবংশ—পুষ্যমিত্র-প্রতিষ্ঠিত শুঙ্গবংশ আনুমানিক ১৮৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৭২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য পশ্চিমে বিপাশা ও দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পুত্র **অগ্নিমিত্র** বিদিশা (গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বেস্‌নগর) নগরীতে অবস্থান করিয়া শুঙ্গ সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেন। পুষ্যমিত্রের সময়ে বাহ্লিকের গ্রীকগণ পঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু নানা শত্রুর সহিত সংঘর্ষ সত্ত্বেও পুষ্যমিত্র মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দুইটি **অশ্বমেধ** যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহার কোন একটি যজ্ঞে মহাভাষ্য-রচয়িতা **পতঞ্জলি** উপস্থিত ছিলেন। পুষ্যমিত্রের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে তাঁহাকে অত্যাচারী এবং বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পুষ্যমিত্রের রাজ্য

অশ্বমেধ যজ্ঞ

কাণ্ববংশ—পুষ্যমিত্রের পরবর্ত্তী শুঙ্গরাজগণ হীনবল এবং নামে-মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে আনুমানিক ৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শুঙ্গবংশের শেষ রাজার মন্ত্রী **বাসুদেব কাণ্ব** আপন প্রভুর প্রাণ সংহার করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। আনুমানিক ২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন বংশীয় সিমুকের হস্তে কাণ্বগণ পরাজিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—দাক্ষিণাত্য

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংশ হইবার পর দাক্ষিণাত্যে দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয়—পূর্ব্বদিকে কলিঙ্গের চেদিরাজ্য, এবং পশ্চিম দিকে আধুনিক মহারাষ্ট্র অঞ্চলের গোদাবরী উপত্যকায় শাতবাহন রাজ্য।

চেদিবংশ—কলিঙ্গের চেদিবংশের পরাক্রান্ত রাজা **খারবেল** (খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী) মগধ, শাতবাহনরাজ্য এবং আরও অনেক রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশ আর্য্য মহামেঘবাহনবংশ-নামে খ্যাত ছিল।

শাতবাহন বংশ—পুরাণে এই রাজবংশকে অন্ধ্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম **সিমুক**। শাতবাহন রাজগণ 'দক্ষিণাপথেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গোদাবরীর তীরস্থিত প্রতিষ্ঠান (ঔরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত পৈঠান) নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই বংশের তৃতীয় নরপতি **প্রথম শাতকর্ণি** অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। মালবের কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য **অশ্বমেধ** যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু শীঘ্রই **শক** প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণে রাজ্যের অনেকাংশ শাতবাহনগণের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। বহুদিন পরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির** শাসনকালে (আনুমানিক ১০৬-১৩০ খৃঃ) শাতবাহনেরা আপনাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি শক, যবন (গ্রীক) এবং পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শাতবাহনরাজ্য উত্তরে মালব ও কাঠিয়াবাড় হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে উজ্জয়িনীর শক রাজা **রুদ্রদামা** তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শাতবাহনরাজ্যের উত্তরাংশ কাড়িয়া লন। তিনি রুদ্রদামার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র **পুলুমায়ির** সময়ে শাতবাহনরাজ্য দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাতবাহনবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজার নাম **যজ্ঞ শাতকর্ণি**; ইঁহাকে পুরাণে যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি বলা হইয়াছে। আনুমানিক ২০০ খৃষ্টাব্দে যজ্ঞ শাতকর্ণির মৃত্যু হইলে এই বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। অতঃপর দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়।

প্রথম শাতকর্ণি ও গৌতমীপুত্র

শক ও শাতবাহন দ্বন্দ্ব

সুদূর-দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রাজ্যসমূহ—অশোকের সময়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্য দক্ষিণে মহিসূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে **চোল, পাণ্ড্য, কেরল** এবং **সত্য** নামক চারিটী স্বাধীন দ্রাবিড় রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলী জেলায় প্রাচীন চোলরাজ্য, মদুরা ও তিন্নেবেল্লী জেলায় পাণ্ড্যরাজ্য, দক্ষিণ মালাবারে কেরলরাজ্য এবং উত্তর মালাবারে সত্যরাজ্য অবস্থিত ছিল। প্রথমে চোলরাজগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জনৈক চোল রাজা সিংহল অধিকার করেন। পাণ্ড্যদেশ বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং পাণ্ড্যরাজধানী মদুরা দ্রাবিড়-সভ্যতা ও তামিল স্যাহিত্যের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ২০ অব্দে একজন পাণ্ড্য রাজা রোমের সম্রাট্ অগাষ্টসের রাজসভায় ব্যণিজ্যদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই চারিটি দ্রাবিড় রাজ্য প্রাচীনকালে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের উপকূলস্থিত বন্দরগুলি সেকালে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্পন্ন কেন্দ্র ছিল। ঐ পথে আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের ধনরাশি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত।

চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে **পল্লব** নামক একটি রাজবংশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। মাদ্রাজের নিকট অবস্থিত কাঞ্চীপুরে পল্লব রাজগণের রাজধানী ছিল। আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টাব্দে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ উত্তরাপথের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

কাঞ্চীর পল্লব রাজ্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারত

গ্রীকরাজগণ—মৌর্য্য বংশের অবনতির সময়ে বিশৃঙ্খলার সুযোগে বাহ্লিক বেশীয় (Bactrian) গ্রীকগণ পঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকরাজগণের মধ্যে **ডেমেট্রিয়স** (Demetrius) এবং **মেনাণ্ডার** (Menander) বা মিলিন্দের নাম সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ডেমেট্রিয়স ভারতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বহু নগর ও রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছুকাল পরে পঞ্জাবের অন্তর্গত

ডেমেট্রিয়স ও মেনাণ্ডার

প্রাচীন শাকল (শিয়ালকোট) নগরে গ্রীকরাজ মেনাণ্ডার রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে, তিনি নাগসেন নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শকরাজগণ (Scythians, Sakas)—শক নামক যাযাবর জাতি প্রথমে মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত অক্সস্ (Oxus) নদীর তীরে বাস করিত। য়ুয়েচি নামক অপর একটি যাযাবর জাতির উপদ্রবে তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগ (Maues), অয় (Azes) প্রভৃতি পরাক্রান্ত শক নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। তক্ষশিলা, মথুরা, কাঠিয়াবড় এবং উজ্জয়িনী অঞ্চলে 'ক্ষত্রপ' বা 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিধারী শক নায়কগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মোগ ও অয়

দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে (১৩০—১৫০ খৃঃ) উজ্জয়িনীর মহাক্ষত্রপ **রুদ্রদামা** (Rudradaman) একজন পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন। মূলতান অঞ্চল হইতে কোঙ্কণ উপকূল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। শাতবাহন বংশের রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া নিজ পুত্রের সহিত রুদ্রদামার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, শকজাতীয় হইলেও রুদ্রদামা সংস্কৃত ভাষায় উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। রুদ্রদামা

পহ্লবরাজগণ (Parthians)—শকরাজগণের পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পহ্লব বা **পারদ** রাজগণের করতলগত হয়। পহ্লবজাতি প্রথমে কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণদিক্‌স্থিত ভূখণ্ডে বাস করিত। ক্রমে কান্দাহার জয় করিয়া তাহারা কাবুল ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পহ্লব রাজগণের মধ্যে **গুডুহ্বর** বা **গোণ্ডোফারেস্** (Gondophares বা Gondophernes) সমধিক প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, যীশু খৃষ্টের শিষ্য বিখ্যাত সাধু টমাস (St. Thomas) তাঁহারই রাজত্বকালে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। গুডুহ্বর

কুষাণ জাতির (Kushans) **রাজ্য স্থাপন**—পহ্লবগণের অধঃপতনের সময়ে **য়ুয়েচি** (Yueh-chi) জাতির একটি শাখা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। য়ুয়েচি জাতি প্রথমে চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত। পরে হূণ নামক অপর একটি যাযাবার জাতির চাপে পড়িয়া তাহারা শক জাতিকে বিতাড়নপূর্ব্বক অক্সস্ নদীর তীরে বাস করিতে থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে য়ুয়েচি জাতির **কুষাণ** নামক একটি শাখা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কুষাণদিগের নায়ক **কুজুল কদফিস্** (Kujula Kadphises) য়ুয়েচিগণের অপর চারিটি দলকে বশীভূত করিয়া য়ুয়েচি জাতির দলপতি হইলেন। অতঃপর তিনি গ্রীক ও পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্থান ও পঞ্জাব জয় করিলেন এবং একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, কুজুল কদফিস্ ভারতবর্ষ জয় করেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র **বিম কদফিস্** (Vema বা Vima Kadphises) উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 'মহা সেনাপতি' উপাধিধারী কর্ম্মচারীকে ভারতীয় রাজ্যাংশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

কুষাণ বংশ

কুজুল ও বিম কদফিস্

কণিষ্ক—বিম কদফিসের পর কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কণিষ্কই কুষাণরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি পূর্ব্বদিকে কুষাণরাজ্যের সীমা বহুদূর প্রসারিত করেন। কণিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাশ্মীরও তাঁহার অধীন ছিল। **পুরুষপুর** অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশোয়ার তাঁহার রাজধানী ছিল। এই পরাক্রান্ত নরপতি চীনরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সন্ধির জামীন স্বরূপ একজন চীনরাজকুমারকে নিজ রাজ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। পহ্লবগণ এবং পাটলিপুত্রের রাজাও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

কণিষ্কের রাজ্য ও রাজধানী

কণিষ্ক বিদ্বানের সমাদর করিতেন। কথিত আছে, বৌদ্ধ কবি ও পণ্ডিত **অশ্বঘোষ**, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য **চরক** এবং বৌদ্ধ দার্শনিক **নাগার্জ্জুন** তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ সংস্কৃতে বহু বৌদ্ধ-দর্শনগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধচরিত' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

বিদ্বানের সমাদর

কণিষ্কের রাজত্বকালে শিল্পকলার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি অনেক সুন্দর বৌদ্ধবিহার এবং স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর রাজধানী পুরুষপুরে তিনি কিঞ্চিদধিক চারিশত হস্ত উচ্চ যে বিরাট্ চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে যুগে তাহা একটি অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তু ছিল। তাঁহার সময়ের শিল্পিগণ মূর্ত্তি-নির্ম্মাণেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের শিল্পরীতি গন্ধার ভাস্কর্য্য নামে প্রসিদ্ধ। মথুরায় মৃত্তিকার নিম্ন হইতে সম্রাট্ কণিষ্কের একটী ভগ্নশীর্ষ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে তাঁহাকে দীর্ঘকায় এবং তুর্কিপেযোক-পরিহিত দেখা দেখা যায়। শিল্পোন্নতি

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ব্বিরোধ ও দলাদলি দূর করিবার জন্য মৌর্য্যরাজ অশোকের ন্যায় কণিষ্ক **চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসভা** আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সংস্কারপন্থী দল প্রাধান্য লাভ করায় বৌদ্ধসমাজ **হীনযান** (অর্থাৎ আদি বৌদ্ধধর্ম্ম) এবং **মহাযান** (অর্থাৎ সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম)—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ বুদ্ধের মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতেন। এই সময় হইতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা

কণিষ্কের রাজত্বকাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সময় হইতেই শকাব্দের গণনা চলিয়া আসিতেছে। আবার অনেকের বিশ্বাস, কণিষ্ক খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তবে কণিষ্ক নামধারী একাধিক নরপতি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কণিষ্কের কাল

পরবর্ত্তী কুষাণরাজগণ—কণিষ্কের পর **বাসিষ্ক, হুবিষ্ক** এবং **বাসুদেব** প্রমুখ কয়েকজন কুষাণ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাসুদেবের পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। মথুরা, রাজপুতানা ও পঞ্জাব অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইল। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্য তখন কেবলমাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র অঞ্চলে

কুষাণ বংশের অধঃপতন

সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। এদিকে পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশীয় রাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বিক্রমাব্দ ও শকাব্দ—ভারতবর্ষে বৎসর গণনা করিবার জন্য যে সকল অব্দ (অর্থাৎ সন বা সাল) প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিক্রমাব্দ এবং শকাব্দ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে অর্থাৎ গণনা আরম্ভ হইবার ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে **বিক্রম-সংবৎ** বা বিক্রমাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিক্রমাব্দ প্রাচীনকালে 'কৃত' বা 'মালবগণের অব্দ' বলিয়া পরিচিত ছিল। কথিত আছে, উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন শকগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে বিক্রমাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামক কোন রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। শকারি বিক্রমাদিত্য, অর্থাৎ মগধের গুপ্ত বংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, ঐ সময়ের সাড়ে চারিশত বৎসর পরে পশ্চিম ভারতের শক বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে মালব দেশে প্রচলিত এই সালটি ঐ ঘটনার সহিত সম্পর্কিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে বিক্রমাব্দ নামে পরিচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ শক ও পহ্লব রাজগণ ভারত এই শালটির ব্যবহার প্রথম প্রচলিত করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য

৭৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সালের গণনার ৭৮ বৎসর অতীত হইবার সময়ে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্কের রাজ্যারম্ভের সময় হইতে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বিম কদফিস্ শকাব্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, উজ্জয়িনীর শকরাজগণ দীর্ঘকাল এই সনটি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পরে শকাব্দ নামে বিখ্যাত হয়।

শকাব্দ

মৌর্য্যোত্তর যুগের ভারতীয় সভ্যতা—শক-কুষাণ আমলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক **মহাযান** সংজ্ঞক বৌদ্ধধর্ম্মের এক সংস্কৃত রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণ বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতীয় সমাজে মিশিয়া যাইতে

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য

থাকে। শক ও কুষাণ রাজগণ সংস্কৃতভাষার সমাদর করিতেন বলিয়া জানা যায়। মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি, বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক ও সুশ্রুত, "বৃহৎকথা" নামক কাহিনীমালা প্রণেতা গুণাঢ্য প্রভৃতি মনীষিগণ মৌর্য্যোত্তর যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শিল্পকলা

এই যুগে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল; ভাজা, বর্হুৎ, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই সময়ে ভারতীয় ও গ্রীক-রোমান শিল্পের সম্মিশ্রণে এক নবীন ভাস্কর্য্যরীতির উদ্ভব হয়। উহা সাধারণতঃ **গন্ধার-শিল্প** আখ্যায় পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র ও মুদ্রায় যে বিদেশীয় প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই যুগের ভারতীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিণতি মাত্র।

বৈদেশিক বাণিজ্য

এই যুগে ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি দৃষ্ট হয়। বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতীয়গণ পশ্চিমে রোম এবং পূর্ব্বে চীনদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। এক সময়ে রোমের বাজার ভারতের দ্রব্যাদি ও বঙ্গীয় মস্‌লিন প্রভৃতি বিলাসোপকরণে ছাইয়া গিয়াছিল। এই যুগেই যবদ্বীপ, অনাম প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

Model Questions

1. Describe the political condition of India immediately after the fall of the Mauryas with reference to the advent of the Bactrian Greeks, the Scythians and the Parthians.

2. Trace the rise and fall of the Kushana empire with special reference to the reign of Kanishka.

3. Write notes on (i) the Saka and Vikrama eras, (ii) Demetrius, (iii) Menander, and (iv) Gondophares.

ষষ্ঠ অধ্যায়

মগধের পুনরভ্যুদয়—গুপ্ত সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ—গুপ্তবংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনা	...	৩২০ খৃঃ
ফা-হিয়েনের ভারত-ভ্রমণ	...	৪০৫-৪১১ খৃঃ
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা	...	৪৬৭ খৃঃ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

(৩২০—আনুমানিক ৩৩৫ খৃঃ)

চতুর্থ শতাব্দীর সূচনায় মগধে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ইহার নাম গুপ্তবংশ। এই বংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পরাক্রান্ত লিচ্ছবি বংশের কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন এবং ক্ষুদ্র গুপ্তরাজ্যটিকে পশ্চিমে অযোধ্যা ও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। গুপ্তবংশে তিনিই প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ **পাটলিপুত্রে** তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার সিংহাসন লাভের সময় অর্থাৎ ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে

সংক্ষিপ্ত বংশলতা—গুপ্তবংশ ঃ—

- (১) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৫)
  - (২) সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৩৫-৭৬)
    - (৩) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৬-৪১৪)
      - (৪) প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৪-৫৫)
        - (৫) স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪৫৫-৬৭)
        - পুরুগুপ্ত
          - নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য
          - বুধগুপ্ত (৪৭৭-৯৫)

(দুই একটি তারিখ আনুমানিক)

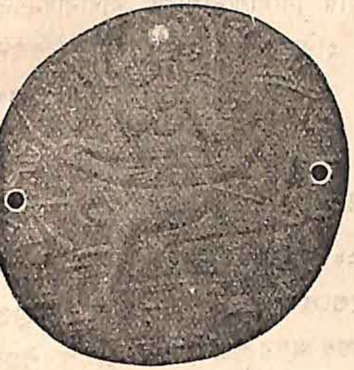
একটি অব্দ বা সালের গণনা আরম্ভ হয়; উহার নাম **গুপ্তাব্দ** বা **গুপ্তসংবৎ**।

সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য *

(আনুমানিক ৩৩৫—৭৬ খৃঃ)

দিগ্বিজয়—মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সমুদ্রগুপ্ত নামক পুত্রকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য উপাধিকধারী সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-কন্যা কুমারদেবীর পুত্র ছিলেন। তিনিই গুপ্তবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। প্রাচীন ভারতের রাজগণের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। সিংহাসন লাভের কিছুকাল পরেই তিনি চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করেন। দক্ষিণ কোশলের (ছত্রিশগড় অঞ্চল) রাজা মহেন্দ্র, বেঙ্গীর (অন্ধ্রদেশ) রাজা হস্তিবর্ম্মা, কাঞ্চীর পল্লব রাজা বিষ্ণুগোপ এবং দক্ষিণাপথের আরও বহু নরপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হন; কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের রাজ্য অধিকার না করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কেবল যে দক্ষিণ ভারতেই সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নহে; পূর্ব্বে কামরূপ (আসাম), সমতট (পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাংলা) প্রভৃতি রাজ্য, উত্তরে নেপাল রাজ্য, পশ্চিমে শক প্রভৃতি জাতির রাজ্য এবং দক্ষিণে সিংহল রাজ্য তাঁহার সহিত বশ্যতা-মূলক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়



সমুদ্রগুপ্ত

* এতদিন ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বপ্রথম বিক্রমাদিত্য (অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ভারতের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তই প্রথম বিক্রমাদিত্য।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা—দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত একটি **অশ্বমেধ** যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ; কিন্তু তাঁহারা পরধর্ম্মের প্রতি অনুদারতা প্রদর্শন করেন নাই। সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি লইয়া সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

চরিত্র—বীর-কীর্ত্তি সমুদ্রগুপ্তের যশোগৌরবের একমাত্র কারণ নহে। তিনি প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌ ও বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্‌ ছিলেন। তিনি একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট বীণাবাদনরত মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। হরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারী সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন। ৩৭৬ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

(৩৪৬-৪১৪ খৃঃ)

রামগুপ্ত

রাজ্যলাভ—কথিত আছে, সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র **রামগুপ্ত** সিংহাসন লাভ করেন ; কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের অপর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শীঘ্রই ভ্রাতাকে বিতাড়িত করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

দিগ্বিজয়—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মালব ও সৌরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) জয় করিয়া পশ্চিম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। **শকবংশ ধ্বংস** করিয়া তিনি পশ্চিম ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর মালবের অন্তর্গত উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিগণিত হইল। বেরার অঞ্চলের **বাকাটক** বংশীয় জনৈক রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া চন্দ্রগুপ্ত এই পরাক্রান্ত রাজবংশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

বিদ্যানুরাগ—পিতার ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সচিব বীরসেন একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আমাদের দেশে উজ্জয়িনীর রাজা শকারি বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য তবে এই কিংবদন্তীর মধ্যে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী একাধিক নরপতিসম্পর্কিত কাহিনী মিশিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, রাজা বিক্রমের সভায় **নবরত্ন** অর্থাৎ কালিদাস, বরাহমিহির প্রমুখ তৎকালীন ভারতের নয়জন শ্রেষ্ঠ কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি অবস্থান করিতেন। কিন্তু এই জনশ্রুতি সর্ব্বাংশে সত্য নহে। নবরত্ন বলিয়া পরিচিত ঐ নয় জন ব্যক্তি একজন নির্দ্দিষ্ট রাজার সময়ে বর্ত্তমান হয়ত ছিলেন না। মহাকবি **কালিদাস** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালেই বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বীরসেন নামক একজন খ্যাতনামা কবি চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য ছিলেন।

শকরাজ্য অধিকার

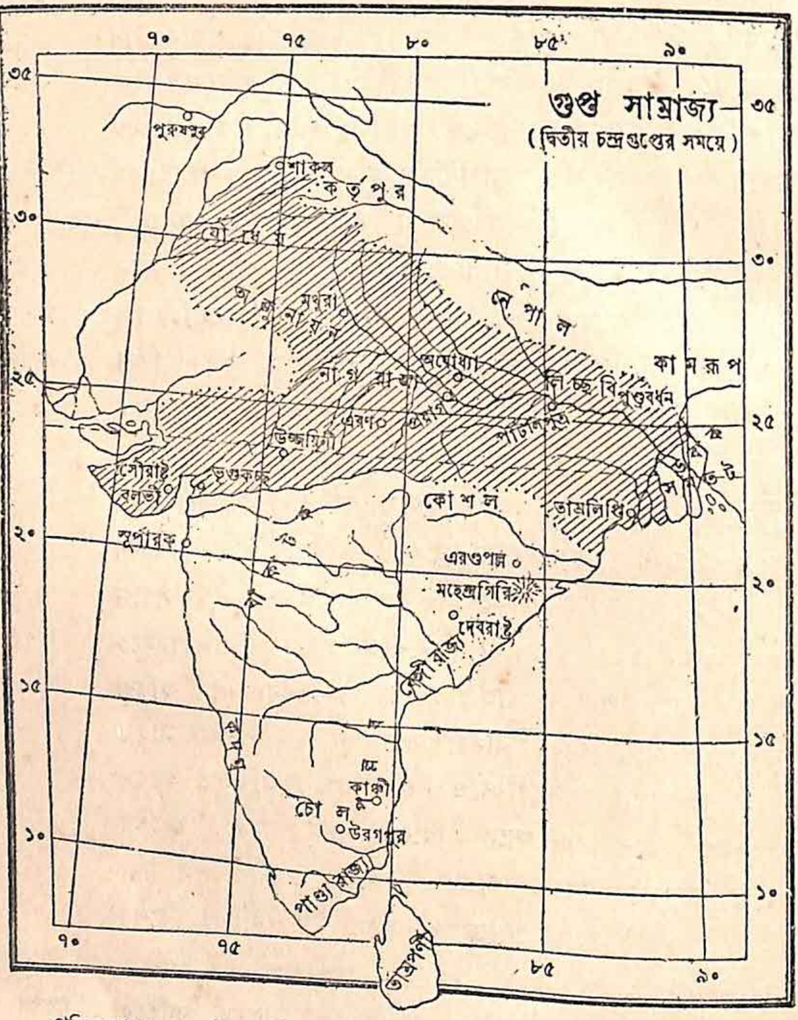
শকারি বিক্রমাদিত্য

ফা-হিয়েন—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। রাজধানী পাটলিপুত্র সুরম্য অট্টালিকাসমূহে পূর্ণ ছিল। অশোকের পুরাতন রাজপ্রাসাদের গঠননৈপুণ্য দর্শন করিয়া ফা-হিয়েন উহাকে মনুষ্য-নির্ম্মিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। মগধের দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহ দেখিয়াও তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া-ছিলেন। সমগ্র দেশ ধন-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। ফা-হিয়েন ভারতবাসীর সংযত চরিত্র ও উত্তম রীতি-নীতির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজে সেকালে চণ্ডালগণকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইত। তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। সে যুগে বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে বণিক্‌গণ বড় বড় জাহাজে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি

নবরত্ন

মগধের অবস্থা

সুদূর দেশে যাতায়াত করিতেন। সে সময়ে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।



পশ্চিম পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের কুষাণ রাজ্য, পশ্চিমভারতের শকরাজ্য, নেপাল, আসাম এবং বাংলার পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মালব ও কাঠিয়াবাড় বিজিত হয়। দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে গুপ্তগণের রাষ্ট্রীয়প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য

(৪১৪-৫৫-খৃঃ)

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর ৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি ধারণপূর্ব্বক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহের ন্যায় তিনিও একটি **অশ্বমেধ** যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজত্বের শেষ দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া এই সময়ে **হূণ** নামক এক দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতি দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের ভীষণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। কুমারগুপ্তের পুত্র মহাবীর **স্কন্দগুপ্ত** হূণগণকে পরাজিত করিয়া কিছুদিনের জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন রোধ করিয়াছিলেন।

বাংলার বাণিজ্য

হূণ আক্রমণ

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

(৪৫৫-৬৭-খৃঃ)

*প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণবিজয়ী স্কন্দগুপ্ত পিতামহের ন্যায় 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দুর্ব্বার হূণ জাতি তখনও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিতেছিল; কিন্তু স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে আর তাহারা গুপ্তরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ—আনুমানিক ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে **বুধগুপ্ত** (৪৭৭-৯৫ খৃঃ) সর্ব্বপ্রধান। বুধগুপ্তের সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে মালব দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পূর্ব্বতন সামন্তগণ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইলেন। পঞ্জাব হইতে মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত হূণদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বাংলাদেশ, কনৌজ, মালব ও

গুপ্তবংশের অধঃপতন



গুপ্ত যুগের একটি স্তম্ভ

কাঠিয়াবাড় অঞ্চল একে একে স্বাধীন হইয়া গেল।

গুপ্তযুগের সভ্যতা—গুপ্ত সম্রাট্‌গণের শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গৌরবময় যুগ। এই সময়ে সাহিত্য, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভারতবাসিগণের প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই যুগেই অমর কবি **কালিদাস** সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কালিদাসের **'মেঘদূত'** নামক গীতিকাব্য এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নামক নাটক বিশ্বসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা **শূদ্রক** গুপ্তযুগের শেষদিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' ও 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা **বিশাখ দত্তকে** এই যুগের নাট্যকার বলিয়া মনে করেন। গুপ্ত যুগে পাটলিপুত্রের **আর্য্যভট** (জন্ম ৪৭৬ খৃঃ) এবং উজ্জয়িনীর **বরাহ-মিহির** (জন্ম ৫০৫ খৃঃ) জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

জ্যোতিষ

পৃথিবী যে গোলাকার এবং উহা যে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তিত হয়, এই তথ্য আর্য্যভটই প্রথম আবিষ্কার করেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থাবলীতে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিষের প্রভাব লক্ষিত হয়। গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে রামায়ণ, মহাভারত এবং বহুসংখ্যক পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনকুশলতা সে যুগে সঙ্গীত বিদ্যার চরমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। **অজণ্টা** গুহার বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাবলী আজিও গুপ্ত-যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পিগণের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লিপিসম্বলিত একটি অতি মসৃণ লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে; উহা গুপ্ত-যুগের ধাতুশিল্পিগণের অসামান্য দক্ষতা প্রমাণ করে। এই দেড় হাজার বৎসরেও স্তম্ভটির মসৃণতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই এবং স্তম্ভগাত্রে কোথাও মরিচা ধরে নাই। এই যুগে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল।

শাস্ত্রগ্রন্থ

শিল্প বানিজ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গুপ্ত যুগের পরবর্ত্তী কালে উত্তরাপথের অবস্থা

যশোধর্ম্মা কর্তৃক হূণবিজয়	...	আনুমানিক ৫৩০ খৃঃ
শশাঙ্কের রাজত্বকাল	...	,, ৬০০-২৫ খৃঃ

হূণ উপদ্রব

যশোধর্ম্মা (Yasodharman)—দুর্দ্ধর্ষ শ্বেত হূণ জাতির (White Huns) একটি দল ইউরোপে গিয়া বিখ্যাত অ্যাটিলার নেতৃত্বে পরাক্রান্ত রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাহারই অপর একটি দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। হূণ-নায়ক **তোরমান** পঞ্জাব হইতে মালব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে হূণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পুত্র **মিহিরকুল** বা **মিহিরগুল** হূণ রাজ্যের উত্তরাধিকার পাইয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত **শাকল** (শিয়ালকোট) নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হূণগণ অতিশয় বর্ব্বর ও হিংস্র ছিল। তাহাদের অত্যাচার হইতে জন্মভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য অনেক ভারতীয় নরপতি অস্ত্র ধারণ করিলেন। এই সকল ভারতীয় রাজার মধ্যে মগধের গুপ্তবংশীয় নৃপতি **বালাদিত্য** এবং মালবের অন্তর্গত **দশপুর** (মন্‌-দসোর) নামক স্থানের রাজা যশোধর্ম্মা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ৫৩২ খৃষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যশোধর্ম্মা হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হূণজাতির অত্যাচার হইতে আর্য্যাবর্ত্তকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরে হূণজাতি আর্য্যাবর্ত্তে আর কোন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

মিহিরকুলের পরাজয়

কথিত আছে, যশোধর্ম্মা হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত এবং আরব সাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সাম্রাজ্য এত বৃহৎ ছিল না। কেহ কেহ মনে করেন যে, যশোধর্ম্মাই কিংবদন্তীসমূহে বর্ণিত উজ্জয়িনীপতি শকারি বিক্রমাদিত্য; এই ধারণাও ভ্রান্ত। প্রথমতঃ, যশোধর্ম্মা হূণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, শকদিগকে নহে। দ্বিতীয়তঃ, যশোধর্ম্মার রাজধানী

যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য নহেন

ছিল দশপুরে, উজ্জয়িনীতে নহে। তৃতীয়তঃ, যশোধর্ম্মা কখনও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।

পুষ্যভূতি ও মৌখরি বংশ

থানেশ্বর ও কনৌজ—ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আর্য্যাবর্ত্তে চারিটী প্রধান রাজ্য ছিল। **থানেশ্বর, কনৌজ, মগধ** ও **গৌড়**। তখনও দুর্ব্বার হূণজাতি সম্পূর্ণ নিৰ্জ্জীব হয় নাই। থানেশ্বরের **পুষ্যভূতি** বংশীয় রাজা **প্রভাকরবর্দ্ধন** পঞ্জাব অঞ্চলের হূণ, গুর্জ্জর প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করিয়া পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি কনৌজের **মৌখরি** বংশে আপন কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়া পরাক্রান্ত মৌখরি রাজ্যের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মৌখরিগণ ইহার পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব হইতে পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। মালবের উত্তরকালীন গুপ্ত বংশীয় রাজগণের সহিত মৌখরি বংশের বিরোধ ছিল। এই গুপ্ত রাজগণের মধ্যে **মহাসেনগুপ্ত** সর্ব্বপ্রধান। কথিত আছে, তিনি পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন।

গৌড়ের প্রভাব

গৌড়রাজ্য ও শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০০-২৫ খৃঃ)—গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের শাসনকালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত **সমতট** রাজ্য ব্যতীত অপর সমুদয় অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন অর্থাৎ উত্তরবাংলা গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন একটি ভুক্তি বা প্রদেশ ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ফলে **গৌড়** অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজ্যের একজন পরাক্রান্ত রাজার বিষয় জানা যায়; তাঁহার নাম শশাঙ্ক। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ প্রাচীন **কর্ণসুবর্ণ** নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। শশাঙ্কের সময়ে গৌড় রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। আধুনিক গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত প্রাচীন **কোঙ্গোদ** রাজ্যের রাজগণ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ তাঁহার সামন্ত ছিলেন।

শশাঙ্কের সময়েই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী উত্তরাপথের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাতা কনৌজপতি গ্রহবর্ম্মার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মালবের রাজা দেবগুপ্ত

শশাঙ্কের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্কের সহায়তায় মালবরাজ কনৌজ আক্রমণপূর্ব্বক মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং তদীয় পত্নী থানেশ্বর-রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রভাকরবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও উত্তরাধিকারী থানেশ্বররাজ **রাজ্যবর্দ্ধন** সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মালবরাজকে পরাজিত করিলেন ; কিন্তু মালবরাজের মিত্র শশাঙ্ক তাঁহাকে নিহত করেন। ইহার ফলে রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্রুতকীর্ত্তি **হর্ষবর্দ্ধন** কামরূপরাজ **ভাস্করবর্ম্মার** সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া শশাঙ্ককে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর গৌড়ীয় বাহিনী পরাজিত করিয়া হর্ষের মিত্র ভাস্করবর্ম্মা সগৌরবে গৌড়-রাজধানী কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু গৌড়ের এই পরাজয় শশাঙ্কের জীবনকালের ঘটনা কিনা, তাহা জানা যায় না। শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, জানা গিয়াছে। তিনি অন্ততঃ-পক্ষে উনিশবৎসরকাল সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৌখরি রাজ্য ধ্বংস

গৌড়ের পরাজয়

Model Questions

1. Give a short account of the Gupta empire with reference to the foreign invasion that took place during the Gupta rule.

2. Sketch the career of (i) Samudra Gupta (Vikramaditya) and (ii) Chandragupta II Vikramaditya.

3. Why is the Gupta period called the Golden Age of ancient Indian history ?

4. Write notes on :—(a) Fa-hien, (b) Skandagupta, (c) Yasodharman, (d) the Huns and (e) Sasanka.

সপ্তম অধ্যায়

কনৌজের অভ্যুত্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ—হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য

(৬০৬—৬৪৭ খৃঃ)

হিউএন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ	৬৩০-৪৪ খৃঃ
হর্ষকর্ত্তৃক চীনদেশে দূত প্রেরণ	৬৪১ খৃঃ

রাজ্যলাভ—থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক নিহত হন। এই দুঃসংবাদ থানেশ্বরে পৌছিলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে হর্ষাব্দ রাজপদ প্রদান করা হইল। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। এই স্মরণীয় ঘটনার সময় হইতে **হর্ষাব্দ** নামক সালের গণনা আরম্ভ হয়। তিনি **শীলাদিত্য** উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজপদ লাভ করিয়াই হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতা ও ভগিনীপতির হত্যাকারী এবং ভগিনীর দুর্দ্দশাকারী শত্রুগণকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু বন্দিনী রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য মনে হইল। এদিকে, কোনরূপে মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যশ্রী বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর হর্ষ ভগিনীর সন্ধান রাজ্যশ্রীর পাইলেন। সন্ধান অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বর হইতে **কনৌজে রাজধানী** স্থানান্তরিত করিলেন। ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর ফলে মৌখরিসিংহাসন শূন্য হওয়ায় কনৌজ রাজ্যও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। এই সময় হইতে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে রাজ্যশ্রী হর্ষবর্দ্ধনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন।

বংশলতা—পুষ্যভূতি বংশ :—

(১) প্রভাকরবর্দ্ধন

(২) রাজ্যবর্দ্ধন

(৩) হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬—৪৭)

রাজ্যশ্রী (মৌখরি বংশের রাণী)

আর্য্যাবর্ত্ত জয়—অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন সাম্রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন গৌড়াধিপতি **শশাঙ্ক**; কারণ শশাঙ্কই রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। হর্ষ শশাঙ্কের উপর প্রতিশোধ

কনৌজ লাভ



হর্ষবর্দ্ধন

লইবার জন্য কামরূপের রাজা **ভাস্করবর্ম্মার** সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি শশাঙ্ককে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মিত্র ভাস্করবর্ম্মা গৌড়ের রাজধানী (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী) কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষের বিজয়-বাহিনী বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী **কোঙ্গোদ** রাজ্য (আধুনিক গঞ্জাম জেলার পূর্ব্বাংশ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কোঙ্গোদ পূর্ব্বে গৌড়রাজ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। অতঃপর হর্ষ পশ্চিম ভারত জয় করিতে অগ্রসর হন। কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত **বলভীর** রাজা **ধ্রুবসেন** হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে বাংলা দেশ হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে হর্ষের রাষ্ট্রিয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

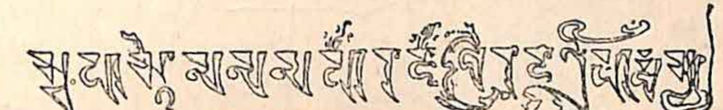
শশাঙ্ক

ভাস্করবর্ম্মা

গঞ্জাম

দাক্ষিণাত্যে অভিযান—কিন্তু নর্মদা নদীর দক্ষিণ দিকে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে বাতাপিপুরের পরাক্রান্ত চালুক্যবংশীয় রাজগণ দক্ষিণাপথ শাসন করিতেন। চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশীর** সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হর্ষকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কাঠিয়াবাড়



হর্ষবর্দ্ধনের স্বাক্ষরের নকল—[স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ-শ্রীহর্ষস্য]

চরিত্র—হর্ষবর্দ্ধন কেবল যে একজন সমরকুশল ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রত্নাবলী' প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। হর্ষের রাজসভা বহু পণ্ডিত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহাদের মধ্যে 'কাদম্বরী' নামক উপন্যাস এবং 'হর্ষচরিত' (হর্ষবর্দ্ধনের জীবনী) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা **বাণভট্ট** সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

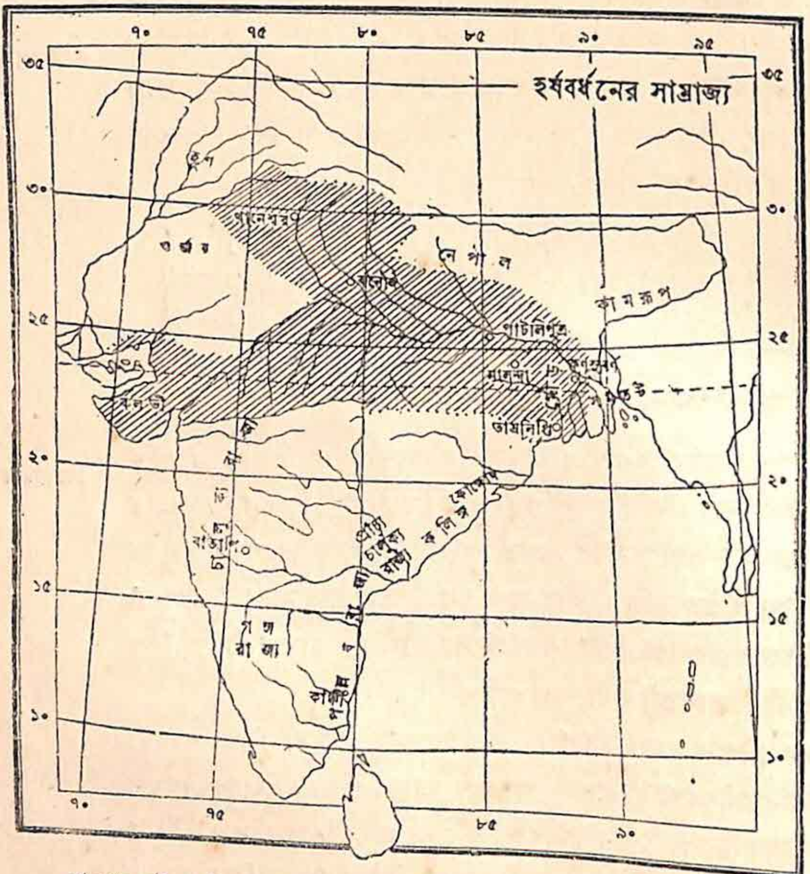
বিদ্যানুরাগ

প্রথম জীবনে রাজা হর্ষবর্দ্ধন শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন। হর্ষের ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল; কোন ধর্ম্মকেই তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বিশ্রামাগার প্রভৃতিতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পথিক ও অতিথিগণ বিশ্রাম করিতে পাইত। কথিত আছে, হর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি এবং জীবহত্যা নিবারণের জন্য অনেক বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হর্ষের চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা, দানশীলতা ও সদাশয়তা প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত ছিল।

ধর্ম্মমত

৬৪১ খৃষ্টাব্দে হর্ষ একজন ব্রাহ্মণকে চীনদেশের সম্রাটের সভায় রাজদূত-রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হর্ষবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন।

অহিংসা নীতি



থানেশ্বর হইতে বিহার পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল। মালব ও কাঠিয়াবাড়ের রাজগণ হর্ষের বশীভূত মিত্র ছিলেন, মনে হয়। কামরূপও তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রভাবের অধীন ছিল। হর্ষের রাজত্বের শেষদিকে বাংলা দেশের পশ্চিমাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নর্ম্মদা হর্ষের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল।

হিউএন-সাং লিখিত বিবরণ—বিখ্যাত চীনদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক **হিউএন-সাং** (Hiuen-tsang) বা ইউয়ান-চোয়াং (Yuan-chwang) হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হর্ষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। হিউএন-সাঙের লিখিত বিবরণে হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

হিউএন্-সাঙের সময় হর্ষের রাজধানী কনৌজ **একটি** সমৃদ্ধ নগর ছিল। প্রাচীন পাটলিপুত্রের তখন ধ্বংসাবস্থা। কিন্তু মগধের অন্তর্গত **নালন্দা** (বিহারের অন্তর্গত বড়গাঁও) নামক স্থানে একটি সুবৃহৎ **বিশ্ববিদ্যালয়** গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহা তৎকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আগমন করিত। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত **শীলভদ্র**; সে যুগে তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হিউএন-সাং বহুদিন তাঁহার ছাত্ররূপে নালন্দায় অবস্থান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নালন্দা

হিউএন-সাং ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র এবং হর্ষের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হর্ষের রাজ্যে শ্রমিকগণকে বিনা বেতনে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হইত না। রাজপ্রাপ্য করের পরিমাণ অত্যধিক ছিল না। হর্ষ রাজ্যের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অপরাধীর কারাদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু হর্ষ উত্তরাপথ হইতে দস্যু-তস্করের উপদ্রব সম্পূর্ণ দূর করিতে সমর্থ হন নাই। বিদেশী পর্য্যটক হিউএন-সাংকে কয়েকবার দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

হর্ষের শাসন-প্রণালী

হিউএন-সাংকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য হর্ষবর্দ্ধন রাজধানী **কনৌজে** একটি বিরাট্ **ধর্ম্মসম্মেলন** আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে বহুসংখ্যক ভিক্ষু (বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী), ব্রাহ্মণ ও জৈন-সন্ন্যাসী এবং অনেক সামন্ত নৃপতি উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বুদ্ধের একটি সুবৃহৎ স্বর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তিসহ প্রত্যহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইত। হর্ষ স্বয়ং ঐ মূর্ত্তির মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া স্বর্ণ, মুদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইতেন। সামন্ত রাজগণ তাঁহার অনুগমন করিতেন। অতঃপর ভোজ এবং ধর্ম্মসভার অধিবেশন

কনৌজের সম্মেলন

হইত। ঐ সভায় ধর্ম্মাচার্য্যগণ নানা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। একমাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। হিউএন-সাং লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে একদিন ব্রাহ্মণগণ হর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নিষ্ফল ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল।

প্রয়াগের সম্মেলন

কনৌজের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে হর্ষ চীনদেশীয় পরিব্রাজককে লইয়া **প্রয়াগে** (অর্থাৎ এলাহাবাদে) উপস্থিত হন। এই স্থানে একটি বিরাট্ প্রান্তরে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি **মহোৎসব** অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রান্তরের নাম ছিল 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র'। হিউএন-সাং লিখিয়াছেন যে, এই উৎসবে বুদ্ধ, সূর্য্য এবং শিবের মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইত, এবং হর্ষ তাঁহার স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রার্থীকে দান করিয়া নিঃশেষ করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন একজন নিষ্ঠাবান্ দানবীর ছিলেন। তিনি আপন অঙ্গের বস্ত্রালঙ্কার পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন; পরে একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হর্ষের পরে উত্তর-ভারতের অবস্থা

যশোবর্ম্মা ও মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের যুদ্ধ—আনুমানিক ৭৪০			
প্রথম ভোজ	...	"	৮৩৬-৯০
প্রথম মহেন্দ্র পাল	...	"	৮৯০-৯১০

যশোবর্ম্মা—(Yasovarman)—হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যশোবর্ম্মা নামক একজন রাজা কনৌজের পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি গৌড় এবং মগধের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা আপন অমাত্যকে চীনসম্রাটের নিকট দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্বানের সমাদর করিতেন। 'উত্তরচরিত' এবং 'মালতীমাধব' নাটকের রচয়িতা **ভবভূতি** এবং 'গউড়বহ' (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যের প্রণেতা **বাক্‌পতিরাজ** তাহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয় ও বিদ্যানুরাগ

কাশ্মীর—যশোবর্ম্মার গৌরব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে কাশ্মীরের **কার্কোট** বংশীয় রাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। আনুমানিক ৭৪০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী রাজা **মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য** কনৌজ আক্রমণ করিয়া যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করেন। তিনি তিব্বতের কিয়দংশ পর্য্যন্ত জয় করেন। তাঁহার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে কাশ্মীরের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের সুবিখ্যাত **মার্ত্তণ্ড মন্দির** তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। মুক্তাপীড়ের পৌত্র **জয়াপীড় বিনয়াদিত্য** পুনর্ব্বার কনৌজ আক্রমণ করেন। কথিত আছে, জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্দ্ধন (অর্থাৎ উত্তর-বাংলা) পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই কাহিনী সত্য বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তীকালে কাশ্মীর রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের রাজনীতিক্ষেত্রে আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

মুক্তাপীড় ও জয়াপীড়

গুর্জ্জর প্রতীহার বংশ—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে তিনটি প্রবল রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছিল—দাক্ষিণাত্যের **রাষ্ট্রকূট** রাজ্য, রাজপুতানা অঞ্চলের **গুর্জ্জর-প্রতীহার** রাজ্য এবং গৌড়-মগধের **পাল**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ

(আসাম)

বর্ত্তমান আসাম প্রাচীনকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। কামরূপরাজ **ভাস্করবর্ম্মা** হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক এবং অনুগত মিত্র ছিলেন। তিনি গৌড়রাজ শশাঙ্ক অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। ভাস্করবর্ম্মা নিজেকে মহাভারতে উল্লিখিত ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই রাজবংশ নারক বা ভৌমবংশ নামে পরিচিত। বর্ত্তমান গৌহাটির নিকটবর্ত্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তৎকালে কামরূপের রাজধানী ছিল। ভাস্করবর্ম্মার পরে ম্লেচ্ছরাজ সালস্তম্ভ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অধিকার করেন। ম্লেচ্ছবংশীয় রাজগণের মধ্যে **হর্জ্জরবর্ম্মা** সুবিখ্যাত। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমে কামরূপের সিংহাসন পালবংশের হস্তগত হয়। এই পাল বংশের সহিত গৌড়-মগধের পাল বংশের কোন সম্পর্ক নাই। গৌড়-মগধের পালরাজ গোপালের ন্যায় কামরূপেও **ব্রহ্মপাল** নামক জনৈক ব্যক্তি প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গৌড়েশ্বর কুমারপালের অমাত্য বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক কামরূপ বিজিত হয়। সেন বংশের কয়েকজন পরাক্রান্ত রাজাও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান আক্রমণকারিগণ কামরূপের হিন্দুরাজ্য অধিকার করিতে গিয়া বহুবার বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মা

আসামের পালবংশ

Model Questions

1. Sketch briefly the history of the Palas of Bengal.
2. What do you know of the Sena kings of Bengal?
3. Write notes on : (a) Dharmapala, (b) Devapala, (c) Ballalasena, (d) Lakshmanasena, (e) Bhaskaravarman, (f) Divya and Bhima and (g) Adisura.

নবম অধ্যায়

মুসলমান আক্রমণকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ—উত্তর-ভারত

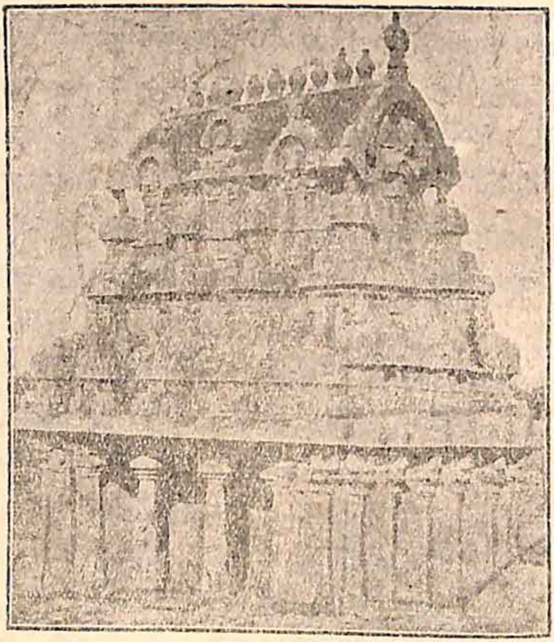
চন্দেল্ল ধঙ্গ	...	...আনুমানিক	৯৫৩-১০০২
চেদি কর্ণ	... ...	,,	১০৪১-৭১
পরমার ভোজ	... ...	,,	১০১০-৫৫
চৌলুক্য জয়সিংহ সিদ্ধরাজ	...	,,	১০৯৪-১১৪৪
চৌলুক্য কুমার পাল	...	,,	১১৪৪-৭৩
গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র	...	,,	১১১৪-৫৫
গাহড়বাল জয়চন্দ্র	...	,,	১১৭০-৯৩
চৌহান তৃতীয় পৃথ্বীরাজ	...	,,	১১৭৯-৯২

চন্দেল্ল বংশ—পূর্ব্ব ভারতে যখন পাল এবং সেন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশে কনৌজের প্রতীহার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। জেজাকভুক্তি অর্থাৎ বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল নামক রাজপুত বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। দুর্ভেদ্য **কালঞ্জর** (কালিঞ্জর) দুর্গ এবং **মহোবা** ও **খজুরাহো** নগর চন্দেল্ল-প্রভুত্বের কেন্দ্র ছিল। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি **ধঙ্গ** (আনুমানিক ৯৫৩-১০০৯) খজুরাহো নগরে অনেক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং কনৌজরাজকে পরাজিত করিয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার পৌত্র **বিদ্যাধর** (আনুমানিক ১০১০-২৫) গজনীর সুপ্রসিদ্ধ সুল্‌তান মহ্‌মুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন আইবক কালঞ্জর জয় করিয়া চন্দেল্লশক্তির অধঃপতন সূচিত করেন। ধঙ্গ প বিদ্যাধর

চেদি বংশ—মধ্য ভারতে ডাহল দেশের অন্তর্গত (বর্ত্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী) **ত্রিপুরী** (তেওয়ার) নগরে চেদি, **হৈহয়** বা **কলচুরি** নামক বংশের রাজপুত রাজগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাতাপি বিজয়ী নরসিংহবর্ম্মা

বাতাপি অধিকার করেন এবং সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন।



পল্লবগণের নির্ম্মিত গণেশ রথ

* **রাষ্ট্রকূট বংশ**—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যশক্তি ধ্বংস করিয়া **দন্তিদুর্গ** রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময়ে ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণের পৌত্র **তৃতীয় গোবিন্দ** (৭৯৪-৮১৫) রাষ্ট্রকূট বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট এবং পল্লবরাজ দন্তিবর্ম্মাকে পরাজিত করেন। গৌড়-মগধের সম্রাট্ ধর্ম্মপাল তাঁহার প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র **প্রথম অমোঘবর্ষ** (৮১৫-৭৮) বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যে অবস্থিত মান্যখেট (মালখেড়) নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র **তৃতীয় ইন্দ্র** (৯১৪-২৭) কনৌজ আক্রমণ করিয়া প্রতীহার-রাজ মহীপালকে

কৈলাসনাথ মন্দির

তৃতীয় গোবিন্দ

পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা **তৃতীয় কৃষ্ণ** চোলগণকে পরাজিত করিয়া সুদূর-দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট-প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে পুনরায় চালুক্য-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আরব লেখকগণের মতে সে যুগে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন চারিজন—চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা, রুম অর্থাৎ কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান এবং মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটরাজ। আরবগণের সাক্ষ্য

Model Questions

1. Give an estimate of Harshavardhana as a conqueror, a philanthropist and a patron of learning.

2. Write an account of the services rendered to Buddhism by Asoka, Kanishka and Harshavardhana.

3. What light does the account of Hiuen-tsang throw on the religious, social and political condition of India in the 7th century A. D.?

4. Write notes on : (a) Assemblies of Prayaga and Kanauj, (b) Yasovarman, (c) Lalitaditya, (d) the Gurjara-Pratiharas of Kanauj, (e) Pulakesin II, (f) the Pallavas of Kanchipura, (g) Hiuen-tsang. (h) the Chalukyas of Badami, and (i) the Rashtrakutas.

———

অষ্টম অধ্যায়

পূর্ব্ব-ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ—গৌড়-মগধের পাল বংশ

বাংলায় অরাজকতা

পাল বংশের প্রতিষ্ঠা—শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দেশে কোন প্রবল রাজশক্তি ছিল না। দেশে **মাৎস্য-ন্যায়** (অর্থাৎ দুর্ব্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার) প্রবল হইয়া উঠিল। কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিল না। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের প্রধানগণ **গোপাল** নামক একজন ক্ষমতাশালী নায়ককে পূর্ব্ববাংলার **রাজা নির্ব্বাচন** করিলেন। গোপালই বিখ্যাত পাল বংশের প্রথম রাজা। তিনি রাজা হইয়া দেশের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করিলেন এবং বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ জয় করিলেন। গোপাল একজন ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি **উদ্দণ্ডপুর** (পাটনা জেলার অন্তর্গত বিহার) নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ **বিহার** নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

গোপাল

দিগ্বিজয়

ধর্ম্মপাল—(আনুমানিক ৭৬৯-৮১৫)—গোপালের পুত্র পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বিশ্রুতকীর্ত্তি ধর্ম্মপাল একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে জলন্ধর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বাংলার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম্মপাল কনৌজ রাজ্য জয় করিয়া চক্রায়ুধ নামক এক ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশে ধর্ম্মপালের প্রভুত্ব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। পাল বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট ধর্ম্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া কনৌজ অধিকার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণে অগ্রসর হইলে, ধর্ম্মপালকে নতি স্বীকার

করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাচীন **পাটলিপুত্র** নগরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ **বিক্রমশীল বিহার** তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোনও পণ্ডিতের মতে ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত পাথরঘাট নামক স্থানই প্রাচীন বিক্রমশীল বা বিক্রমশিলা।

পালরাজগণের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা :—

(১) প্রথম গোপাল (আনুমানিক ৭৬৫-৬৯)

(২) ধর্ম্মপাল (আনুমানিক ৭৬৯-৮১৫) বাক্‌পাল

(৩) দেবপাল („ ৮১৫-৫৪) জয়পাল

(৪) প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল (আনুমানিক ৮৫৪-৫৭)

(৫) নারায়ণপাল (আনুমানিক ৮৫৭-৯১১)

(৬) রাজ্যপাল („ ৯১১-৩৫)

(৭) দ্বিতীয় গোপাল („ ৯৩৫-৯২)

(৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল („ ৯৯২)

(৯) প্রথম মহীপাল („ ৯৯২-১০৪০)

(১০) নয়পাল („ ১০৪০-৫৫)

(১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল („ ১০৫৫-৮১)

(১২) দ্বিতীয় মহীপাল (আঃ ১০৮১-৮২) (১৩) দ্বিতীয় শূরপাল (আঃ ১০৮৩) (১৪) রামপাল (আঃ ১০৮৪-১১২৭)

দেবপাল (আনুমানিক ৮১৫-৫৪)—দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ধর্ম্ম-পালের মৃত্যুর হইলে তাঁহার পুত্র দেবপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও একজন পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গেরে তাঁহার সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার সেনাপতি **লাউসেন** বা লবসেন আসাম এবং উড়িষ্যা জয় করেন। সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার বৌদ্ধ রাজা বালপুত্রদেব সম্রাট্ দেবপালের রাজত্বকালে নালন্দায় একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়



প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি

পরবর্ত্তী পালরাজগণ—দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিল না। তাঁহার পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র **প্রথম বিগ্রহপাল** (বা **প্রথম শূরপাল**) এবং বিগ্রহপালের পুত্র **নারায়ণপাল** ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কনৌজের প্রতীহার-রাজগণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশ জয় করিতে অগ্রসর হন। প্রতীহার-নৃপতি ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল কিয়ৎকালের জন্য নারায়ণপালের হস্ত

বাংলায় প্রতীহার অধিকার

হইতে মগধ এবং উত্তর বাংলা কড়িয়া লইয়াছিলেন। শীঘ্রই **কম্বোজ** নামক এক জাতির অভ্যুদয়ে পালরাজগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। কম্বোজবংশীয় এক রাজা আপনাকে গৌড়ের অধিপতি বলিয়া দাবী করিলেন। পূর্ব্ব-বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল বংশের নবম রাজা **প্রথম মহীপাল** (আনুমানিক ৯৯২-১০৪০) কিছু কালের জন্য পাল বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম মহীপাল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি সুদূর-দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত নরপতি চোলবংশীয় প্রথম রাজেন্দ্রের আক্রমণ হইতে আপনার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম্মপাল প্রমুখ কয়েক জন আচার্য্য **তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার** করিতে গমন করেন।

কম্বোজ অধিকার

চোল আক্রমণ

এই সময়ে পূর্ব্ব-বাংলায় **চন্দ্র বংশ** এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় **শূর বংশ** রাজত্ব করিতেছিল। শূর বংশের রাজা **আদিশূর** সম্বন্ধে বাংলা দেশে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **নয়পাল** (আনুমানিক ১০৪০-৫৫) রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে চেদি-রাজ কর্ণ পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। **অতীস দীপঙ্কর** বা **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান** নামক বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্যের চেষ্টায় কর্ণ এবং নয়পালের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। দীপঙ্কর পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সন্ধি স্থাপিত হইলে, রাজপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদিরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নয়পালের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে **তৃতীয় বিগ্রহপাল** (আনুমানিক ১০৫৫-৮১) এবং **দ্বিতীয় মহীপাল** (আনুমানিক ১০৮১-৮২) রাজা হন। দ্বিতীয় মহীপালের অবিবেচনার ফলে পাল রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইল। চন্দ্রবংশের পতনের পর **বর্ম্মা বংশ** পূর্ব্ব বাংলায় প্রবল হইয়া উঠে। এদিকে **দিব্য** বা **দিব্বোক** নামক জনৈক কৈবর্ত্ত-জাতীয় রাজপুরুষের নায়কতায় বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবাংলার প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের সহিত সংঘর্ষে দ্বিতীয় মহীপাল

চেদি আক্রমণ

উত্তর বাংলায় কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ

পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর দিব্য ও তঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র **ভীম** উত্তর-বাংলা অধিকার করিয়া রহিলেন। আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের ন্যায় দিব্যও প্রজাগণের দ্বারা রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই অনুমানের সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার পর তৃতীয়

পাল বংশের অধঃপতন

বিগ্রহপালের অপর পুত্র **রামপাল** (আনুমানিক ১০৮৪-১১২৬) ভীমকে নিহত করিয়া বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন ; কিন্তু শীঘ্রই সেনবংশীয় বিজয়সেনের পরাক্রমে পাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল।

পাল বংশের সময়ে সংস্কৃতির অবস্থা—পালরাজগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমশীল বা বিক্রমশিলা, উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারসমূহ তাঁহাদের সময়েই স্থাপিত হয়। তাঁহাদের শাসনকালে ধর্ম্মপাল, দীপঙ্কর প্রমুখ বৌদ্ধাচার্য্যগণের চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 'চক্রদত্ত' নামক প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ রচয়িতা বৈদ্য **চক্রপাণি দত্ত** নয়পালের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি **সন্ধ্যাকর নন্দী**

সাহিত্য ও শিল্প

রামপালের জীবনী অবলম্বনে 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক দ্ব্যার্থকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হন। পালরাজগণের সময়ে বাংলার শিল্পকলায় একটি বিশিষ্ট রীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময়ে ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের সময়েই একবার বাঙালীর রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর যবদ্বীপ পর্য্যন্ত পালরাজগণের যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গৌড়-বঙ্গের সেন বংশ

সেন বংশের প্রতিষ্ঠা—একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পাল বংশকে হতবল করিয়া সেনবংশীয় **বিজয়সেন** (আনুমানিক ১০৯৭-১১৫৯) বাংলা দেশে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট (কানাড়া) দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ; কিন্তু বাংলা দেশে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। বিজয়সেনের পিতামহ **সামন্তসেন** (আনুমানিক ১০৫০-৭৫) পশ্চিম বাংলায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়সেন প্রাচীন শূরবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি হীনবল পালরাজকে পরাজিত করিয়া বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তীরভুক্তি (ত্রিহুত), কামরূপ (আসাম) ও কলিঙ্গের (উড়িষ্যা) রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কেহ কেহ সপ্তগ্রামকে, কেহ বা রাজসাহীর নিকটবর্ত্তী বিজয়নগর গ্রামকে প্রাচীন বিজয়পুর বলিয়া মনে করেন। পরে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে সেনরাজগণের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রাধান্যের সূচনা

দিগ্বিজয়

রাজধানী

বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৯-৮৫)—বিজয়সেনের শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেন সেন বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নরপতি। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে বল্লালের স্থান অতি উচ্চে। প্রবাদ আছে, তিনি এদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণের মধ্যে **কৌলিন্য** প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয় নাই। বল্লালসেনের রচিত 'দানসাগর' এবং 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। শোনা যায়, বল্লাল সেন মগধ, ভুটান, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা এবং নেপালে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপাল নামক গ্রামে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

কৌলিন্য প্রথা

লক্ষ্মণসেন (আনুমানিক ১১৮৫-১২০৬)—বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সেন বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা। কামরূপের অধিপতি এবং কাশীরাজ (অর্থাৎ কনৌজের গাহড়বালবংশীয় রাজা) লক্ষ্মণসেনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ এবং বিদ্যোৎসাহী

নরপতি ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' প্রণেতা **জয়দেব** প্রভৃতি অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কথিত আছে, বল্লালের অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ লক্ষ্মণসেন কর্তৃক সম্পূর্ণ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন নৃসিংহ অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসনার অনুরাগী ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেন ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত 'নূদীয়া' (নবদ্বীপ) নগরীতে বাস করিতেন এবং তিনি হিন্দুস্থানের রাজগণের নিকট খলিফার তুল্য শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। অনেকে মনে করেন, ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে **লক্ষ্মণ-সংবৎ** নামক যে অব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ

(বিদ্যানুরাগ)

সেনরাজগণের বংশলতা ঃ—

(১) সামন্তসেন (আনুমানিক ১০৫০-৭৫)
|
(২) হেমন্তসেন (" ১০৭৫-৯৭)
|
(৩) বিজয়সেন (" ১০৯৭-১১৫৯)
|
(৪) বল্লালসেন (" ১১৫৯-৮৫)
|
(৫) লক্ষ্মণসেন (" ১১৮৫-১২০৬)
|
(৬) বিশ্বরূপসেন (১২০৬ ২৫) — (৭) কেশবসেন (১২২৫-[illegible])

হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধারণা সত্য নহে। কারণ, লক্ষ্মণসেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল। ইখ্‌তিয়ার্‌উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার (অর্থাৎ বখ্‌তিয়ারের পুত্র ইখ্‌তিয়ার্‌উদ্দীন মুহম্মদ) নামক মুহম্মদ ঘুরীর জনৈক সেনানী বিহার জয় করিয়া বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে মুহম্মদ 'নূদীয়া' অধিকার করিয়া বাংলায় মুসলমান প্রভুত্বের সূত্রপাত করিলেন। রায় 'লখ্‌মনীয়া'

(মুসলমান বিজয়)

অর্থাৎ রাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ব-বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত সেনবংশীয় রাজগণ ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব-বাংলা শাসন করিয়াছিলেন।



লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্ম্মিত চণ্ডীমূর্ত্তি

লক্ষ্মণসেনের পুত্র **বিশ্বরূপসেন** (আনুমানিক ১২০৬-২৫) এবং **কেশবসেন** (আনুমানিক ১২২৫-৩০) শক্তিশালী নরপতি ছিলেন।

সেনরাজগণের যুগে সংস্কৃতির অবস্থা—সেনরাজগণ বিদ্যানুরাগী এবং হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লালসেন একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং সুকবি ছিলেন; তাঁহার রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধরদাস, উমাপতিধর প্রভৃতি সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের সময়ে উত্তর-বাংলার অধিবাসী শূলপাণি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। কথিত আছে, বল্লালসেন হিন্দুসমাজের সংস্কার করিয়া এবং নানাদেশে হিন্দু প্রচারক পাঠাইয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগ, সন্দেহ নাই। সাহিত্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ
(আসাম)

বর্ত্তমান আসাম প্রাচীনকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। কামরূপরাজ **ভাস্করবর্ম্মা** হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক এবং অনুগত মিত্র ছিলেন। তিনি গৌড়রাজ শশাঙ্ক অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। ভাস্করবর্ম্মা নিজেকে মহাভারতে উল্লিখিত ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই রাজবংশ নারক বা ভৌমবংশ নামে পরিচিত। বর্ত্তমান গৌহাটির নিকটবর্ত্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তৎকালে কামরূপের রাজধানী ছিল। ভাস্করবর্ম্মার পরে ম্লেচ্ছরাজ সালস্তম্ভ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অধিকার করেন। ম্লেচ্ছবংশীয় রাজগণের মধ্যে **হর্জ্জরবর্ম্মা** সুবিখ্যাত। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমে কামরূপের সিংহাসন পালবংশের হস্তগত হয়। এই পাল বংশের সহিত গৌড়-মগধের পাল বংশের কোন সম্পর্ক নাই। গৌড়-মগধের পালরাজ গোপালের ন্যায় কামরূপেও **ব্রহ্মপাল** নামক জনৈক ব্যক্তি প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গৌড়েশ্বর কুমারপালের অমাত্য বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক কামরূপ বিজিত হয়। সেন বংশের কয়েকজন পরাক্রান্ত রাজাও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান আক্রমণকারিগণ কামরূপের হিন্দুরাজ্য অধিকার করিতে গিয়া বহুবার বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মা

আসামের পালবংশ

Model Questions

1. Sketch briefly the history of the Palas of Bengal.
2. What do you know of the Sena kings of Bengal?
3. Write notes on : (a) Dharmapala, (b) Devapala, (c) Ballalasena, (d) Lakshmanasena, (e) Bhaskaravarman, (f) Divya and Bhima and (g) Adisura.

নবম অধ্যায়

মুসলমান আক্রমণকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ—উত্তর-ভারত

চন্দেল্ল ধঙ্গ	...	...আনুমানিক		৯৫৩-১০০২
চেদি কর্ণ	...	...	,,	১০৪১-৭১
পরমার ভোজ	...	...	,,	১০১০-৫৫
চৌলুক্য জয়সিংহ সিদ্ধরাজ		...	,,	১০৯৪-১১৪৪
চৌলুক্য কুমার পাল		...	,,	১১৪৪-৭৩
গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র		...	,,	১১১৪-৫৫
গাহড়বাল জয়চন্দ্র		...	,,	১১৭০-৯৩
চৌহান তৃতীয় পৃথ্বীরাজ		...	,,	১১৭৯-৯২

চন্দেল্ল বংশ—পূর্ব্ব ভারতে যখন পাল এবং সেন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশে কনৌজের প্রতীহার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। জেজাকভুক্তি অর্থাৎ বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল নামক রাজপুত বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। দুর্ভেদ্য **কালঞ্জর** (কালিঞ্জর) দুর্গ এবং **মহোবা** ও **খজুরাহো** নগর চন্দেল্ল-প্রভুত্বের কেন্দ্র ছিল। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি **ধঙ্গ** (আনুমানিক ৯৫৩-১০০৯) খজুরাহো নগরে অনেক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং কনৌজরাজকে পরাজিত করিয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার পৌত্র **বিদ্যাধর** (আনুমানিক ১০১০-২৫) গজনীর সুপ্রসিদ্ধ সুল্‌তান মহ্‌মুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন আইবক কালঞ্জর জয় করিয়া চন্দেল্লশক্তির অধঃপতন সূচিত করেন। ধঙ্গ প বিদ্যাধর

চেদি বংশ—মধ্য ভারতে ডাহল দেশের অন্তর্গত (বর্ত্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী) **ত্রিপুরী** (তেওয়ার) নগরে চেদি, **হৈহয়** বা **কলচুরি** নামক বংশের রাজপুত রাজগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সহ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং ইল্‌তুৎমিস্‌কে খলিফার অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

চরিত্র—প্রায় ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হয়। তিনি দাস বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তাঁহার কৃতিত্বের ফলেই ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার চরিত্রে বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্পপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুতব্‌মিনারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করেন।

বিদ্যা ও শিল্পানুরাগ

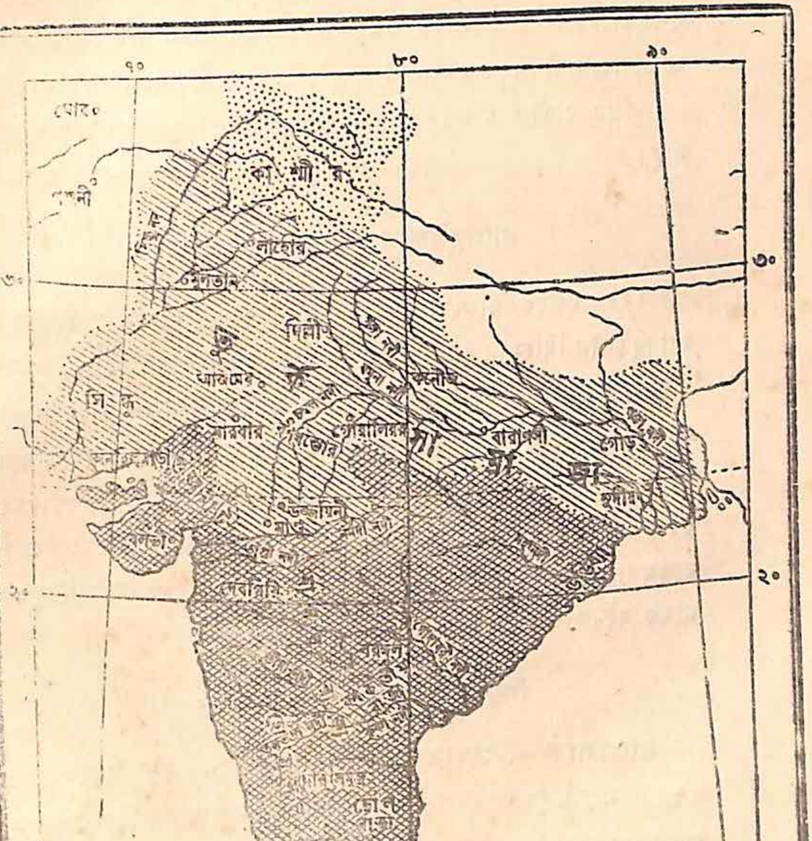
রজিয়া (১২৩৬-৪০)

* **রাজ্যলাভ**—ইল্‌তুৎমিসের পুত্রগণ সকলেই অকর্ম্মণ্য ছিলেন। এজন্য তিনি স্বয়ং নিজের কন্যা রজিয়াকে আপনার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান। রজিয়া নানাবিধ রাজোচিত গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং পিতার সহকারীরূপে রাজকার্য্যে যোগদান করিয়া শাসন-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর ওম্‌রাহ্‌গণ স্ত্রীলোকের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; **রুক্‌ন্‌উদ্দীন ফীরূজ** নামক ইল্‌তুৎমিসের এক পু॰ তাঁহাদের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিলেন। কিছুদিন পরে রুক্‌ন্‌উদ্দীনের অকর্ম্মণ্যতা এবং তাঁহার মাতার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া এক দল ওম্‌রাহ্‌ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রজিয়াকে রাজ্যভার প্রদান করেন।

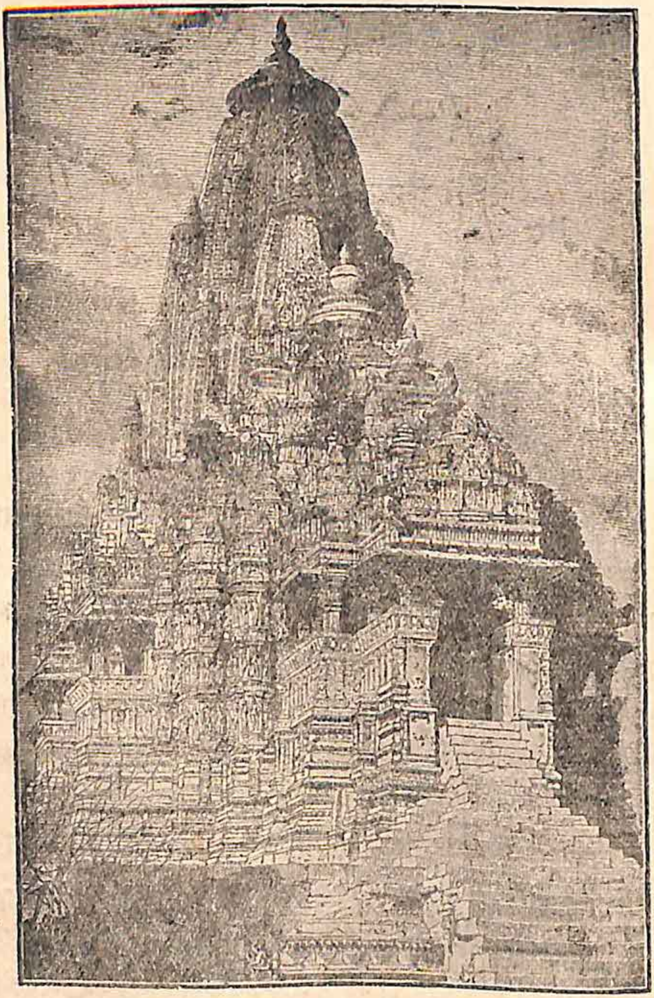
রুক্‌ন্ উদ্দীনের রাজত্ব

রাজ্যচ্যুতি—রজিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াই যুদ্ধ ও কূটনীতির সাহায্যে বিরুদ্ধবাদী ওম্‌রাহ্‌দিগকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন এবং পুরুষের সাজে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ্য সভায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার কঠোর শাসনে ও পুরুষোচিত আচার-ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ওম্‌রাহ্‌গণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ফলে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পর

রজিয়ার পতন



ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা এই মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাশ্মীর, রাজপুতনার কিয়দংশ, আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাত এবং দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে তুর্কি-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



মহাদেবের মন্দির—খজুরাহো

গাঙ্গেয়দেব এবং তৎপুত্র **কর্ণ** বা লক্ষ্মীকর্ণ (আনুমানিক ১০৪১-৭১) এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। চন্দেল্লরাজ্যে কর্ণের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি বাংলার বীরভূম জিলা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কর্ণ বাংলা দেশের পাল এবং বর্ম্মা বংশীয় দুইজন রাজার সহিত দুই কন্যার বিবাহ দেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে এই রাজবংশ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। কর্ণ

পরমার বংশ—দশম শতাব্দীর শেষাংশে মালব দেশে **মুঞ্জ** নামক রাজার নায়কতায় **ধারা** নগরীর পরমারগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। **ভোজরাজ** (আনুমানিক ১০১০-৫৫) এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি। ভোজের পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যানুরাগ এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, এদেশের আদর্শ বিদ্যোৎসাহী নরপতি শকারি বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তীর সহিত তাঁহার অনেক কাহিনী জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিভাশালী নরপতি ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, রাজনীতি, দর্শন, জ্যোতিষ এবং স্থাপত্য বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ভোজপুরে একটি বিশাল হ্রদ খনন করেন। ভোজকর্ত্তৃক তুরুষ্ক (অর্থাৎ মুসলমান) আক্রমণকারিগণ পরাজিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণে কোঙ্কন উপকূল পর্য্যন্ত পরমারগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ জীবনে ভোজ কল্যাণীর চালুক্যরাজ সোমেশ্বর, চেদিরাজ কর্ণ এবং গুজরাতের চৌলুক্যরাজ প্রথম ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে গুজরাতের চৌলুক্যগণ মালব অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালবে দিল্লীর দাসবংশীয় সুল্‌তান ইলতুৎমিসের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। রাজ ভোজ

চৌলুক্য (বা **চালুক্য**) **বংশ**—দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চৌলুক্য বা **সোলংকী** নামক রাজপুত বংশ গুজরাতে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। **অণহিলপাটক** বা অন্‌হিলবাড়া (বর্ত্তমান পাটন) নামক নগরে চৌলুক্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুল্‌তান মহ্‌মূদ যখন গুজরাতের সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন, তখন চৌলুক্যরাজ **প্রথম ভীম** (১০২২-৬৪) পরাক্রান্ত ভীম,

মুসলমান আক্রমণকারীর কবল হইতে হিন্দুমন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। মালব-বিজেতা **জয়সিংহ সিদ্ধরাজ** (আনুমানিক ১০৯৪-১১৪৪) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী **কুমারপাল** (১১৪৪-৭৩) এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক কুমারপাল জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

জয়সিংহ ও কুমারপাল

কিছুকাল পরে গুজরাতের চৌলুক্য রাজ্য ধীরে ধীরে চৌলুক্যবংশের **বাঘেলা** শাখার হস্তগত হয়। বাঘেলা রাজগণের মধ্যে **বিশালদেব** প্রথম 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। বিশালদেবের পিতা **বীরধবল** মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। বীরধবলের দুইজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী মন্ত্রী গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং আবু পর্ব্বতে অনেক সুদৃশ্য জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। বিশালদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র **অর্জ্জুন** ওরমুজের একজন মুসলমান নাবিককে সোমনাথে একটি মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। অর্জ্জুনের পৌত্র **দ্বিতীয় কর্ণ** দিল্লীর সুল্‌তান আলাউদ্দিন খল্‌জীর সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন (১২৯৭); ফলে গুজরাতে মুসলমান **শাসন** প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঘেলা অর্জ্জুন

গাহড়বাল বংশ—সুল্‌তান মহ্‌মুদের আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে কনৌজের প্রতীহারশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে গাহড়বালবংশীয় রাজপুতগণ **বারাণসী** অঞ্চলে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের অধিকার পশ্চিমদিকে কনৌজ ও দিল্লী অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা **গোবিন্দচন্দ্র** (আনুমানিক ১১১৪-৫৫) পূর্ব্বদিকে মুঙ্গের পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বারাণসী প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ তাঁহার পরাক্রমে তুরুষ্ক অর্থাৎ মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র **জয়চ্চন্দ্র** (আনুমানিক ১১৭০-৯৩) তৎকালীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে আজমের ও দিল্লীর চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ গাহড়বাল বংশের প্রবল শত্রু ছিলেন। কথিত আছে, জয়চ্চন্দ্র মুহম্মদ ঘূরীকে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু

গোবিন্দচন্দ্র

জয়চ্চন্দ্র

মুসলমানগণ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া জয়চ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল! ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ইটাবা জেলার চন্দ্রাবর (চন্দ্‌বার) নামক স্থানের যুদ্ধে গাহড়বালরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সমগ্র গাহড়বালরাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল।

চৌহান বংশ—আজ্‌মেরএবং **শাকম্ভরী** অর্থাৎ সাম্ভরের **চাহমান** বা চৌহানবংশীয় রাজপুত নৃপতি **চতুর্থ বিগ্রহরাজ** দিল্লী জয় করিয়া চৌহান অভ্যুদয়ের সূচনা করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় **পৃথ্বীরাজ** (আনুমানিক ১১৭৯-৯২) এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি। পৃথ্বীরাজ
'পৃথ্বীরাজবিজয়' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, পৃথ্বীরাজের সভাকবি **চন্দ্‌বরদাই** রচিত



পৃথ্বীরাজ (প্রাচীন চিত্র হইতে)

'চন্দ-রাইসা' বা 'পৃথ্বীরাজরাইসা' নামক হিন্দি কাব্য, এবং উত্তর-ভারতে প্রচলিত বহু গাথা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা জানা যায়। তিনি চন্দেল্লবংশীয় পরমর্দীকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি স্বয়ংবর সভা হইতে গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্রের কন্যা **সংযোগিতাকে** হরণ করিয়া

বিবাহ করেন, এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্যই জয়চ্চন্দ্র মুহম্মদ ঘূরীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী **তরাঈন** বা **তলাবরী** রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ মুহম্মদকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। পর বৎসর পরাজয়ের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য বিরাট সৈন্যদল লইয়া মুহম্মদ পুনরায় পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবারও তরাঈনের রণক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিল্লীতে মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপিত হইল (১১৯২-৯৩)।

মুসলমান বিজয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ—দক্ষিণভারত

অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ	...	আনুমানিক	১০৭৮-১১৪৭
যাদব সিংঘন	...	„	১২১০-৪৭
হোয়্সল দ্বিতীয় বীরবল্লাল	...	„	১১৭৩-১২২০

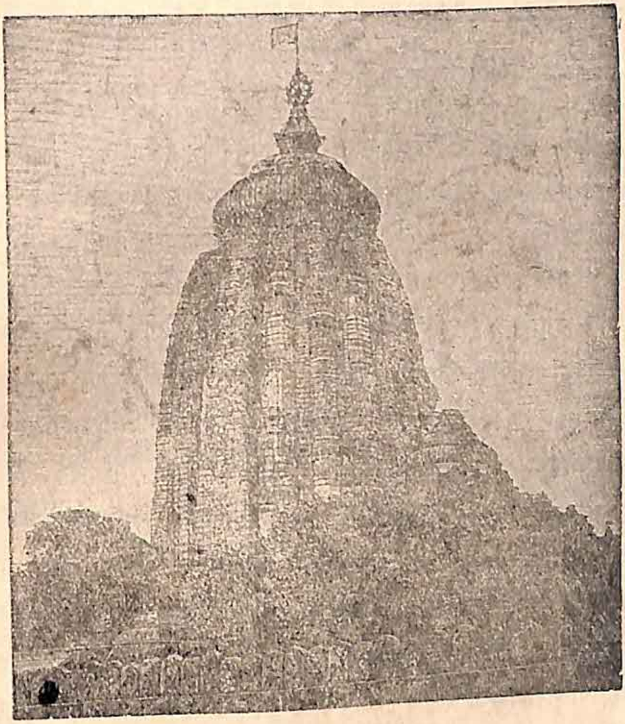
প্রাচ্য গঙ্গ বংশ—৫০০ খৃষ্টাব্দের কিছুৎকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশ কলিঙ্গের প্রাচ্য গঙ্গ বংশ (Eastern Gangas) নামে বিখ্যাত। একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজগণ তৎকালীন ভারতের একটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই বংশের **অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ** (আনুমানিক ১০৭৮—১১৪৭) গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, পুরীতে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য তাঁহার শাসনকালে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজগণের পরাক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণ উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

অনন্তবর্ম্মার রাজ্য

চালুক্য বংশ—দশম শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া পুনরায় চালুক্যগণ এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহারা **কল্যাণীর উত্তরকালীন চালুক্য** (Later Chalukyas of Kalyani) নামে প্রসিদ্ধ। এই সময়ে সুদূর-দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে, দক্ষিণ-ভারতের আধিপত্য লইয়া চালুক্য এবং চোল রাজগণের মধ্যে দীর্ঘকাল-

চোল-চালুক্য বিরোধ

ব্যাপী বিরোধ চলিয়াছিল। চালুক্যবংশীয় **সোমেশ্বর** চোলদিগকে পরাজিত করেন (১০৫২) এবং বর্ত্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যে অবস্থিত কল্যাণ বা



জগন্নাথের মন্দির—পুরী

কল্যাণী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। সোমেশ্বরের পুত্র **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য** (১০৭৬-১১২৭) পরাক্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' রচয়িতা কবি বিহ্লণ এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির 'মিতাক্ষরা' টীকা রচয়িতা প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অযোগ্য বংশধরকে বিতাড়িত করিয়া তদীয় **কলচুর্য্য** বংশীয় সেনাপতি **বিজ্জল** চালুক্য-রাজ্যের অধিকাংশ হস্তগত করেন। **বসব** নামক তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী **বীরশৈব** বা **লিঙ্গায়ৎ** সংজ্ঞক শৈব সম্প্রদায়ের আদি গুরু ছিলেন। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে কল্যাণীর চালুক্য বংশ ধ্বংস হইলে মহারাষ্ট্রে

চালুক্য বংশের অধঃপতন

যাদবগণ, মহিষূরে **হোয়্‌সলগণ** এবং তেলেগু বা অন্ধ্রদেশে **কাকতীয়গণ** প্রবল হইয়া উঠে।

যাদব বংশ—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে **দেবগিরি** বা দৌলতাবাদকে কেন্দ্র করিয়া যাদবগণ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা **সিংঘন** (১২১০-৪৭) উত্তরে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত যাদব বংশের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র চঙ্গদেব একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিংঘনের পৌত্র **রামচন্দ্র** এই বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁহার রাজত্বকালে হেমাদ্রি, বোপদেব ও জ্ঞানেশ্বর নামক পণ্ডিতগণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুল্‌তান জলাল্‌উদ্দীন খল্‌জীর ভ্রাতুষ্পুত্র **আলাউদ্দীন** রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। খল্‌জী বংশের রাজত্বকালেই যাদবরাজ্য দিল্লীর মুসলমান সুল্‌তানের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

সিংঘনের রাজ্য

মুসলমান বিজয়

হোয়্‌সল বংশ—মহিষূরের রাজনীতি-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য গঙ্গদিগের (Western Gangas) পরে হোয়্‌সল বংশীয়গণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। **দোরসমুদ্র** (বর্ত্তমান মহিষূর রাজ্যের অন্তর্গত হলেবীড) তাঁহাদের রাজধানী ছিল। হোয়্‌সল **বিষ্ণুবর্দ্ধন** (আনুমানিক ১১০৬-৪১) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য **রামানুজ** কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র **দ্বিতীয় বীর-বল্লাল** (১১৭৩-১২২০) দেবগিরির পরাক্রান্ত যাদবরাজ ভিল্লমকে পরাজিত করিয়া উত্তরে মলপ্রভা নদী পর্য্যন্ত হোয়্‌সল রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান আলাউদ্দীনের সেনাপতি **মালিক কাফুর** কর্ত্তৃক হোয়্‌সলরাজ **তৃতীয় বীর-বল্লাল** পরাজিত হন। আনুমানিক ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের রাজত্বকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে হোয়্‌সল রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

রামানুজ

কাকতীয় বংশ—কলাণীর চালুক্যগণের অবনতির যুগে অন্ধ্রদেশে (অর্থাৎ তেলুগু-ভাষাভাষীদের দেশে) কাকতীয় বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রথমে **অনুমকোণ্ড** ও পরে **বরঙ্গল** কাকতীয় বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। কাকতীয়রাজ **গণপতি** (১১৯৯-১২৬০)

যাদবরাজ সিংঘনকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত কাকতীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। গণপতির পরে তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা (১২৬০-১২৯১) সিংহাসন লাভ করেন। ভেনিসীয় পর্য্যটক **মার্কো পোলো** রাণী রুদ্রাম্বার শাসনদক্ষতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে রুদ্রাম্বার-দৌহিত্র **দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র** দিল্লীর সুল্‌তান আলাউদ্দিন খল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। রাণী রুদ্রাম্বা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুদূর-দক্ষিণ ভারত

প্রথম রাজেন্দ্র চোল	...	১০১৬-৪৩
জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য	...	১২৫১-৭০

চোল বংশ—সুদূর-দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণ কল্যাণীর চালুক্য রাজাদিগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। **রাজরাজ** (৯৮৫-১০১৬) এবং তাঁহার পুত্র **প্রথম রাজেন্দ্র** (১০১৬-৪৩) চোল বংশের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুইজন চোল রাজা সমুদ্রপথে দিগ্বিজয়ের জন্য বিখ্যাত। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজরাজ আপনার বাহুবলে মহিসূরের অধিকাংশ, বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রায় সমুদয় অংশ এবং সিংহল দ্বীপের কিয়দংশ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নৌসেনাদল ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ জয় করিয়াছিল। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজরাজের দিগ্বিজয়ী পুত্র রাজেন্দ্র মহিসূরের গঙ্গবংশ ধ্বংস করেন। তাঁহার বিজয়বাহিনী পূর্ব্বদিকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পূর্ব্ব-বাংলায় গোবিন্দচন্দ্র, পশ্চিম-বাংলায় মহীপাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় রণশূরকে পরাজিত করিয়াছিল। রাজেন্দ্র চোলের রণতরীবহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মার্ত্তাবান এবং সুমাত্রা ও মালয়ের কতকাংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি 'গঙ্গৈকোণ্ড' (অর্থাৎ গঙ্গবংশ বা গঙ্গাতীর বিজয়ী) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুর নামক স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন।

রাজরাজ

রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়

এই সময় চোলেরা কল্যাণীর চালুক্য রাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বল ক্ষয় করিতে থাকেন। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম রাজেন্দ্রের দৌহিত্র **দ্বিতীয় রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ** চোল-সিংহাসন লাভ করেন। তিনি স্বীয় রাজ্য জরীপ করাইয়া রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ধীরে ধীরে চোল রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে এবং পাণ্ড্য, কাকতীয়, হোয়্সল প্রভৃতি রাজ্যগুলি পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

চোলরাজ্যের পতন

পাণ্ড্য রাজ্য— চোল রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে ভারতবর্ষের সুদূর-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাণ্ড্য রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিল। এই যুগের পাণ্ড্য রাজগণের মধ্যে **জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য** (১৩৫১-৭০) সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ। তিনি সিংহল ও মালয়েশিয়া পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভেনিসীয় পর্য্যটক **মার্কো পোলোর** (১২৮৮ এবং ১২৯৩) বিবরণ হইতে পাণ্ড্য দেশের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যের বিষয় এবং কায়ল নগরের প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়। সেকালে আরব এবং চীন দেশ হইতে বহুসংখ্যক বাণিজ্যপোত কায়ল বন্দরে যাতায়াত করিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দিল্লীর সুল্তান আলাউদ্দীন খল্জীর সেনাপতি মালিক কাফুর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। পরে মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক এই দেশ জয় করেন। এই সময় হইতে কিছুকাল পাণ্ড্য-রাজধানী মদুরা মুসলমান সুল্তানগণের করতলগত ছিল।

সমৃদ্ধি

Model Questions

1. Describe the political condition of India on the eve of the Musalman conquest.

2. Write notes on :

A. (1) the Chandellas, (2) the Paramaras, (3) the Gahadavalas, (4) the Chauhan, (5) the Cholas, (6) the Yadavas.

B. (1) Prithviraj Chauhan, (2) Rajendra Chola I, (3) Karna, (4) Bhoja, (5) Anantavarman Chodaganga, (6) Chalukya Vikramaditya VI, (7) Yadava Singhana, (8) Hoysala Vira Ballala II, (9) Ganapati and Rudramba.

দশম অধ্যায়

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও তাহার বিস্তার

সমাজ—ভারতের আদিম অধিবাসিগণ আর্য্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে যবন (গ্রীক), শক, পারদ, কুষাণ, হূণ, গুর্জ্জর প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারা সকলেই ধীরে ধীরে হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাব ইহাদের মধ্যে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বিদেশীয়গণ কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিবার পরই ভারতীয় ধর্ম্ম এবং ভারতীয় নাম গ্রহণ করিত। গ্রীকরাজ মেনাণ্ডার ও কুষাণরাজ কণিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ভারতীয় ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। কুষাণরাজ বাসুদেব প্রভৃতি বহু বৈদেশিক হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, শকরাজ রুদ্রদামা সংস্কৃত ভাষায় উত্তম রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া কথিত আছে। হূণ, গুর্জ্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ **রাজপুত** ক্ষত্রিয় নামে হিন্দু-সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত এবং গ্রীক সেলিউকসের পরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন, শক রুদ্রদামার কন্যার সহিত সাত-বাহনবংশীয় রাজার বিবাহ, চেদিরাজ কর্ণের সহিত হূণবংশীয়া কন্যার বিবাহ, গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধরমণী বিবাহ, কর্ণের দুই কন্যার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী জাতবর্ম্মার বিবাহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রাচীন হিন্দুসমাজের উদারতা প্রমাণ করে। কর্ণাটের কদম্ব বংশ এবং বাংলার সেন বংশ মূলে ব্রাহ্মণ হইয়াও পরবর্ত্তী কালে ক্ষত্রিয়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিল।

বিদেশীর দ্বারা ভারতসমাজের পুষ্টি

হিন্দুসমাজের উদারতা

কিন্তু কালক্রমে স্মৃতিনিবন্ধকারগণের সমাজ-সংস্কার চেষ্টার ফলে ও অন্যান্য কারণে **হিন্দুসমাজে অনুদারতা** প্রবেশ করিল এবং জাতি-ভেদের বন্ধন কঠোর হইতে লাগিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরূণী হিন্দুসমাজে পূর্ব্বের ন্যায় উদারতা দেখিতে পান নাই। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, তৎকালে হিন্দুরা

বৈদেশিকগণকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু এ যুগেও কয়েকজন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগ, গুজরাটের জনৈক বাঘেলা রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যমধ্যে মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি দান, এবং মার্কোপোলো প্রভৃতি বিদেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পর্য্যটকগণের প্রতি পাণ্ড্য দেশীয় রাজার উদার অনুগ্রহ প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুসমাজ তখনও সম্পূর্ণরূপে অনুদার হয় নাই; তবে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফাহিয়েনের সময়ে চণ্ডালগণ যেরূপ অস্পৃশ্য ছিল, ক্রমে হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অনেক সম্প্রদায়ই সেইরূপ অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সামাজিক সঙ্কীর্ণতার বৃদ্ধি

হিন্দুসমাজে **নারীজাতির মর্য্যাদা** ছিল। কাকতীয় রুদ্রাম্বার ন্যায় কোন রমণী দেশশাসন এবং সৈন্যচালনা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। অনেক রাজবংশীয়া মহিলা নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যায় শিক্ষিতা হইতেন এবং প্রকাশ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ; ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন পরিণতিও দেখা গিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা এবং ব্যাখ্যাতৃগণ বৈদিক যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতাকে নানাভাবে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী-জাতির বেদপাঠ নিষিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের মুখাপেক্ষী করিতে চাহিয়াছেন। রাজবংশীয়া কুমারীগণের বিবাহে প্রাচীন স্বয়ংবরের আদর্শ ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজে বাল্য-বিবাহ-প্রথা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। স্বামীর চিতায় বিধবার প্রাণদানের প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার খর্ব্বতা সূচনা

ধর্ম্ম—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি লোকের অনাস্থা প্রবল হইলে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বেদবিরোধী ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া গেল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গে বিলীন হইল। বুদ্ধ হিন্দু-দেবতা বিষ্ণুর একটি অবতাররূপে গৃহীত হইলেন। গুজরাত ও মহিসূর অঞ্চলে প্রাচীন কালে জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মহিসূর অঞ্চলে **রামানুজ, মাধবাচার্য্য** প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যের

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের অবনতি

আবির্ভাবে এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ নামক শৈব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে দক্ষিণাপথে জৈন ধর্ম্মের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়।

প্রাচীন বৈদিক দেবতাগণের প্রাধান্য ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছিল এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ **ব্রহ্মা, বিষ্ণু** এবং **শিবের প্রাধান্য** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং সংহারকর্ত্তা শিব একই ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণুর অবতারসমূহের উপাসনাও প্রচলিত হইল। দুষ্কৃতকারীদিগকে বিনাশ করিয়া সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এইরূপ বিশ্বাসই **অবতারবাদ**। পৌরাণিক দেবগণের মধ্যে **আদ্যাশক্তি** (দুর্গা, কালী প্রভৃতি) যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সূর্য্যের উপাসনাও প্রচলিত ছিল; কালক্রমে ব্রহ্মা ও সূর্য্যের উপাসনার প্রথা হ্রাস পায়। পৌরাণিক দেবদেবী

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনেকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতাগণের কোনও একজনকে উপাসনা করিতেন; একনিষ্ঠ ভক্তগণ অপরাপর দেবদেবী অপেক্ষা স্বীয় উপাস্য দেবতাকে মহত্তর মনে করিতেন। অনার্য্যেরা **মূর্ত্তিপূজা** করিত; কিন্তু প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ইহা প্রচলিত ছিল না। ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করাই পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র-গ্রন্থ। পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে দেবদেবীগণের কীর্ত্তিকলাপ, মাহাত্ম্য এবং পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত আছে। বহুদিন হইতে মহাভারতের কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজা পাইতেছিলেন; পরবর্ত্তী কালে রামায়ণের রামও এই সম্মানের অধিকারী হন। হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব অসামান্য। রামের পিতৃভক্তি ও প্রজানুরক্তি, দময়ন্তী, সাবিত্রী ও সীতার পাতিব্রত্য, ভরত, লক্ষ্মণ ও পাণ্ডবগণের ভ্রাতৃভক্তি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-পালন, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের দানশীলতা প্রভৃতি হিন্দু সমাজের আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে নানা ভারতীয় ভাষায় যুগে যুগে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে। পৌরাণিক সংস্কৃতি

বৌদ্ধপ্লাবনের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্ব্বার প্রাধান্যলাভের মূলে ছিল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের অভ্যুত্থান। হিন্দু ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণের প্রথম দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের নানাস্থানে **অশ্বমেধ** যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। উত্তর-ভারতের শুঙ্গ ও গুপ্তবংশ এবং দক্ষিণ-ভারতের সাতবাহন, বাকাটক, ইক্ষ্বাকু, পল্লব প্রভৃতি বহু পরাক্রান্ত রাজবংশের হিন্দুরাজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দু দার্শনিক এবং শৈব ও বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অধিকাংশই দক্ষিণ-ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবভক্ত নম্বন্দর্ এবং আঢ়্বার্-সংজ্ঞক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তামিলদেশের প্রাচীন ইতিহাস ভক্তি-সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। পরে মীমাংসাদর্শনের আচার্য্য **কুমারিল ভট্ট** বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অতঃপর বিখ্যাত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী **শঙ্করাচার্য্য** হিন্দুদর্শনের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিলেন। তিনি মালাবারের অন্তর্গত কালাদি গ্রামে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নানা শাস্ত্র-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া এবং সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিতে করিতে তৎকালীন পণ্ডিতগণের অনেককে যুক্তিতর্কে পরাজিত করিয়া তিনি অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, জগৎ এবং আর সকল বস্তু মিথ্যা ও মায়াপ্রভাবে কল্পিত—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতের সার ছিল।

হিন্দুধর্ম্মের জাগরণ

শঙ্করের অদ্বৈত-বাদ

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সুদূর-দক্ষিণ ভারতে আবার ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত হইল। এই ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন **রামানুজ** নামক জনৈক ব্রাহ্মণ। বিষ্ণু বা নারায়ণ তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী শ্রীপেরুম্বুদুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি হোয়্সলরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কিয়ৎ-কাল দোরসমুদ্রে বাস করিয়াছিলেন। রামানুজের অনুবর্ত্তিগণ **শ্রীবৈষ্ণব** নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদ

প্রাচীন শৈব প্রচারকগণের মধ্যে কল্যাণীর জৈনরাজা বিজ্জল কলচূর্য্যের মন্ত্রী **বসব** সর্ব্বপ্রধান। বিজাপুরের নিকটবর্ত্তী বাগেবাড়ী গ্রামের

এক ব্রাহ্মণবংশে বসবের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম **বীরশৈব** বা **লিঙ্গায়ৎ**। বীরশৈবগণ বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী এবং বাল্যবিবাহের বিরোধী। তাঁহারা শিবলিঙ্গের পূজা করেন; বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্যে তাঁহাদের আস্থা নাই। শৈবধর্ম্ম

শাসন-প্রণালী—বৈদিক যুগের রাজ্যগুলি আয়তনে সুবৃহৎ হইত না। পরবর্ত্তী কালে একরাট্ বা রাজচক্রবর্ত্তীর আদর্শ সফল করিবার জন্য রাজগণের উৎসাহের অন্ত ছিল না। উত্তর-ভারতের মৌর্য্য, গুপ্ত, পুষ্যভূতি, পাল, প্রতীহার প্রভৃতি বংশ এবং দক্ষিণ-ভারতের সাতবাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, প্রাচ্যগঙ্গ, চোল প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজবংশ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ-সমূহ বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন থাকিত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে 'বিষয়' 'ভুক্তি', 'রাষ্ট্র', 'জনপদ', 'আহার', 'মণ্ডল', প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইত। 'উপরিক', 'বিষয়পতি' দেশাধিপতি', 'আয়ুক্ত', 'ব্যাপৃত', 'মণ্ডলেশ্বর', প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসকগণের উপাধি ছিল। সাধারণতঃ রাজশক্তি দুর্ব্বল হইলেই শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। রাজপদ বংশগত ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে গোপালের ন্যায় সাধারণ নায়ককে রাজা নির্ব্বাচিত করার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। রুদ্রাম্বার ন্যায় কোন কোন রমণী উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করিতেন। ভারতীয় রাজগণ সাধারণতঃ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। 'মহাসেনাপতি'. 'মহাদণ্ডনায়ক' প্রভৃতি উপাধিধারী যোদ্ধৃগণ অনেক সময়ে সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার ভার পাইতেন। 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' (প্রধান মন্ত্রী) এবং 'মহাবলাধিকৃত' (প্রধান সেনাপতি) রাজার সাহায্যকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। 'ধর্ম্মাধিকারী' বিচার-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপদসমূহের বিভিন্ন নাম প্রচলিত ছিল। হিন্দু রাজগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জল, অগ্নি, বিষ প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের প্রথা সুপ্রচলিত ছিল; এমন কি, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণ পরীক্ষামূলক

প্রাদেশিক শাসন

রাজা নির্ব্বাচন

বিচার

বিচার- প্রথার পক্ষপাতী ছিল। চোল দেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের প্রথাটি অতি চমৎকার ছিল। প্রাচীন চোল রাজ্যে 'কুড়্ড়ম্' অর্থাৎ গ্রামসংঘের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ বিচার এবং শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকারী ছিলেন।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

আর্থিক অবস্থা—ভারতবর্ষ প্রাচীন জগতে মহাসমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। বৈদেশিকগণ ভারতের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হইয়াই এদেশ আক্রমণ করিত। কাশিম-পুত্র মুহম্মদ, সুলতান মহ্‌মূদ প্রভৃতি আক্রমণকারী এক একটি মন্দির লুণ্ঠন করিয়া যত ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ লক্ষ্য করিলে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, কাসিম-পুত্র মুহম্মদ মূলতানের একটি মাত্র মন্দির হইতেই ১৩২০০ মণ (ভারতীয় মাপে ৩৩০ হইতে ১৩২০ মণের মধ্যে) স্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। স্থলপথে এবং জলপথে বাণিজ্যের ফলে দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে আবিষ্কৃত রোমের অগণিত প্রাচীন মুদ্রা হইতে বুঝা যায় যে, সে যুগে বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষ সুদূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে প্রচুর ধন আহরণ করিত। দেশে শস্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদের ফলে দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে হিন্দুরাজগণ প্রজার দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। গির্ণারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের সহিত মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, শক রুদ্রদামা এবং স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের জলসেচনের ইতিহাস জড়িত। ক্ষেত্রে জলসেচনের সুবিধার জন্য নদীর জল আবদ্ধ করিয়া হ্রদটি সৃষ্টি করা হইয়াছিল; স্রোতের বেগে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে অজন্মা এবং দুভিক্ষের আশঙ্কায় রাজগণ অজস্র অর্থব্যয়ে ইহা পুনরায় নির্ম্মাণ করিতেন। কাশ্মীর এবং চোলদেশে জলসেচনের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল।

ঐশ্বর্য্য

কৃষি বাণিজ্য

জলসেচন

সাহিত্য—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-উপপুরাণ এবং স্মৃতিগ্রন্থ ব্যতীত কাব্য, উপন্যাস, নাটক এবং নানাবিধ বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ক গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কবি ও নাট্যকার হিসাবে **কালিদাস**

জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্ত' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থরচয়িতা **ভাস** এবং 'বুদ্ধচরিত' প্রণেতা কবি **অশ্বঘোষ** সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কালিদাসের পরবর্ত্তী নাট্যকার-গণের মধ্যে 'রত্নাবলী' রচয়িতা সম্রাট্ **হর্ষবর্দ্ধন**, 'উত্তরচরিত' প্রণেতা **ভবভূতি**, এবং **রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র** প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিরাতার্জ্জুনীয়' প্রণেতা **ভারবি**, 'শিশুপালবধ' রচয়িতা **মাঘ**, 'নৈষধচরিত' প্রণেতা **শ্রীহর্ষ** প্রভৃতি কবিগণ মহাকাব্য-রচয়িতা বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা **জয়দেব** এবং **ভর্ত্তৃহরি** মধুর গীতিকাব্য রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গদ্য-সাহিত্যে **সুবন্ধু**, 'কাদম্বরী'-রচয়িতা **বাণভট্ট** এবং ঔপন্যাসিক **দণ্ডী** যশস্বী হইয়াছিলেন।

কবি ও নাট্যকার

গদ্যকাব্য

প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক বিবরণ সাধারণতঃ পুরাণসমূহের অঙ্গে গ্রথিত হইত। সপ্তম শতাব্দী হইতে কয়েকখানি **ঐতিহাসিক গ্রন্থ** রচিত হয়। ঐগুলির মধ্যে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' (হর্ষ শীলাদিত্যের জীবনী), বাক্‌পতিরাজের 'গউড়বহ' (প্রাকৃত ভাষায় রচিত কনৌজ-রাজ যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয়কাহিনী), কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' (কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস), বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' (চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনী) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (পালবংশীয় রামপালের জীবনী) সুপ্রসিদ্ধ।

ইতিহাস

দার্শনিক রচনার মধ্যে বিখ্যাত ষড়্‌দর্শনের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ উত্তরকালে দার্শনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ লেখকগণের মধ্যে **বুদ্ধঘোষ ও নাগার্জ্জুন** সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। **উদ্যোতকর, কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বাচস্পতি মিশ্র** প্রভৃতির রচনা হিন্দুর দার্শনিক সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ।

দর্শন

অঙ্ক, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্রের নয়টি সংখ্যাঙ্ক এবং একটি শূন্য দ্বারা দশগুণোত্তর

গণিত ও জ্যোতিষ

গণনা-পদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুগণই আবিষ্কার করেন। **আর্যভট, বরাহমিহির** ব্রহ্মগুপ্ত এবং **ভাস্করাচার্য্য** জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরাহমিহিরের 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' এবং ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' হিন্দুগণের জ্যোতিষ-চর্চ্চার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উপরে 'খণ্ডখাদ্যক' এবং 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' রচয়িতা **ব্রহ্মগুপ্ত** নামক গণিতবেত্তার প্রভাব অসামান্য। সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যা বিষয়েও প্রাচীনকালে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যে কণিষ্কের সমকালবর্ত্তী **চরক** এবং মহাজ্ঞানী **সুশ্রুত** রচিত দুইখানি সংহিতা সুপ্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে **বাগ্‌ভট** এবং **চক্রপাণিদত্ত** আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের মধ্যেও সুপণ্ডিত ব্যক্তির অভাব ছিল না। **হর্ষ শীলাদিত্য, মহেন্দ্রবর্ম্মা, বল্লালসেন** প্রভৃতি অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কল্যাণীর চালুক্যরাজ **তৃতীয় সোমেশ্বর** এবং ধারার পরমাররাজ **ভোজ** সর্ব্ববিদ্যাবিশারদরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনীতি

প্রাচীন যুগে রাজনীতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে **কৌটিল্য** রচিত **অর্থশাস্ত্র** সর্ব্বপ্রধান। পরবর্ত্তী কালে **শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার** প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। দেশীয় ভাষার মধ্যে হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

স্থাপত্য ও শিল্প—অশোকের সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা অত্যাশ্চর্য্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অশোকের বিশাল স্তম্ভগুলি এক এক খণ্ড প্রস্তর খুদিয়া প্রস্তুত; অসামান্য দক্ষতার সহিত এইগুলি দূরদূরান্তরবর্ত্তী প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অশোক বহুসংখ্যক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন; তন্মধ্যে **সাঞ্চীস্তূপ** সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কণিষ্ক পেশোয়ারে যে বিরাট চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, প্রাচীন কালে তাহার তুলনা ছিল না। গুপ্তযুগের সুদৃশ্য মন্দিরগুলিতে সুন্দর খোদিত প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইত।

স্তূপ ও মন্দির

মামল্লপুরমের প্রস্তরখোদিত মন্দিরসমূহ এবং কাঞ্চীর সুপ্রসিদ্ধ কৈলাসনাথ-মন্দির আজিও প্রাচীন পল্লবনৃপতিগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ **ইলোরায়** একটি অখণ্ড পর্ব্বত কাটিয়া এক অপূর্ব্ব

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চালুক্য, চোল এবং হোয়্সল প্রভৃতি বংশের নৃপতিগণের নির্ম্মিত অনেক বৃহৎ সুদৃশ্য মন্দির পট্টদকল, তাঞ্জোর, হলেবীদ ও বেলূর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় পুরীর জগন্নাথ-মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির এবং **কোনারকের সূর্য্য-মন্দির** প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ-ভারতের ন্যায় উত্তর-ভারতেও প্রাচীনকালে অসংখ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীগণ তাহার অধিকাংশ ধ্বংস করিয়া দেয়। উত্তর-ভারতীয় মন্দিরসমূহের মধ্যে আবু পর্ব্বতের জৈনমন্দিরসমূহ এবং খজুরাহোর মন্দিরগুলি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরসমূহ উড়িষ্যার মন্দিরগুলির আকারে কিংবা এদেশীয় কুটীরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইত। অশোকের স্তম্ভগুলির শীর্ষস্থিত সজীববৎ পশুমূর্ত্তি সমূহ প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। কুষাণ এবং গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি মূর্ত্তিশিল্পের চরম উৎকর্ষ রূপে পরিগণিত হয়। গ্রীকরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত গুপ্তরাজগণের প্রতিকৃতিসম্বলিত স্বর্ণমুদ্রাসমূহ ভারতীয় মুদ্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান



অজণ্টার চিত্র—মাতা ও সন্তান

প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য

অধিকার করিয়াছে। **অজণ্টার** বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাবলী আজিও গুপ্তযুগের শিল্পিগণের অসামান্য দক্ষতা প্রমাণিত করে।

মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার পর দেবতার মূর্ত্তি এবং তজ্জন্য মন্দির নির্ম্মাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের মন্দিরসমূহে পূজিত দেবমূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্করগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজগণের শাসনকালে ধীমান্ এবং বীতপাল নামক দুইজন প্রতিভাবান্ শিল্পী পূর্ব্ব-ভারতে একটি নূতন ভাস্কর্য্যরীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই রীতিতে প্রস্তুত কতকগুলি সুদৃশ্য বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মূর্ত্তি পূর্ব্ব-ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কয়েকখানি প্রাচীন পুথিতে পালযুগের শিল্পরীতি অনুসারে অঙ্কিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেনবংশের রাজত্বকালে উত্তর-বাংলায় শূলপাণি নামক একজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী যুগের ভাস্কর্য্য

স্থলপথে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার—অতি প্রাচীন কালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতীয় বণিক্গণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইত। এই পথেই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম **মধ্যএশিয়ার** নানা অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল। অশোকের প্রচারকগণ কেবল **সিংহল** ও **পশ্চিম-এশিয়ায়** নহে, সুদূর **আফ্রিকা** এবং **ইউরোপে** পর্য্যন্ত হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে **চীন, কোরিয়া, জাপান** প্রভৃতি নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পালরাজগণ **তিব্বতে** বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার

প্রাচীন হিন্দুগণের সামুদ্রিক অভিযান এবং সমুদ্রপথে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার—কেবল স্থলপথে নহে, সমুদ্রপথেও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের সহিত আরবীয় ও গ্রীক বণিক্গণের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ২০ অব্দে একজন পাণ্ড্য রাজা রোম-সম্রাট্ অগাস্টসের রাজসভায় বাণিজ্যদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভেনিসীয়

বণিক্ মার্কোপোলোর সময়েও পাণ্ড্যদেশের কায়ল বন্দর হইতে দূর-দূরান্তবর্ত্তী দেশসমূহে বাণিজ্য-তরণী যাতায়াত করিত। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্যের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন-কালে গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পশ্চিমদেশে নীত এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের সময়ে বাংলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত **তাম্রলিপ্ত** একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ছিল। এই বন্দর হইতে বড় বড় বাণিজ্যপোত সিংহল এবং সুদূর যবদ্বীপে যাতায়াত করিত। বৈদেশিক বাণিজ্য

ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে **ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ফরাসি হিন্দুচীন, কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ** প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারতীয়গণ প্রথমে বাণিজ্যব্যপদেশে এই সকল দেশে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কেহ কেহ যে দেশজয় বা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেও গিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই দেশগুলিতে ভারতীয়ভাবাপন্ন, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারতীয় নাম ও আখ্যাধারী অনেক রাজা ছিলেন; তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় ও ভারতীয় অক্ষরে লিখিত এবং শকাব্দের তারিখ সম্বলিত শাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সময় সময় কোন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নগরের নামানুসারে এই সকল দেশে নগরের নামকরণ হইত; শ্যামের অন্তর্গত অয়ুথিয়া নগরের নাম যে আমাদের 'অযোধ্যা'র অপভ্রংশ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ব্বদেশে হিন্দু সংস্কৃতি

যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষা এবং 'রামায়ণ' প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থ সমাদর লাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। **বোরোবুদুর** নামক স্থানের বিশাল মন্দির আজিও প্রাচ্য জগতে বৌদ্ধ শিল্পিগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কাম্বোডিয়ার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ **অঙ্কোরবতের মন্দির** আজিও সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু-সভ্যতা বিস্তারের সাক্ষ্য দেয়।

যে সকল ভারতীয় কিংবা ভারতীয় সভ্যতাসম্পন্ন রাজা পূর্ব্ব দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মালয়েশিয়ার মহাপরাক্রান্ত **শৈলেন্দ্র-**বংশীয় সম্রাট্‌গণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শ্রীবিজয় (অর্থাৎ সুমাত্রার অন্তর্গত পলেম্বং) শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের রাজধানী ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ হইতে পূর্ব্বদেশে গিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়েশিয়ার হিন্দুরাজ্যসমূহ ক্রমবর্দ্ধমান শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। এমন কি, উত্তরে কাম্বোজ, আনাম ও হিন্দুচীন পর্য্যন্ত শৈলেন্দ্র সম্রাট্‌গণের রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়ের হিন্দুরাজ্য

ভারতীয় রাজগণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পালবংশীয় দেবপালের রাজত্বকালে শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালে আনুমানিক ১০০৫ খৃষ্টাব্দে চূড়ামণিবর্ম্মা নামক আর একজন শৈলেন্দ্র রাজা চোলরাজ্যের অন্তর্গত নাগপট্টনে একটি বিহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চোল ও শৈলেন্দ্র রাজগণের মিত্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। আনুমানিক ১০৩০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সমুদ্রপথে শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজা সংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গবর্ম্মাকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়া লন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও চোল ও শৈলেন্দ্র রাজগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল; কিন্তু চোলগণ পরিণামে সমুদ্রপারে প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এই বিবাদের ফলেই শৈলেন্দ্র বংশের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শৈলেন্দ্ররাজ্য পাণ্ড্যবংশীয় জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। শৈলেন্দ্র-রাজ্যের অধঃপতনের যুগে যবদ্বীপের পরাক্রান্ত রাজা কৃতনগর (১২৫৪-৯২) সমগ্র মালয়েশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। আরব বণিক্ ও পর্য্যটকগণের গ্রন্থ এবং চীন ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অতুল বাণিজ্য-বৈভব ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

চোল ও শৈলেন্দ্র বংশের বিবাদ

যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

সুদূর-দক্ষিণ ভারতের রাজগণ বহুবার **সিংহল** অধিকার করিয়াছিলেন। চোলনরপতি রাজরাজ ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দ্বীপ অধিকার করেন। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের সৈন্যগণ **নক্কবার** অর্থাৎ নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিল।

Model Questions

1. Write short notes on the social, economic and administrative condition of India before the Muslim occupation.

2. Give brief accounts of (a) Puranic Hinduism, (b) art and architecture of ancient India.

3. What do you know about the expansion of Indian culture abroad ?

4. Write notes on : (i) literary and scientific activities of the Indians of old, (ii) Sankaracharya and Ramanuja, (iii) the Sailendra Kings.

একাদশ অধ্যায়

মুসলমানদিগের আগমন

মুহম্মদ বিন্ কাসিমের সিন্ধুদেশ জয়	...	৭১১-১২
সবুক্তিগীনের রাজত্বকাল	...	৯৭৭-৯৭
সুলতান মহ্মুদের রাজত্বকাল	...	৯৯৮-১০৩০
সোমনাথ লুণ্ঠন ...	...	১০২৬
তরাঈনের প্রথম যুদ্ধ ...	...	১১৯১
তরাঈনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ...	...	১১৯২
কুতবউদ্দীনের দিল্লী অধিকার	...	১১৯২-৯৩
মুহম্মদ ঘূরীর মৃত্যু ...	...	১২০৬

প্রথম পরিচ্ছেদ—আরব-আক্রমণ

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন এবং আরব জাতির দিগ্বিজয়— প্রাচীন কালে আরবদেশে কোন প্রবল রাজশক্তির অভ্যুথান হয় নাই। আরবগণ বণিক্-জাতি রূপে পরিচিত ছিল। তাহারা নানা দেবতা ও উপদেবতার মূর্ত্তি পূজা করিত এবং নানারূপ অন্ধ সংস্কারের বশীভুত ছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে মুহম্মদ নামক এক মহাপুরুষের প্রেরণায় আরবজাতি নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। অচিরে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অনেক অংশে তাহাদের ধর্ম্মমত ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করিল।

প্রাচীন আরব

আনুমানিক ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কানগরীতে কুরেশ নামক এক সম্ভ্রান্ত বংশে মহাপুরুষ **মুহম্মদ** জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে তিনি আরব বণিকগণের সহিত সিরিয়া, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া নানা ধর্ম্মাবলম্বী জাতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি যে পৌত্তলিকতাবিরোধী ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহা **ইস্‌লাম** নামে পরিচিত। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের নাম 'মুস্‌লিম'; আরবি 'মুস্‌লিম' শব্দের পরিবর্ত্তে ফার্‌সি ও তুর্কি লেখকগণ কখন কখন 'মুসল্‌মান' শব্দটী ব্যবহার করিতেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই যে,

মুহম্মদের জন্ম

ইস্‌লাম

আল্লা (অর্থাৎ ঈশ্বর) এক এবং অদ্বিতীয়, এবং মুহম্মদ আল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ। পবিত্র **কুর্-আন** মুসলমানদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ।

প্রথমে মুহম্মদ অল্প কয়েকজন লোককে আপন ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন ; কিন্তু মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রস্থান করেন। এই ঘটনার সময় হইতেই মুসলমানদিগের **হিজ্‌রা** নামক অব্দ বা কালের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। মদিনার অধিবাসিগণ সাগ্রহে এই নূতন প্রচারকের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল। তাহাদের সহায়তায় মুহম্মদ মক্কার অধিবাসীদিগকে পরাজিত এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ মানবলীলা সংবরণ করেন ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র আরব দেশের অধিকাংশ লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুহম্মদের সাফল্য

এই নব ধর্ম্মের উদ্দীপনা আরবজাতির ইতিহাসে এক বিরাট্ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল। মুহম্মদের মৃত্যুর পর **খলিফা** উপাধিধারী ধর্ম্মগুরুদিগের নেতৃত্বে আরবগণ বাহুবলে দেশের পর দেশ জয় করিয়া বিজিত জাতিসমূহকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পারস্য, সিরিয়া, মিশর, এমন কি সুদূর ইউরোপের অন্তর্গত স্পেনদেশ পর্য্যন্ত এই বীর জাতির পদানত হইল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য ইউরোপের অন্তর্গত স্পেন দেশ হইতে মধ্য এশিয়ার অক্‌সস্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই এই নবজাগ্রত দুর্দ্ধর্ষ আরব শক্তি ভারতের পশ্চিম দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু ৭১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরবেরা ভারতবর্ষের কোন অংশ জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানগণের দিগ্বিজয়

মুহম্মদ বিন্ কাসিম কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ জয় (৭১১-১২)— ইরাকের আরব শাসনকর্ত্তা **হজ্জাজ** সর্ব্বপ্রথম রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, আরব বণিক্‌গণের একটি জাহাজ সিন্ধুদেশের নিকটে জলদস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

হজ্জাজ উহার জন্য সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু **দাহির** এই ব্যাপারে তাঁহার দায়িত্ব স্বীকার করিলেন না। ফলে হজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানদিগের অভিযান দুই বার বিফল হইল। তৃতীয় বারে হজ্জাজ তাঁহার আত্মীয় **মুহম্মদ বিন্ কাসিম** (অর্থাৎ কাসিমপুত্র মুহম্মদ) নামক এক যুবককে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া সিন্ধুদেশ জয়ের জন্য এক বিশাল বাহিনী পাঠাইলেন। সিন্ধুদেশের বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষে যোগ দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাবীর দাহির দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দাহির বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইবার পর তাঁহার পুত্র ও বিধবা স্ত্রী অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আরব সেনাপতি মুহম্মদের গতিরোধ সম্ভব হইল না। অচিরেই সিন্ধু ও মূলতান তাঁহার পদানত হইল।

দাহিরের সহিত সংঘর্ষ

এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল ; কিন্তু যে দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে বাহুবলে পশ্চিম-এশিয়া, মিশর এবং স্পেন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ভারতে তাহাদের অধিকার কেবল সিন্ধু ও মূলতানেই সীমাবদ্ধ রহিল। ভারতবর্ষে আরবেরা অধিক দূর রাজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই।

সিন্ধুদেশে আরব-শাসন—আরবগণ বিজিত হিন্দু প্রজাদিগকে শান্তিতে বাস করিতে দিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজগণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। নবম শতাব্দী হইতে কনৌজের পরাক্রান্ত গুর্জ্জরপ্রতিহার বংশ পূর্ব্বদিকে আরব-প্রভুত্ব বিস্তারে বাধা প্রদান করিতে থাকে। সিন্ধু অঞ্চলে আরব রাজ্য স্থাপিত হইবার পর ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরবজাতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হইল। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার আরবেরাই ইউরোপের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল।

আরব অধিকারের ফল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গজ্‌নীর তুর্কি শাসকগণের আক্রমণ

গজ্‌নী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—আরবগণ সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সিন্ধুদেশে তাহাদের অধিকার

স্থাপিত হইবার প্রায় তিন শত বৎসর পরে **তুর্কি** জাতীয় মুসলমানগণ পঞ্জাব অধিকার করে এবং উত্তর ভারতের হিন্দুরাজ্যসমূহ বারবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে **অল্প্‌তিগীন** নামক সামানীবংশীয় আরবগণের রাজ্যের একজন তুর্কিজাতীয় উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী গজ্‌নী নগরকে কেন্দ্র করিয়া আফ্‌গানিস্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আফগানিস্থান আরবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। অল্প্‌তিগীনের মৃত্যুর কয়েকবৎসর পর আনুমানিক ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় তুর্কিজাতীয় ক্রীতদাস এবং জামাতা **সবুক্‌তিগীন** গজ্‌নীর অধিপতি হন। গজনী

সবুক্‌তিগীনের আক্রমণ—দশম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শাহিবংশীয় পরাক্রান্ত হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে, সবুক্‌তিগীনের সমসাময়িক শাহিরাজ **জয়পাল** কাশ্মীর হইতে মূলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং আফ্‌গানিস্থানের লঘ্‌মান অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন **উদভাণ্ডপুর** (আটকের নিকটবর্ত্তী উণ্ড) নগরে শাহিরাজগণের রাজধানী ছিল। গজ্‌নী হইতে মুসলমানগণ শাহিরাজ্যের উপর লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সবুক্‌তিগীন রাজ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই একবার শাহিরাজ্য এবং আরব আমীরগণের শাসিত মূলতানরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পর তিনি জয়পালের রাজ্যের পশ্চিমাংশ লুণ্ঠন করেন এবং কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়া লন। জয়পাল আর কালবিলম্ব না করিয়া এক বিশাল সেনাদলসহ সবুক্‌তিগীনের রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া অপমানজনক শর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দেশে ফিরিয়া তিনি এই সন্ধি পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার ফলে ক্রুদ্ধ সবুক্‌তিগীণের আক্রমণে ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধ লঘ্‌মান জনপদ শ্মশানে পরিণত হইল। কথিত আছে, এই সময়, জয়পালের প্রার্থনায় দিল্লী, আজমের, কালিঞ্জর এবং কনৌজের রাজগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অর্থ এবং সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যসহ

শাহিরাজ্য

জয়পালের পরাজয়

জয়পাল গজ্‌নী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সুশিক্ষিত মুসলমান অশ্বারোহীর আক্রমণে হিন্দুসেনা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই পরাজয়ের ফলে সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত শাহিরাজ্যের অনেক অংশ জয়পালের হস্তচ্যুত হইল।

সুলতান মহ্‌মূদ—সবুক্‌তিগীনের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র মহ্‌মূদ গজনীর সিংহাসন লাভ করেন। ইনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সুলতান মহ্‌মূদ' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বারবার এই দেশ আক্রমণ করিয়া উত্তরাপথের পশ্চিমাংশকে শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত করেন। কথিত আছে, মহ্‌মূদ সপ্তদশ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের দেববিগ্রহ ও মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা এবং ধন-রত্ন লুণ্ঠন করাই এই সকল অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মহ্‌মূদের ভারত আক্রমণ

১০০১ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান মহ্‌মূদ বিরাট্ একদল সৈন্য লইয়া শাহিরাজ জয়পালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশোয়ারের নিকটে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইল। এই যুদ্ধে **জয়পাল** পরাজিত ও বন্দী হন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মহ্‌মূদকে বিপুল অর্থ দিয়া এবং বার্ষিক করদান করিতে স্বীকার করিয়া তিনি মুক্তি পাইলেন। কিন্তু এই অপমান সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি স্বীয় পুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান মহ্‌মূদ রাজা বিজয়রায় নামক একজন সামন্ত রাজার অধীন ঝেলমের তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র **ভেরা** রাজ্য অধিকার করিলেন। পর বৎসর তিনি আরব আমীরগণের শাসিত **মূলতান** রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু **আনন্দপাল** তাঁহাকে শাহিরাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে দিলেন না। তিনি এক বিরাট্ সেনাদলসহ মহ্‌মূদকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে, এই সময় শাহিরাজ উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী এবং আজমেরের হিন্দু-রাজগণের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন; এমন কি, এই দুর্দ্দিনে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নানা দেশ হইতে হিন্দুরমণীগণ আপনাদের রত্নালঙ্কারসমূহ আনন্দ-পালের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

জয়পালের মৃত্যু

ভেরা অধিকার

আনন্দপালের পরাজয়

১০০৮ খৃষ্টাব্দে উণ্ডের নিকট আনন্দপালের বিরাট্ বাহিনী মহ্‌মুদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

অতঃপর মহ্‌মুদ **নগরকোট** বা ভীমদুর্গের হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন করিলেন। আনন্দপালের বিরোধিতায় আরব মুসলমানদিগের অধিকৃত মুলতান কয়েক বৎসরের জন্য রক্ষা পাইয়াছিল বটে ; কিন্তু ১০১০ খৃষ্টাব্দে এই জনপদটীও মহ্‌মুদের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। আনন্দপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **ত্রিলোচন পাল** এবং পৌত্র **'নিডর' ভীমপাল** নন্দন নামক দুর্গ হইতে কিছুকাল মুসলমান সৈন্যের গতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে শাহিরাজবংশ বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র শাহিরাজ্য গজ্‌নীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

শাহি বংশের পতন

ভারতের দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করা এবং দেববিগ্রহগুলি চূর্ণ করা সুল্‌তান মহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কনৌজের প্রতীহারবংশীয় রাজা রাজ্যপালের রাজধানী **কনৌজ** নগরী লুণ্ঠন করেন। পর বৎসর মহ্‌মুদ বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লবংশীয় রাজা **বিদ্যাধরের** সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু মহ্‌মুদ চন্দেল্ল বা প্রতীহার রাজ্যে মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই; কেবল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১০১১-১২ খৃষ্টাব্দে তিনি **থানেশ্বরের মন্দির** লুণ্ঠন করেন এবং দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়া দেন ; ১০১৮ খৃষ্টাব্দে **মথুরা** লুণ্ঠন করিয়াও তিনি অগণিত ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

কনৌজ লুণ্ঠন

থানেশ্বর ও মথুরা

মহ্‌মুদের ভারতীয় অভিযানসমূহের মধ্যে গুজরাতের অন্তর্গত **সোমনাথের মন্দির** লুণ্ঠনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বিরাট্ সেনাদল সহ রাজপুতনার মরুভূমির মধ্য দিয়া গুজরাত অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। গুজরাতের চৌলুক্যবংশীয় রাজা **প্রথম ভীমকে** পরাজিত করিয়া ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহ্‌মুদের সৈন্যগণ সোমনাথে পৌছিল। হিন্দুগণ পরাজিত হইল। মহ্‌মুদ মন্দির অধিকার করিয়া শত শত হিন্দু উপাসককে হত্যা করিলেন এবং শিবলিঙ্গ স্বহস্তে চূর্ণ করিয়া দিলেন। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া মহ্‌মুদ প্রায় দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা

সোমনাথ লুণ্ঠন

লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সোমনাথ মন্দিরের একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ পুরোহিত পথপ্রদর্শক সাজিয়া মুসলমান সৈন্যদলকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহ্‌মুদ অবশেষে নিরাপদে গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি গজ্‌নীতে প্রাণত্যাগ করেন। দিগ্বিজয়ী মহ্‌মুদের মৃত্যুর পর তাঁহার হীনবল বংশধরগণ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই।

মহ্‌মুদের মৃত্যু

মহ্‌মুদের আক্রমণের ফল—অবসর পাইলেই মহ্‌মুদ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন। যে স্থান তিনি অতিক্রম করিতেন, উহা শ্মশানে পরিণত হইত। তিনি সমৃদ্ধ নগর ও তীর্থস্থান সমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক অগণিত ধনসম্পদসহ নিজরাজ্যে প্রস্থান করিতেন। তিনি যে তৎকালীন জগতের অন্যতম প্রধান রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি তিনি কেবলমাত্র মূলতান ও পঞ্জাবের শাহি রাজ্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর কোন অংশে স্থায়ী অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা ভারতের ধনরত্নের উপরই তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল। তিনি যে ভাবে ভারতের জনপদসমূহের সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দু জাতির মনে মুসলমানগণের সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতে ইসলাম ধর্ম্ম এবং মুসলিম সভ্যতার প্রসার সহজসাধ্য হইবার পক্ষে ইহা বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। সুলতান মহ্‌মুদের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কেবল মাত্র পঞ্জাবের কিয়দংশ তাঁহার হীনবল বংশধরগণের অধীন ছিল।

লুণ্ঠন ও ধ্বংস কার্য্য

কুফল

মহ্‌মুদের চরিত্র—সুলতান মহ্‌মুদ কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না; তাঁহার শিল্পানুরাগ এবং বিদ্যোৎসাহ অসামান্য ছিল। বহুসংখ্যক সুদৃশ্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তিনি রাজধানী গজ্‌নী নগরীকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। **শাহ্‌নামা** নামক ফারসি মহাকাব্যের রচয়িতা কবিকুলমণি **ফির্দ্দৌসী** তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। **আবু রিহান অল্‌-বীরূণী** নামক অপর একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি

বিদ্যানুরাগ

তাঁহার সহিত ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনীষী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণের পুরাণ, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অমূল্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে প্রাচীন হিন্দুগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার ব্যবহার সম্বন্ধেই যে অনেক তথ্য জানা যায়, তাহা নহে; এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং গভীর জ্ঞানেরও সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উত্তর-ভারতে তুর্কি-শাসন স্থাপন

ঘূর রাজ্য—হিরাতের পূর্ব্বদিকৃস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘূর রাজ্য অবস্থিত ছিল। সুল্তান মহ্মূদের সময়ে এই রাষ্ট্র গজ্নী রাজ্যের অধীন হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গজ্নীর রাজবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে, ঘূর রাজ্য পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে সুল্তান মহ্মূদের এক অযোগ্য বংশধরকে পরাজিত করিয়া ঘূররাজ গজ্নী অধিকার করেন। বিজেতৃগণ সুন্দর সমৃদ্ধ গজ্নী নগরী ধ্বংস করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। মহ্মূদের বংশধরগণ গজ্নী হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবেও তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিলেন না। গজনী ধ্বংস

মুইজ্উদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী—১১৭৩ খৃষ্টাব্দে ঘূর রাজ্যের রাজা **ঘিয়াসউদ্দীন** তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্উদ্দীনকে কাবুল ও গজ্নীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুইজ্উদ্দীন ইতিহাসে **শিহাব-উদ্দীন, মুহম্মদ বিন সাম** (অর্থাৎ সামের পুত্র মুহম্মদ), **মুহম্মদ ঘূরী** (অর্থাৎ ঘূরবাসী মুহম্মদ) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। মুহম্মদ ঘূরী সুলতান মহ্মূদের ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন না। অনেক সময় বলে না পারিলে তিনি ছল ও কৌশল দ্বারা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিতেন। পক্ষান্তরে মহ্মূদের মত তিনি কেবল লুণ্ঠনকামী ছিলেন না; ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মুহম্মদ ঘূরী

ভারত আক্রমণ করিয়া মুহম্মদ ঘূরী প্রথমে **মূলতান** এবং **উচ্** অধিকার করিলেন (১১৭৫)। কিন্তু **গুজরাত** আক্রমণ করিতে গিয়া

তিনি চৌলুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীম এবং বাঘেলাবংশীয় বীরধবল কর্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি **সিন্ধু** দেশ জয় করিলেন। আনুমানিক ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে মুইজ্ উদ্দীন জম্মুর হিন্দুরাজার সহিত মিত্রতা করিয়া সুল্তান মহ্মূদের বংশের শেষ রাজাকে কৌশলে বন্দী করিলেন এবং **লাহোর** অধিকার করিলেন।

লাহোর অধিকার

পঞ্জাব অধিকার করার পর মুহম্মদ ঘূরীর অধিকৃত রাজ্য দিল্লী ও আজমেরের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর তিনি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া উত্তর-ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। **পৃথ্বীরাজ**ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না ; তিনি অপরাপর হিন্দুরাজগণের সহায়তায় বিরাট্ একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে যে, এই দুর্দ্দিনে কনৌজের গাহড়বালবংশীয় পরাক্রান্ত রাজা **জয়চ্চন্দ্র** মুহম্মদকে সাহায্য করিয়াছিলেন। চন্দ্‌বর্‌দাই নামক পৃথ্বীরাজের জনৈক সভাকবি রচিত 'পৃথ্বীরাজরাইসা' কাব্য এবং উত্তর-ভারতে প্রচলিত গাথাসমূহ পাঠ করিলে জানা যায়, পৃথ্বীরাজ জয়চ্চন্দ্রের কন্যা সংযোগিতাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিয়াছিলেন ; সেইজন্য জয়চ্চন্দ্র মুহম্মদ ঘূরীর সাহায্যে অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাহিলেন। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি, তাহা বলা কঠিন।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চ্চন্দ্র

যাহা হউক, ১১৯১ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী **তরাঈন** বা **তলাবরী** নামক স্থানের রণক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিলেন। কিন্তু মুহম্মদ ঘূরী পরাজিত হইয়াও হতাশ হইলেন না। পর বৎসর বৃহৎ একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার তিনি তরাঈনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবারেও পৃথ্বীরাজ বিপুল বাহিনী লইয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন ; কিন্তু হিন্দু সৈন্য এবার দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান অশ্বারোহীর আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। ছত্রভঙ্গ বিশাল হিন্দু-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল (১১৯২)। পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা লইল। কথিত আছে, মুহম্মদ ঘূরী কেবল চতুরতা দ্বারাই এই যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুহম্মদের পরাজয়

পৃথ্বীরাজের পরাজয়

তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট সন্ধি-প্রস্তাবের ছল করিয়া সময় লইলেন। হিন্দুসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল না। পরদিন প্রত্যুষে মুসলমান সৈন্যগণ অতর্কিতভাবে হিন্দুসেনা আক্রমণ করিল। কিন্তু তথাপি হিন্দু সৈন্যের পরাক্রমে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। পৃথ্বীরাজের সেনাদল পরাজিত মুসলমানগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন মুহম্মদ ঘূরীর একদল সুশিক্ষিত অশ্বারোহীর আক্রমণে বিশাল হিন্দু-বাহিনী ধ্বংস হইয়া গেল।

তুর্কিগণের রাজ্যবিস্তার—পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুসলমান সৈন্য বিজয়গর্ব্বে অগ্রসর হইল। ১১৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘূরীর সেনাপতি **কুতব্-উদ্দীন আইবক** দিল্লী অধিকার করিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ইটাবা জেলার অন্তর্গত চন্দাবর নামক স্থানের যুদ্ধে কনৌজের গাহড়বাল-বংশীয় রাজা জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলেন; কিন্তু মুহম্মদ ঘূরী কনৌজ নগর অধিকার না করিয়া বারাণসী লুণ্ঠন করিতে গেলেন। কুতব্ উদ্দীন ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাত আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের রাজধানী অন্হিলবাড়া লুণ্ঠন করিলেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিনি চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দীকে পরাজিত করিয়া কালিঞ্জর অধিকার করেন।

দিল্লী অধিকার

কালিঞ্জর

মুহম্মদ ঘূরীর সহিত একজন ভাগ্যান্বেষী বীর যুবক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম **ইখ্তিয়ার্উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খল্জী** (অর্থাৎ বখ্তিয়ার খল্জীর পুত্র ইখতিয়ার্উদ্দীন মুহম্মদ)। ইখতিয়ার্উদ্দীন একদল সেনাসহ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আনুমানিক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করেন। এই সময়ে পরাক্রান্ত পাল-সম্রাট্গণের এক অযোগ্য বংশধর বিহার শাসন করিতেছিলেন। বিহার জয়ের কয়েক বৎসর পরে ইখ্তিয়ারউদ্দীন্ বাংলার সেন বংশের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া 'নদীয়া' নগরী অধিকার করেন। লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ব-বাংলার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এইরূপে মুইজউদ্দীনের সময়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্বে পশ্চিম-বাংলা পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে মুসলমানগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

বিহার

পশ্চিম বাংলা

মুহম্মদের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা—১২০৩ খৃষ্টাব্দে ঘূররাজ ঘিয়াস্-উদ্দীনের মৃত্যু হইলে মুহম্মদ ঘূরী গজনী এবং দিল্লীর অধীশ্বর হন। এই সময়ে স্বদেশে তাঁহাকে নানারূপে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে পঞ্জাবের পার্ব্বত্য খোকরজাতি বিদ্রোহী হইলে মুহম্মদ ঘূরী স্বয়ং তাহাদিগকে দমন করিতে আগমন করিলেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। ভারতবর্ষের বিজিত জনপদসমূহের মধ্যে নাসির্‌উদ্দীন কবচা সিন্ধুদেশ ও মূলতান অধিকার করিলেন ; দিল্লী সহ অপর সমুদয় অংশ কুতব্‌উদ্দীন আইবকের হস্তগত হইল।

মুহম্মদের মৃত্যু

এই সময় হইতে তুর্কিজাতীয় মুসলমানগণ দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। একশত বৎসরের মধ্যে (আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বকালে) আসাম ও কাশ্মীর ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাদের পদানত হয়। রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকে এবং বহু লোক নানাকারণে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর মুসলমান সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়। কালে হিন্দুজাতির মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমিতে পরিণত হয় এবং উভয় জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে নূতন এক মিশ্রিত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়।

তুর্কি অধিকারের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল

হিন্দুজাতির পতনের কারণ—হিন্দুজাতির অধঃপতনের ফলেই ভারতে মুসলমানদের পক্ষে প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু যদি সম্মিলিতভাবে মুসলমানগণকে বাধা দিত, তবে তাহাদের পক্ষে ভারতবর্ষ অধিকার করা সম্ভব হইত না। একতার অভাব হিন্দুজাতির পতনের প্রধান কারণ। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক একতার অভাবে বহু রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল রাজ্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ক্রমশঃ হীনবল হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কতিপয় রাজ্য তুর্কি আক্রমণকারিগণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে বাধা দিয়াছিল ; কিন্তু নানা কারণে এইরূপ সাময়িক ঐক্য কার্য্যকর

একতার অভাব

হয় নাই। হিন্দুসেনাপতিগণের সমরকুশলতার অভাব এবং সামরিক বিদ্যার অবনতি হিন্দুগণের দুর্ব্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। জাতিভেদের ফলেও জাতীয় অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া নববলদৃপ্ত তুর্কিজাতি হিন্দুগণকে পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন তাহারা আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। সমর-নৈপুণ্যের অভাব

Model Questions

1. Give an account of Sultan Mahmud's expeditions against India with reference to his character and achievements.

2. Describe the conquest of Northern India by the Muslims under the houses of Ghazni and Ghur.

3. Write notes on: (1) Dabir, (2) Prithviraj Chauhan, (3) Muhammad Ghuri, (4) the Sahis, (5) Jayachchandra, (6) Muhammad-bin Qasim.

দ্বাদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানগণের যুগ (১২০৬-১৫২৬)

দাস বংশ স্থাপন	...	...	১২০৬
ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল	...	...	১২১১-৩৬
ঘিয়াস্উদ্দীন বল্বনের রাজত্বকাল	...	...	১২৬৬-৮৭
আলাউদ্দীন খল্জীর রাজত্বকাল	...	...	১২৯৬-১৩১৬
আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়	...	...	১২৯৪-১৩১৩
মুহম্মদ বিন তুঘ্লুকের রাজত্বকাল	...	...	১৩২৫-৫১
তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ	...	...	১৩৯৮
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ	...	...	১৫২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ—দাস বংশ (১২০৬-৯০)

কুতব্উদ্দীন (১২০৬-১০)

রাজ্যলাভ—নিঃসন্তান অবস্থায় মুহম্মদ ঘূরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পরাক্রান্ত ক্রীতদাসেরা তাঁহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করেন। রাজ্যবিভাগ গজনীতে **তাজ্উদ্দীন**, সিন্ধুদেশে **নাসিরুউদ্দীন** এবং দিল্লীতে কুতব্-উদ্দীন স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। মুহম্মদের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঘূরের সুল্তান হইয়াছিলেন; তিনি কুতব্উদ্দীনকে 'সুল্তান' উপাধি প্রদান করিলেন। কুতবের স্থাপিত রাজবংশ 'দাসবংশ' নামে পরিচিত; কারণ এই বংশের তিনজন প্রধান সুল্তান (কুতব্উদ্দীন, ইলতুৎমিস ও ঘিয়াস্-উদ্দীন বল্বন) প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন।

গজনী জয়ের চেষ্টা—শীঘ্রই গজনীর আধিপত্য লইয়া কুতব্-উদ্দীনের সহিত তাজ্উদ্দীনের বিরোধ উপস্থিত হইল। কুতব্উদ্দীন গজ্নী অধিকার করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাজ্উদ্দীন তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। এই ঘটনার ফলে

ভারতবর্ষের সহিত গজ্‌নীর সম্পর্ক ছিন্ন হইল। মুঘল সম্রাট্‌গণের সময়ে গজনী পুনরায় ভারতবর্ষের সহিত সম্মিলিত হয়।

চরিত্র—মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিবার পর ঘোড়া হইতে পড়িয়া কুতব্ উদ্দীন মারা যান। তিনি কার্য্যদক্ষতা ও বীরত্বের গুণে দাসত্ব হইতে লক্ষদাতা রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই যুগের অন্যান্য বীরের ন্যায় তাঁহার চরিত্রেও নৃশংসতার অভাব ছিল না; কিন্তু তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং 'লাখ্‌বক্স' (লক্ষদাতা) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্থাপত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুতব নামক এক মুসলমান সাধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি দিল্লীতে বিখ্যাত স্থাপত্য **কুতব্ মিনার** নামক স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। কোন কোন

দাস রাজগণের বংশলতা :—

(১) কুতব্ উদ্দীন (১২০৬-১০)

(২) আরাম শাহ্ (পোষ্য পুত্র ?) (১২১০)

কন্যা = (৩) ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-৩৬)

(৪) রুক্‌নুদ্দীন ফীরুজ (১২৩৬)

(৫) রজিয় (১২৩৬-৪০)

(৬) মুইজ্ উদ্দীন বহ্‌রাম (১২৪০-৪২)

(৭) আলাউদ্দীন মস্‌উদ (১২৪২-৪৬)

(৮) নাসিরুদ্দীন মহ্‌মুদ (১২৪৬-৬৬)

(৯) ঘিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন (নাসির্‌উদ্দীনের শ্বশুর) (১২৬৬-৮৭)

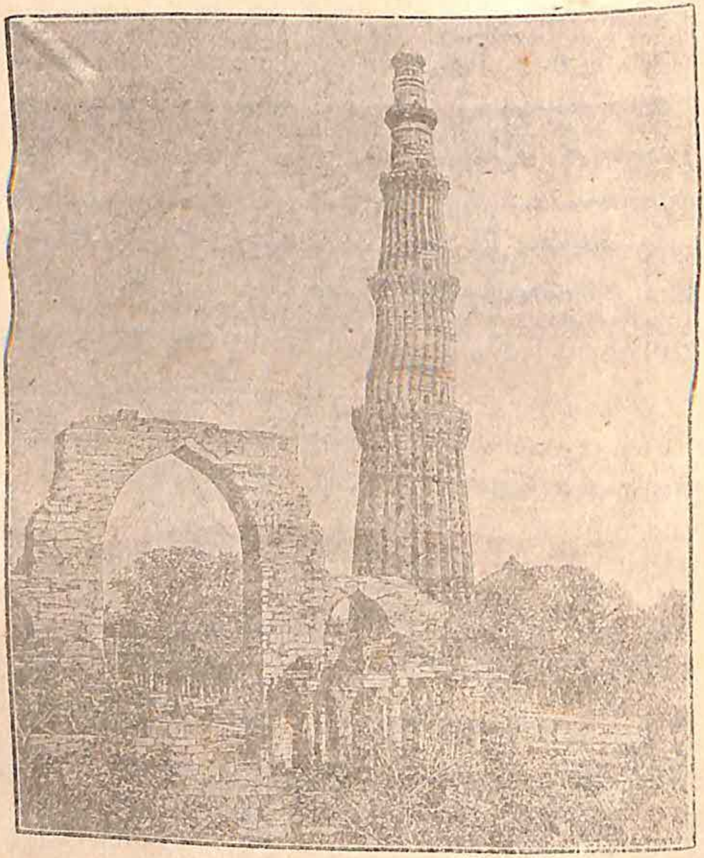
মুহম্মদ (মৃত্যু ১২৮৫)

বুঘ্‌রা খাঁ (বাংলার শাসন কর্ত্তা)

(১০) কৈকুবাদ (১২৮৭-৯০)

(১১) কৈয়ুমর্স (১২৯০)

ঐতিহাসিক বলেন যে, প্রথমতঃ কুতব্ মিনার সুল্তান কুতবের নামে পরিচিত ছিল ; কারণ সাধু কুতবের মৃত্যুর পূর্ব্বেই সুল্তান কুতব্ উহার



কুতব মিনার

গঠনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কুতব্ উদ্দীন আজমেরে 'আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া' নামক বিখ্যাত মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ইল্তুৎমিস্ (১২০১-৩৬)

রাজ্যলাভ— কুতব্উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (মতান্তরে পোষ্য পুত্র) **আরাম শাহ্** সিংহাসনে আরোহণ করেন ; কিন্তু তাঁহার

অকর্ম্মণ্যতার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীর ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ইল্তুৎমিস্‌কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ইল্তুৎমিস্ প্রথম জীবনে কুতব্‌উদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। কার্য্যদক্ষতা গুণে তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন।

যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তার—দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াই ইল্তুৎমিস্‌কে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। কুতব্‌উদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। সিন্ধুদেশের অধিপতি নাসির্‌উদ্দীন, বাংলাদেশের শাসক খল্জীবংশীয় ওমরাহ্‌গণ এবং গোয়ালিয়র ও রণ্‌থম্ভোরের হিন্দু শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইল্তুৎমিস্ ক্রমে ক্রমে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেন। পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বাংলা, গোয়ালিয়র ও রণ্‌থম্ভোরে তাঁহার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। তিনি মালবের অন্তর্গত ভীল্‌সা অধিকার করেন এবং প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরী লুণ্ঠন করিয়া মহাকালের বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস করেন (১২৩৪)।

বিদ্রোহ দমন

মালব

মুঘল আক্রমণ—কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহদমন করিয়াই ইল্তুৎমিস্ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে দুর্দ্দান্ত মুঘল জাতির নেতা **চিঙ্গীজ খাঁ*** এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার এক শত্রু মধ্য-এশিয়া হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চিঙ্গীজ খাঁ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হন। ইল্তুৎমিস্ চিঙ্গীজ খাঁর শত্রুকে আশ্রয় না দিয়া মুঘলগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

খলিফার সহিত সম্বন্ধ—বাগ্দাদের খলিফা পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার ক্ষমতা সামান্যই ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রাচীন প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম নষ্ট হয় নাই। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রেরিত এক প্রতিনিধি নানাবিধ উপহার

---

*ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাট্‌গণ ইঁহার বংশধর ছিলেন। চিঙ্গীজ খাঁর সময়ে মুঘলেরা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তখন তাহারা জাতীয় দেবদেবীর পূজা করিত। জলাল্-উদ্দীন খল্জীর সময়ে বহু মুঘল ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হয়।

তিনি বিদ্রোহীগণের এক নেতাকে বিবাহ করিয়া আত্মরক্ষা ও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তিনি ও তাঁহার স্বামী নিহত হইলেন।

রজিয়া ব্যতীত আর কোন রমণী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

নাসিরূউদ্দীন মহ্মূদ (১২৪৬-৬৬)

১২৪০ খৃষ্টাব্দে রজিয়ার মৃত্যু হয় এবং ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা নাসিরূউদ্দীন সিংহাসন লাভ করেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে **মুইজ্-উদ্দীন বহ্রাম** (১২৪০-৪২) ও **আলাউদ্দীন মসূদ** (১২৪২-৪৬) নামক দুইজন স্থল্তান (ইল্তুৎমিসের পুত্র ও পৌত্র) নামেমাত্র রাজত্ব করেন। নাসিরূউদ্দীন ধর্ম্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় নৃপতি ছিলেন, কিন্তু শাসনকার্য্য স্থচারুরূপে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী **উলুঘ খাঁ** নামক জনৈক ওম্রাহের উপর ন্যস্ত ছিল।

ঘিয়াসূউদ্দীন বল্বন (১২৬৬-৮৭)

রাজ্যলাভ—নিঃসন্তান অবস্থায় নাসিরূউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খাঁ 'ঘিয়াসূউদ্দীন বল্বন' নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ইল্তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা গুণে তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। ইল্তুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দুর্ব্বলতার ফলে ওম্রাহ্গণ বিশেষ চল্লিশ দাস ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে তুর্কিজাতির **চল্লিশ জন ক্রীতদাস** (The Forty) বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই ক্রীতদাসগণ সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। বল্বন ইঁহাদের অন্যতম নেতা ছিলেন।

রাজশক্তি দৃঢ়ীকরণ—সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বল্বন রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া ওম্রাহ্গণের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা

করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, দুর্দ্দান্ত ওম্‌রাহ্‌গণ যদি রাজশক্তির কাছে মস্তক অবনত না করে, তবে দেশে শান্তি স্থাপন করা অসম্ভব। এইজন্য তিনি ওম্‌রাহ্‌দিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার গুপ্তচরগণ রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া ওম্‌রাহ্‌গণের গতিবিধির সংবাদ সুল্‌তানকে জানাইত। কোন ওম্‌রাহ্‌ তাঁহার সন্দেহভাজন হইলে, তিনি তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন অথবা প্রজাদের উপর অবিচার বা অত্যাচার করিলে, তিনি প্রকাশ্যভাবে অপরাধী ওম্‌রাহ্‌কে গুরুতর শাস্তি দিতেন। ইতিপূর্ব্বে দাসবংশীয় কোন সুল্‌তান ওম্‌রাহ্‌গণের ক্ষমতা ও গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ওম্‌রাহ্‌ দমন

মেওয়াটে বিদ্রোহ দমন—বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী মেওয়াট নামক প্রদেশের রাজপুত অধিবাসিগণ স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই লুটপাট করিত এবং সময় সময় দিল্লীর উপকণ্ঠে পর্য্যন্ত অত্যাচার করিত। বল্‌বন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিলেন। ইহার পর ষাট বৎসর পর্য্যন্ত মেওয়াটীগণ আর কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহস করে নাই।

বাংলার বিদ্রোহ দমন—বাংলা দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে প্রয়াসী হইতেন। দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্ব বশতঃ সেখানে দিল্লীর সুল্‌তানগণের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্ত্তা **তুঘ্রিল খাঁ** বিদ্রোহী হন। তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ বল্‌বন দুইবার তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করেন; কিন্তু দুইবারই তাঁহার সেনাপতিগণ তুঘ্রিল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তখন বল্‌বন স্বয়ং সসৈন্যে বাংলা দেশে উপস্থিত হন এবং বিদ্রোহ দমনপূর্ব্বক তুঘ্রিলের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। তুঘ্রিলের আত্মীয় ও অনুচরগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সুল্‌তানের কঠোরতায় সর্ব্বত্র ভয়ের সঞ্চার হইল; ভবিষ্যতে বাংলায় বা অন্য কোন প্রদেশে আর বিদ্রোহের সম্ভাবনা রহিল

না। বল্‌বন স্বীয় পুত্র **বুঘরা খাঁ**কে বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। বঙ্গদেশে দিল্লীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

মুঘল আক্রমণ—ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর হইতে দুর্দ্দান্ত মুঘলগণ বারবার পঞ্জাব আক্রমণ করিতেছিল। বল্‌বন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মুঘলদিগকে বাধা দিবার জন্য উপযুক্ত সৈন্যদল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র **মুহম্মদ** পঞ্জাব রক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মুঘলগণের সহিত যুদ্ধে মুহম্মদ নিহত হইলেন। এই আঘাতে বল্‌বন নিতান্ত কাতর হন এবং প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে বল্‌বন সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

বলবনের মৃত্যু

চরিত্র—বল্‌বন প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল দিল্লীরাজ্য শাসন করেন; কারণ সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে নাসির্‌উদ্দীনের রাজত্বকালে দেশের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি দেশে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমন ও মুঘলগণের আক্রমণ প্রতিরোধ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার বীরত্ব ও সুদৃঢ় শাসনের ফলে ওম্‌রাহ্‌-গণের ক্ষমতা খর্ব্ব হয় এবং অবিচার ও অত্যাচার নিবারিত হয়। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেকালের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "যেদিন প্রজাগণের পিতৃ-স্বরূপ বল্‌বনের মৃত্যু হইল, সেদিন হইতে দেশের লোকের জীবন ও ধন-সম্পদ্‌ আর নিরাপদ রহিল না।"

সুশাসন

বল্‌বন যে কেবল বীর ও সুশাসক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার সভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফার্‌সি কবি **আমীর খুস্‌রু** বল্‌বনের সভাসদ্‌ ছিলেন। মুঘলগণের আক্রমণে রাজ্য হারাইয়া মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার বহু রাজ্যের রাজা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী মুসলমান সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

বিদ্যোৎসাহ

কৈকুবাদ (১২৮৭-৯০)

বল্‌বনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র (বাংলার শাসনকর্ত্তা বুঘ্‌রা খাঁর পুত্র) কৈকুবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া সর্ব্বদা বিলাসে মত্ত থাকিতেন। ফলে দেশে অরাজকতা আরম্ভ হইল। কয়েকজন ওম্‌রাহ্‌ **কৈয়ুমার্স্‌** নামক কৈকুবাদের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। অবশেষে **জলাল্‌উদ্দীন ফীরূজ খল্‌জী** নামক এক পরাক্রান্ত ওম্‌রাহ্‌ কৈকুবাদ ও কৈয়ুমার্স্‌কে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। দাস বংশের অবসান হইল। দাস বংশের অবসান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০)

জলাল্‌উদ্দীন ফীরূজ খল্‌জী (১২৯০-৯৬)

জলাল্‌উদ্দীন প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি যৌবনে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং বার্দ্ধক্যে প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার চরিত্রে দয়া, ক্ষমা, ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি গুণ প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া রাজ্যমধ্যে অনেকেই শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বল্‌বনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত হন। জলাল্‌উদ্দীন তাঁহাকে শাস্তিদানের পরিবর্ত্তে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। ঠগ প্রভৃতি দস্যুগণকেও তিনি ক্ষমা করিতেন। যে দুর্দ্দান্ত মুঘলগণ এতদিন বারবার পঞ্জাব আক্রমণ করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দিল্লীর নিকটে স্থায়ীভাবে বাস করিবার অনুমতি দেন। ইহারা **'নব মুসলমান'** নামে পরিচিত হইল। সে যুগে কঠোর শাসন ও ভীতিপ্রদর্শন ব্যতীত দেশে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব ছিল। কাজেই জলাল্‌উদ্দীন শাসক হিসাবে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। রাজ্য শাসনে দুর্ব্বলতা।

প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পরে জলাল্‌উদ্দীন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন কর্তৃক নিহত হন।

আলাউদ্দীন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬)

দেবগিরি বিজয়—জলাল্‌উদ্দীন তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াই তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত কারা ও অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল ছিল। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণের ভাণ্ডারে বিপুল ধনরত্ন সঞ্চিত আছে শুনিতে পাইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এতদিনের মধ্যে দিল্লীর কোন সুল্‌তান বা সেনাপতি বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সুদূর-দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিতে সাহসী হন নাই। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আলাউদ্দীন সসৈন্যে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী দেবগিরিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য তখন যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। অকস্মাৎ প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রামচন্দ্র মুসলমানদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না। তিনি নিজ রাজ্যের একটি প্রদেশের জন্য

যাদব রাজার পরাজয়

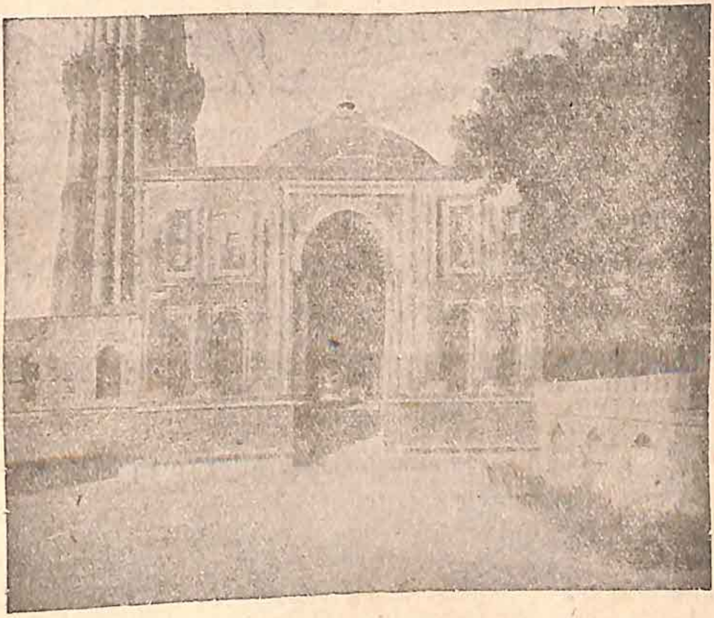
খল্‌জীসুল্‌তানগণের বংশলতা :—

(১) জলাল্‌উদ্দীন ফীরূজ (১২৯০-৯৬)
|
(২) রুক্‌নউদ্দীন ইব্রাহীম (১২৯৬)

(৩) আলাউদ্দীন মুহম্মদ
(জলাল্‌উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা)
(১২৯৬-১৩১৬)
|
- খিজির খাঁ
- (৫) কুতব্‌উদ্দীন মুবারক (১৩১৬-২০)
  - (৬) নাসিরুউদ্দীন খুস্রু (১৩২০) (মুবারকের কর্ম্মচারী)
- (৪) শিহাব্‌উদ্দীন উমর (১৩১৬)

আলাউদ্দীনকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইলেন, এবং প্রভূত ধনরত্ন উপহার দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

রাজ্যলাভ—বিজয়-গৌরবে বিভূষিত এবং ধনরত্নে সমৃদ্ধ হইয়া আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য হইতে কারাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধ সুল্‌তান জলাল্‌উদ্দীন আশা করিয়াছিলেন যে, আলাউদ্দীন তাঁহাকে লুণ্ঠিত ধনরত্নের অংশ প্রদান করিবেন; কিন্তু আলাউদ্দীন মনে মনে দিল্লীর



দিল্লীর আলাঈ দরওয়াজা (আলাউদ্দীন খল্‌জী কর্তৃক নির্ম্মিত)

সিংহাসন লাভের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি সুল্‌তানকে কারাতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্নেহান্ধ জলাল্‌উদ্দীন হিতৈষী মন্ত্রিগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কারায় গমন করিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রহরী না লইয়া আলাউদ্দিনের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে এক গুপ্তঘাতক অকস্মাৎ জলাল্‌উদ্দীনের শিরশ্ছেদন করিল। ইহার পর আলাউদ্দীন নিজেকে দিল্লীর সুল্‌তান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজভক্ত ওম্‌রাহ্‌গণ

জলালউদ্দীনের মৃত্যু

রুক্‌নউদ্দীন

রুক্‌নউদ্দীন ইব্রাহীম নামক জলাল্‌উদ্দীনের এক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া আলাউদ্দীনকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং প্রচুর অর্থ বিতরণ করিয়া জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিলেন। তাঁহার আদেশে জলাল্‌উদ্দীনের পরিবারবর্গের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইল।

চরিত্র—আলাউদ্দীন যে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও শাসন-কৌশল প্রশংসনীয়। তাঁহার শাসনকালে অজস্র রক্তপাত হইয়াছিল এবং প্রজাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না; কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় প্রায় সমগ্র ভারতে মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দাসরাজগণের সময়কালীন একটি মস্‌জিদের জন্য আলাউদ্দীন বিখ্যাত 'আলাঈ দরওয়াজা' নির্ম্মাণ করেন; উহা সেকালের শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি সাধু **নিজামুদ্দীন আউলীয়ার** দরগায় একটি সুন্দর মসজিদ এবং দিল্লীর উপকণ্ঠে 'সিরী' নামক একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করেন। বিখ্যাত কবি **আমীর খুসরু** তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। আলাউদ্দীন আলেক্‌জাণ্ডারের মত দিগ্বিজয় করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় দেখা যায়, তিনি 'দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ্‌ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত স্থাপনেরও কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এক স্পষ্টবাদী অমাত্যের উপদেশে এই সকল অদ্ভুত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই কার্য্যে তিনি বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মুসলমান প্রভুত্বের বিস্তার

স্থাপত্য

অসার কল্পনা

অত্যাচার—আলাউদ্দীনের রাজত্বলাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র হইতে থাকে। তিনি নির্ম্মমভাবে তাহা দমন করেন এবং এই সকল অশান্তির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন। মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া তিনি স্থির করিলেন যে, মদ্যপান, ওমরাহগণের পরস্পর বন্ধুত্ব ও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন এবং জনসাধারণের

মদ্যপানাদি নিষেধ

আর্থিক স্বচ্ছলতাই সকল বিদ্রোহ ও ষড়্‌যন্ত্রের কারণ। অতঃপর তিনি আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, রাজ্যমধ্যে কেহ মদ্যপান করিতে পারিবে না, এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত ওম্‌রাহ্‌গণ একসঙ্গে পানভোজন বা পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না। এই আদেশ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। ইহাদের সাহায্যে আলাউদ্দীন রাজ্যের সকল সংবাদ এবং ওম্‌রাহ্‌গণের গতিবিধির সন্ধান পাইতেন। জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিনষ্ট করিবার জন্য করভার বৃদ্ধি করা হইল। সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দুদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ মুসলমান-পরিবারে দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। বিশাল সৈন্যদল পোষণের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক হইত; তাই সামরিক ব্যয় লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিম্নে কয়েকটি দ্রব্যের আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রদত্ত হইল :—

গুপ্তচর

করবৃদ্ধি

দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দেশ

ধান	প্রতি মণ	চারি আনা
ডাল	প্রতি মণ	চারি আনা
তৈল	প্রতি মণ	দশ আনা
লবণ	প্রতি মণ	দেড় আনা

সৈন্যগণ অল্প মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে পারিত বলিয়া অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিত; কিন্তু এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ অসুবিধা হইল। দোকানদারেরা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আলাউদ্দীন বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই হুকুম কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

মুঘল আক্রমণ—আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথমভাগে মুঘলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল; এমন কি একবার তাহারা দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। আলাউদ্দীন প্রতিবারই তাহাদিগকে পরাজিত করেন। বন্দী মুঘলদিগকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া হত্যা করা হইত।

জলাল্‌উদ্দীনের সময় বহু মুঘল ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া **নব মুসলমান** নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং দিল্লীর নিকটে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। একবার কয়েকজন মুঘল আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করে। ফলে আলাউদ্দীনের আদেশে প্রায় ত্রিশ সহস্র 'নব মুসলমান' নিহত হয়।

মুঘল হত্যা

উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার—আলাউদ্দীন প্রকৃত পক্ষেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদ বিন তুঘ্‌লুক ও ঔরংজীব ব্যতীত দিল্লীর আর কোন মুসলমান সম্রাট্ এত বড় সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই।

১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের সেনাপতি উলুঘ খাঁ ও নস্‌রৎ খাঁ **গুজরাত** আক্রমণ করেন। গুজরাতের বাঘেলাবংশীয় রাজপুত রাজা কর্ণ রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। গুজরাত রাজ্যের সমৃদ্ধ বন্দরসমূহ হইতে বিপুল অর্থ দিল্লীর রাজকোষে আনীত হইল। রাজা কর্ণের পত্নী কমলা দেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দীনের মহিষীরূপে গৃহীতা হন, এবং তাঁহার কন্যা দেবলা দেবীকে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

গুজরাত অধিকার

১৩০০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন রাজপুতনার অন্তর্গত বিখ্যাত **রণ্‌থম্ভোর** (রণস্তম্ভপুর) দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গাধিপতি চৌহানবংশীয় হম্মীর বিপুল বিক্রমে বাধা দিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। দুইজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় চৌহানবীর নিহত হইলেন এবং দুর্গ আলাউদ্দীনের হস্তগত হইল (১৩০১)।

রণ্‌থম্ভোর বিজয়

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মেবাড়ের রাজধানী **চিতোড়** অধিকার করেন। এই সময় গুহিলোৎ (বা সীসোদিয়া) বংশীয় রত্নসিংহ চিতোড়ের রাণা ছিলেন। কথিত আছে যে, রত্নসিংহের পত্নী অপরূপসৌন্দর্য্যময়ী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্যই আলাউদ্দীন চিতোড় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং অপমান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পদ্মিনী সখীগণসহ জহর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই কাহিনী সত্য কিনা সন্দেহ; কারণ সম-সাময়িক কোন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ নাই যাহা

মেবাড় জয়

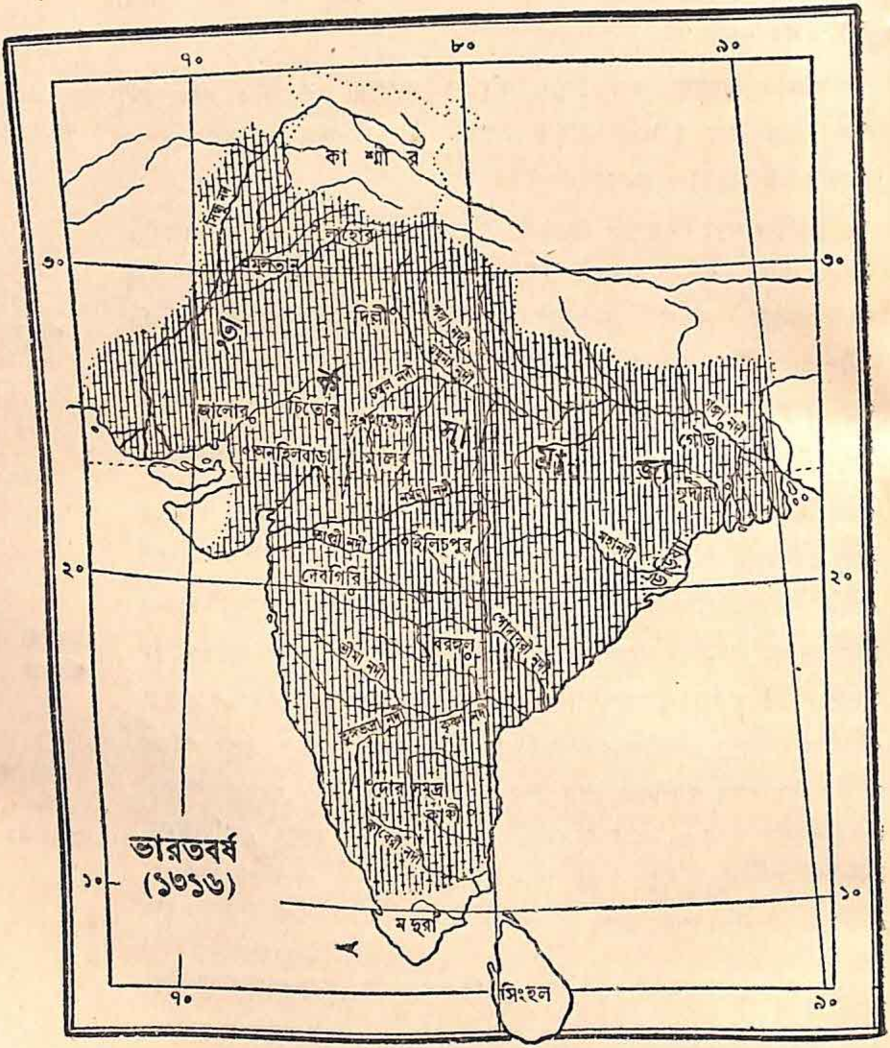
হউক, আলাউদ্দীন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে চিতোড়ের শাসনভার অর্পণ করেন।

১৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন **মালব** আক্রমণ করেন। উজ্জয়িনী, মণ্ডু, ধার এবং চন্দেরি তাঁহার হস্তগত হয়। এইরূপে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। মালব অধিকার

দাক্ষিণাত্য বিজয়—উত্তর-ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের অভিযানসমূহের নায়ক ছিলেন তদীয় সেনাপতি **মালিক কাফুর**। তিনি ক্রীতদাসরূপে গুজরাত হইতে দিল্লীতে আনীত হন। বুদ্ধি ও বীরত্বের গুণে কাফুর আলাউদ্দীনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। কাফুর

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে জলাল্‌উদ্দীনের রাজত্বকালে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া **দেবগিরির** যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গুজরাতের পলাতক রাজা কর্ণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া এবং বার্ষিক কর নিয়মিতভাবে প্রেরণ না করিয়া আলাউদ্দীনের বিরাগভাজন হন। ফলে ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। রামচন্দ্র স্বাধীনতা হারাইয়া করদ নৃপতিরূপে পরিগণিত হইলেন। পরে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শঙ্কর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে কাফুর তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে কাফুর **তেলিঙ্গনা** রাজ্যের কাকতীয়বংশীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া বাৎসরিক করদানে বাধ্য করেন। যাদবরাজ্য অধিকার তেলিঙ্গনা জয়

১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর **দোরসমুদ্র** নগরের হোয়্‌সলবংশীয় রাজা তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ইহার পর তিনি **মতুরার** পাণ্ড্যবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন মুসলমান সেনানায়ক এতদূর অগ্রসর হন নাই। হোয়্‌সল ও পাণ্ড্য রাজার পরাজয়



এই মানচিত্রে আলাউদ্দীন খলজীর সাম্রাজ্যের আনুমানিক আয়তন প্রদর্শিত হইয়াছে। কাশ্মীর—স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। মদুরার পাণ্ড্যরাজ্য লুণ্ঠিত হইলেও হিন্দু রাজার অধিকার বিনষ্ট হয় নাই। আসাম—স্বাধীন আহোম রাজ্য।

শেষ জীবন—সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াও আলাউদ্দীন শেষজীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল। মালিক কাফুরের ষড়্‌যন্ত্রে স্ত্রীপুত্রের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাফুর তাঁহাকে বিষপ্রদানে হত্যা করিয়াছিলেন। মৃত্যু

কুতব্‌উদ্দীন মুবারক খল্‌জী (১৩১৬-২০)

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর নিজের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য **শিহাব্‌ উদ্দীন উমর** নামক আলাউদ্দীনের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং রাজপরিবারের উপর নানারূপ অত্যাচার করেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাফুর নিহত হইলেন এবং **কুতব্‌উদ্দীন মুবারক** নামে আলাউদ্দীনের অপর এক পুত্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজ্যলাভ

রাজ্যলাভ করিয়া মুবারক প্রথমতঃ **দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ** দমনে মনোনিবেশ করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেবগিরির হিন্দু রাজা হরপাল (ভূতপূর্ব্ব রাজা রামচন্দ্রের জামাতা) স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মুবারক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্যে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন (১৩১৭)। দেবগিরি জয়

দাক্ষিণাত্যে জয় লাভের পর মুবারক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া বিলাসে মগ্ন হইলেন। **খুসরু** নামক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক নীচ জাতীয় হিন্দু তাঁহার প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

খল্‌জী বংশের বিলোপ

১৩২০ খৃষ্টাব্দে খুস্‌রু মুবারককে হত্যা করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিল এবং **নাসিরুউদ্দীন** নাম গ্রহণ করিল। সে নিজের নীচজাতীয় বন্ধুগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়া এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ওমরাহ্‌দিগের শত্রুতা অর্জ্জন করিল। অবশেষে খুসরুর রাজ্যলাভ ও মৃত্যু

পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিকের নেতৃত্বে ওম্‌রাহ্‌গণ খুসরুকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অতঃপর খল্‌জী বংশের কেহই জীবিত না থাকায়, সকলের সম্মতিক্রমে গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ্‌' নামে পরিচিত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তুঘ্‌লুক বংশ * (১৩২০-১৪১৩)

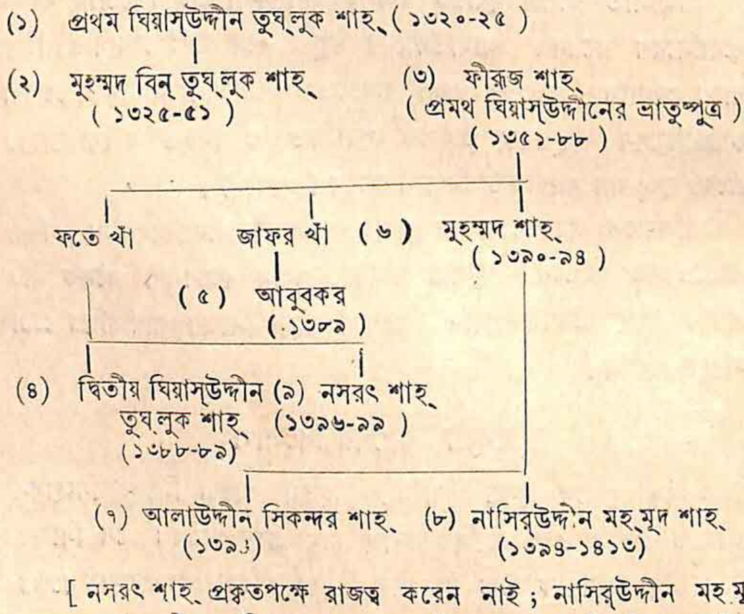
প্রথম ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ্‌ (১৩২০-২৫)

শান্তিস্থাপন ও শাসন সংস্কার—ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ্‌ বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; কিন্তু তখনও তাঁহার বীরত্ব ও শাসন-দক্ষতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বে দেশে পুনরায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত

সুশাসন

* এই বংশ **করৌনা তুর্ক বংশ** নামেও পরিচিত।

তুঘ্‌লুক সুলতানদিগের বংশলতা :—



[নসরৎ শাহ্‌ প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করেন নাই ; নাসিরুউদ্দীন মহ্‌মুদ শাহের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে সুল্‌তান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।]

হইল এবং অরাজকতার অবসানে জনসাধারণ শান্তিলাভ করিল। তিনি করভার হ্রাস করিয়া এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়া কৃষকগণের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহার সময়ে ডাকবিভাগে শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি দিল্লীর নিকটে 'তুঘ্‌লুকাবাদ' নামে এক নূতন শহর নির্ম্মাণ করেন।

বরঙ্গল অধিকার—কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিয়াই ঘিয়াস্‌উদ্দীন ক্ষান্ত হইলেন না। আলাউদ্দীন খল্‌জীর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য ঘিয়াস্‌উদ্দীন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র জৌনা খাঁর অধীনে একদল সৈন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন (১৩২১)। জৌনা খাঁ কাকতীয়রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রের রাজধানী বরঙ্গল অবরোধ করেন; কিন্তু হিন্দু সৈন্যগণের বীরত্বে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জৌনা খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কাকতীয় রাজ্য আক্রমণ করেন। এবার কাকতীয়রাজ বন্দী হইলেন। দাক্ষিণাত্যে অভিযান সফল হইল।

কাকতীয় রাজের সহিত যুদ্ধ

বাংলাদেশে দিল্লীর প্রাধান্য পুনঃস্থাপন—ঘিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের বংশধরগণ এই সময়ে বাংলায় প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হওয়ায় ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ্ স্বয়ং তথায় যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। পুনরায় বাংলা দেশে দিল্লীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

মৃত্যু—১৩২৫ খৃষ্টাব্দে ঘিয়াস্‌উদ্দীন বাংলা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জৌনা খাঁ তাঁহাকে এক কাষ্ঠমণ্ডপে অভ্যর্থনা করেন। সহসা সেই কাষ্ঠমণ্ডপ ভূমিসাৎ হওয়ায় ঘিয়াস্‌উদ্দীন নিহত হন। কথিত আছে, জৌনা খাঁর ষড়্‌যন্ত্রেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক (১৩২৫-৫১)

চরিত্র—ঘিয়াস্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনা খাঁ 'মুহম্মদ' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক (অর্থাৎ তুঘ্‌লুকের পুত্র মুহম্মদ) নামে

পরিচিত। তাঁহার চরিত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ নানা গুণ ও দোষের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ফারসি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। শিল্পের উন্নতির প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিত। তিনি দিল্লীর নিকটে 'জহাঁপনা' নামক একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। অন্যান্য সুল্‌তানদিগের মত তিনি বিলাসী ছিলেন না। কুতব্‌উদ্দীনের ন্যায় তাঁহার দানশীলতাও সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ ছিল। সাহস ও সৈন্যচালন-দক্ষতায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে ন্যায় বিচার প্রচলিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াও তিনি সময় সময় নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেন। তিনি স্থিরমস্তিষ্ক ছিলেন না, সকল বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। যখন যাহা করিবার ইচ্ছা হইত, তিনি তখনই তাহা করিতেন; ইহার ফলে প্রজাদের ক্ষতি অথবা সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইলেও নিজের উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হইতেন না। দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন, খোরাসান এবং ইরাক জয়ের কল্পনা, তামার নোট প্রবর্ত্তন প্রভৃতি তাঁহার অস্থির-মস্তিষ্কতার ফল। জনসাধারণের সুখদুঃখ ও মতামতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি নিজের নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তাঁহার কোন কার্য্যই সাফল্য লাভ করে নাই।

পাণ্ডিত্য

বীরত্ব

ও অবিবেচনা

আভ্যন্তরীণ নীতি—সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মুহম্মদ প্রজাগণের **কর-ভার বৃদ্ধি** করিলেন। ফলে কৃষকগণের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; দেশের সর্ব্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হইল। কৃষকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিল এবং পতিত জমি আবাদ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিল। মুহম্মদ মনে করিলেন যে, যাহারা রাজকর না দিয়া পলায়ন করে, তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তিদান করা আবশ্যক। তাই তিনি সৈন্যদলের সাহায্যে পলাতক প্রজাগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিলেন। এই সকল গোলযোগের ফলে কৃষিকার্য্যের গুরুতর অনিষ্ট হইল এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

কৃষক প্রজার উপর অত্যাচার

কথিত আছে যে, দিল্লীর অধিবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্যই মুহম্মদ দিল্লী হইতে **দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন** করিয়াছিলেন (১৩২৭)। সম্ভবতঃ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসনকার্য্য ও বিদ্রোহদমনের সুবন্দোবস্ত করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তিনি প্রাচীন যাদববংশীয় হিন্দুরাজগণের রাজধানী দেবগিরির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'দৌলতাবাদ' রাখিলেন এবং দিল্লীর অধিবাসিগণকে সেখানে যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাহাদের শারীরিক কষ্ট এবং আর্থিক ক্ষতির সীমা রহিল না। কিছুদিন পরেই মুহম্মদের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দৌলতাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। দৌলতাবাদের অধিবাসিগণকে পুনরায় দিল্লীতে আসিতে হইল। **রাজধানী পরিবর্ত্তন**

অতঃপর অর্থাভাব বশতঃ মুহম্মদ মুদ্রার সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে চীনদেশে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের নোট প্রচলিত ছিল। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে **তামার নোট প্রবর্ত্তন** করিলেন (১৩২৯)। এই নীতি প্রকৃতপক্ষে তেমন দূষণীয় নহে; কিন্তু জনসাধারণ ইহার অর্থ বুঝিতে না পারায় ইহা কার্য্যকরী হইল না। এই নোট যাহাতে জাল হইতে না পারে, সেজন্য মুহম্মদ কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। কাজেই বহু দুষ্ট লোক জাল তামার নোট তৈয়ার করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিল। বিদেশীয় বণিকগণ স্ব স্ব পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্বরূপ তামার নোট লইতে অস্বীকার করিল। ফলে বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। মুহম্মদ অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তামার নোটের প্রচলন বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজকোষ হইতে সমুদয় তামার নোটের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। **মুদ্রা সংস্কার ও উহার ব্যর্থতা**

রাজ্যজয়ের চেষ্টা—এই সকল আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলেও মুহম্মদের রাজ্যজয়-লিপ্সা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বিশ্ববিজয়ীরূপে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিবার জন্য তাঁহার তীব্র বাসনা ছিল। একবার তিনি **খোরাশান** ও **ইরাক** জয় করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী

সংগঠন করিয়াছিলেন। তাহার এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতঃপর তিনি **করাচল** নামক হিমালয়ের পাদদেশস্থ একটি পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল; কিন্তু এই অভিযানের ফলে বহু সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

বিদ্রোহ—মুহম্মদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের ফলে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি সৈন্যগণের সাহায্যে বিদ্রোহী-দিগকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বহাউদ্দীন গুর্‌শাস্প্ বিদ্রোহী হইলে তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করেন। বহ্‌রাম অইবা নামক অপর এক বিদ্রোহীও অনুরূপ শাস্তি লাভ করিলেন। কিন্তু মুহম্মদের নিষ্ঠুরতার ফলে বিদ্রোহের প্রকোপ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। জলাল্‌উদ্দীন নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ

মতুরা **মতুরা** প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪৪)। মুহম্মদ তাঁহাকে দমন করিতে পারিলেন না। দক্ষিণ-ভারতে ও গুজরাতে বিদেশীয় ওমরাহ্‌গণ বিদ্রোহী হইলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুগণ স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে **বিজয়নগরে** একটি স্বাধীন হিন্দু **রাজ্য** এবং ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে **বহ্‌মনী** নামক এক মুসলমান **রাজ্য** স্থাপিত হইল। **বাংলা** পুনরায় দিল্লীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বিজয়নগর ও বহ্‌মনী রাজ্য

বাংলা

মুঘল আক্রমণ—মুহম্মদের রাজত্বকালে মুঘলগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করেন।

খলিফার সহিত সম্বন্ধ—মুহম্মদের ধারণা ছিল যে, খলিফা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান সমাজের নেতা; সুতরাং তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন মুসলমান রাজার রাজ্যশাসনের অধিকার নাই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বহু উপঢৌকন সহ খলিফার নিকট দূত প্রেরণ করেন। বাগদাদের খলিফা তখন রাজ্য হারাইয়া মিশরের সুলতানের অতিথিরূপে কায়রোতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার

প্রবল প্রতাপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, সম্মানও অক্ষুণ্ণ ছিল না। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে খলিফার এক দূত দিল্লীতে উপস্থিত হন। মুহম্মদ স্বয়ং তাঁহার পদচুম্বন করেন এবং তাঁহাকে প্রচুর ধন-রত্ন উপহার দেন। মুহম্মদের মুদ্রায় খলিফার নাম লিখিত হইত।

ইবন্ বতুতা—আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মরক্কো দেশ নিবাসী ইবন্ বতুতা নামে পরিচিত এক পর্য্যটক মুহম্মদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল আবু আব্দুল্লা মুহম্মদ বিন্ আব্দুল্লা। মুহম্মদ তাঁহাকে দিল্লীর কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর এই পদে কার্য্য করিয়া তিনি মুহম্মদের দূতস্বরূপ চীনদেশে গমন করেন। তাঁহার লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা মুহম্মদের চরিত্র ও কার্য্যাবলী এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারি। অবশ্য তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তথাপি তাঁহার লিখিত বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। তিনি চীনের পথে চট্টগ্রামে অবতরণ করিয়া বিখ্যাত মুসলমান পীর শাহ্জালালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন। তখন বাংলা দেশে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত শস্তা ছিল। সাত পয়সায় একমণ চাউল এবং তিন টাকায় একটি উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া যাইত।

ভ্রমণবৃত্তান্ত

বাংলার অবস্থা

ফীরূজ শাহ্ (১৩৫১-৮৮)

রাজ্যলাভ—মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুকের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ফীরূজ শাহ্ সুল্তান হইলেন। ফীরূজ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন; সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় মুহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ফীরূজই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং মুহম্মদ স্বয়ং তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এইজন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ ফীরূজকে রাজ্যগ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন; তিনিও তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বীকৃত হন।

বিদ্রোহ দমন—ফীরূজ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ, শান্তিপ্রিয় ও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাম্রাজ্যের লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, এবং যেখানে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানেও সফল হন নাই। তিনি **সিন্ধু** দেশে বিদ্রোহ দমন করেন (১৩৬২-৬৩); কিন্তু দুইবার **বাংলা** আক্রমণ করিয়াও তিনি সেখানে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯)। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী রাজ্য অধিকার করিবার জন্য তিনি মোটেই চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সময়ে উত্তর-ভারতের কিয়দংশ মাত্র দিল্লীর অধীন ছিল।

বাংলায় ব্যর্থতা

শাসন-সংস্কার—ফীরূজ দয়ালু এবং প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি করভার লাঘব করিয়া প্রজাদের উপকার করেন। সেই যুগে অপরাধীদের প্রতি অতিশয় কঠোর শাস্তি বিধান করা হইত। হস্তপদাদি অঙ্গচ্ছেদ, জীবন্ত দাহ করা, গায়ের চামড়া তুলিয়া ফেলা প্রভৃতি বহুল প্রচলিত এবং সাধারণ শাস্তির মধ্যে গণ্য ছিল। ফীরূজ এই সকল অমানুষিক শাস্তি দানের প্রথা রহিত করেন। তিনি রুগ্ন ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং উহার তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বহু খাল খনন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রায় দুই শত মাইল দীর্ঘ যমুনা খাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফীরূজ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি বহু মস্‌জিদ এবং দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে 'ফীরূজাবাদ' নামক একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করেন। জৌনপুর শহর তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিচার-বিধি সংস্কার

কৃষি ও শিল্প

আর এক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ফীরূজকে আদর্শ সুশাসক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাঁহার ধর্ম্মনীতি উদার ছিল না। তাঁহার সময়ে হিন্দুরা প্রকাশ্যে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত না। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুদিগকে **জিজিয়া** নামক কর দিতে হইত। ফীরূজের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা এই কর হইতে অব্যাহতি পাইতেন; কিন্তু ফীরূজ ব্রাহ্মণদিগকেও এই কর দিতে বাধ্য করেন। যে সকল মুসলমান

ধর্ম্মবিষয়ক অনুদারতা

খলিফার সহিত সম্বন্ধ

ধর্ম্মবিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত মতামত ও আচার পালন করিত না, তাহাদিগকেও ফীরূজ হিন্দুদের মতই নির্য্যাতন করিতেন। মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুকের ন্যায় তিনিও খলিফার অনুমোদন লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। খলিফা তাঁহার সভায় এক দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার আশা সফল করিয়াছিলেন। ফীরূজ স্বয়ং 'আত্মজীবনী'তে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ফীরূজ শাহের উত্তরাধিকারিগণ (১৩৮৮-১৪১৩)

তুঘলুক বংশের অধঃপতন

১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফীরূজ শাহের মৃত্যু হয়। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছয় জন বংশধর—**দ্বিতীয় ঘিয়াসূউদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ্, আবু বকর, মুহম্মদ শাহ্, আলাউদ্দীন সিকন্দর শাহ্, নসূরৎ শাহ্** এবং **নাসিরূউদ্দীন মহ্‌মূদ শাহ্**—প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ওমরাহ্‌গণ দিল্লীতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। দিল্লীর সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইল।

আক্রমণের উদ্দেশ্য

তৈমূরলঙ্গের আক্রমণ (১৩৯৮)—তুঘ্‌লুক বংশের শেষ সুলতান মহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালে সমর্‌কন্দের অধিপতি তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৈমূর অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও নিতান্ত নির্ম্মম ছিলেন। খোঁড়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তিনি তৈমূরলঙ্গ নামে পরিচিত। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে শাস্তিদানই তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে দিল্লীর সুল্‌তানের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুল্‌তানের সৈন্যগণ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি এক লক্ষ বন্দীকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি দিল্লী অধিকার করিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ শহর লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসিগণকে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে বন্য পশুর মত হত্যা করিল। সুল্‌তান

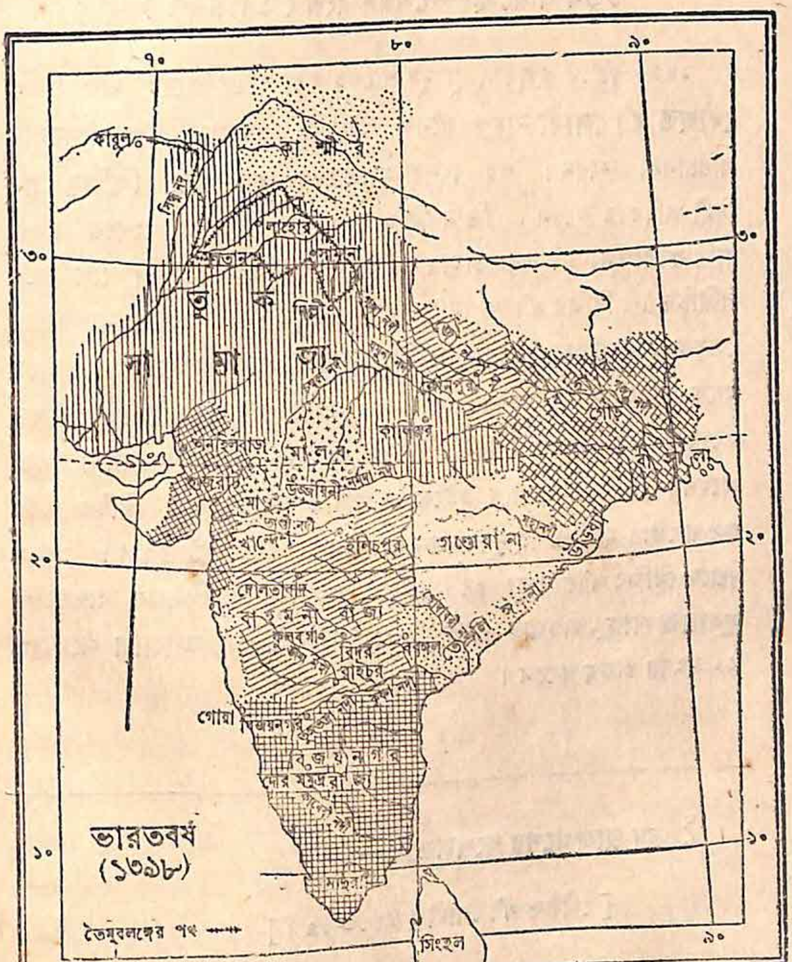
দিল্লী লুণ্ঠন

মহ্মূদ শাহ তাঁহাকে বাধা দিতে না পারিয়া ইতিপূর্ব্বেই গুজরাতে পলায়ন করিয়াছিলেন। অগণিত ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া তৈমুর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন।



তৈমুরলঙ্গ (সমসাময়িক চিত্র হইতে)

ইহার পর মহমূদ শাহ্ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নামে মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলুক বংশ বিলুপ্ত হইল।



প্রদর্শিত হইয়াছে। কাশ্মীর
তুঘ্লুক বংশের অধঃপতনের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা এই মানচিত্রে
জৌনপুর, বাংলা, গুজরাত, মালব, খান্দেশ, বহ্মনী রাজ্য—স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। বিজয়নগর,
উড়িষ্যা—স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। আসাম—স্বাধীন আহোম রাজ্য। রাজপুতানা কয়েকটি স্বাধীন
হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত—তন্মধ্যে মেবাড় প্রধান। গোণ্ডোয়ানা কয়েকটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত।
সীমানাগুলি আনুমানিক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)

১৪১৩ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান মুহ্‌মুদ শাহের মৃত্যু হইলে কয়েক মাস পর্য্যন্ত **দৌলত খাঁ লোদী** নামক জনৈক পরাক্রান্ত ওম্‌রাহ্‌ দিল্লীর শাসনভার পরিচালনা করেন। পর বৎসর মূলতানের শাসনকর্ত্তা **খিজির খাঁ** দিল্লী অধিকার করেন। তিনি নিজেকে হজরত মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন, এই জন্য তাঁহার স্থাপিত বংশ ইতিহাসে 'সৈয়দ' বংশ নামে পরিচিত। খিজির খাঁ আপনাকে স্বাধীন সুল্‌তানরূপে প্রচার না করিয়া
খিজির খাঁ তৈমূরলঙ্গ ও তাঁহার পুত্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন এবং মাঝে মাঝে সমরকন্দে কর প্রেরণ করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা দিল্লীর চতুপার্শ্বস্থিত কয়েকটি জিলায় সীমাবদ্ধ ছিল ; উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য সমুদয় প্রদেশ দিল্লীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। খিজির খাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যেও হিন্দুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে খিজির খাঁর মৃত্যু হয়। ইহার পর তাঁহার তিনজন বংশধর—**মুবারক শাহ্‌, মহম্মদ শাহ্‌** এবং **আলাউদ্দীন আলাম শাহ্‌**—৩০ বৎসর রাজত্ব করেন।

সৈয়দ রাজগণের বংশলতা ঃ—

[দৌলত খাঁ লোদী (১৪১৩-১৪)]

(১) খিজির খাঁ (১৪১৪-২১)

(২) মুবারক শাহ্‌ (১৪২১-৩৪)

ফরীদ খাঁ

(৩) মুহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৪-৪৪)

(৪) আলাউদ্দীন আলম শাহ্‌ (১৪৪৪-৫১)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

বুহ্‌লূল লোদী (১৪৫১-৮৯)

১৪৫১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ বংশের শেষ সুল্‌তান আলাউদ্দীন আলম শাহ্‌কে বিতাড়িত করিয়া বুহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর প্রথম আফ্‌গান সুল্‌তান। তিনি নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে **দিল্লীর** অধীশ্বর হন। তিনি জৌনপুরের স্বাধীন সুল্‌তানকে পরাজিত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র বার্‌বক্ শাহ্‌কে উহার শাসনভার অর্পণ করেন। বুহ্‌লুল লোদীর চেষ্টায় দিল্লীর পূর্ব্বগৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধৃত হয়।

জৌনপুর অধিকার

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)

বুহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম পুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বার্‌বক শাহ্‌কে বিতাড়িত করিয়া জৌনপুর অধিকার করিলেন। সিকন্দর বিহার ও ত্রিহুত জয় করিয়া বাংলা দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি শক্তিশালী ও ক্ষমতাপ্রিয় সুল্‌তান ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও জমিদারদিগকে তিনি কঠোরভাবে দমন করিতেন। ইহার ফলে অরাজকতার অবসান হয়; সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। তিনি রাজ্যমধ্যে ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এইসকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সিকন্দর লোদী ফীরূজ শাহের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন।

জৌনপুর ও বিহার জয়

ধর্ম্মবিষয়ক অনুদারতা

লোদী সুল্‌তানগণের বংশলতা ঃ—

(১) বুহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)

- বার্‌বক্ শাহ্
- (২) সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
  - (৩) ইব্রাহীম লোদী (১৫১৭-২৬)

তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মকার্য্য ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে নানা প্রকারে বাধা দেন এবং মথুরার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)

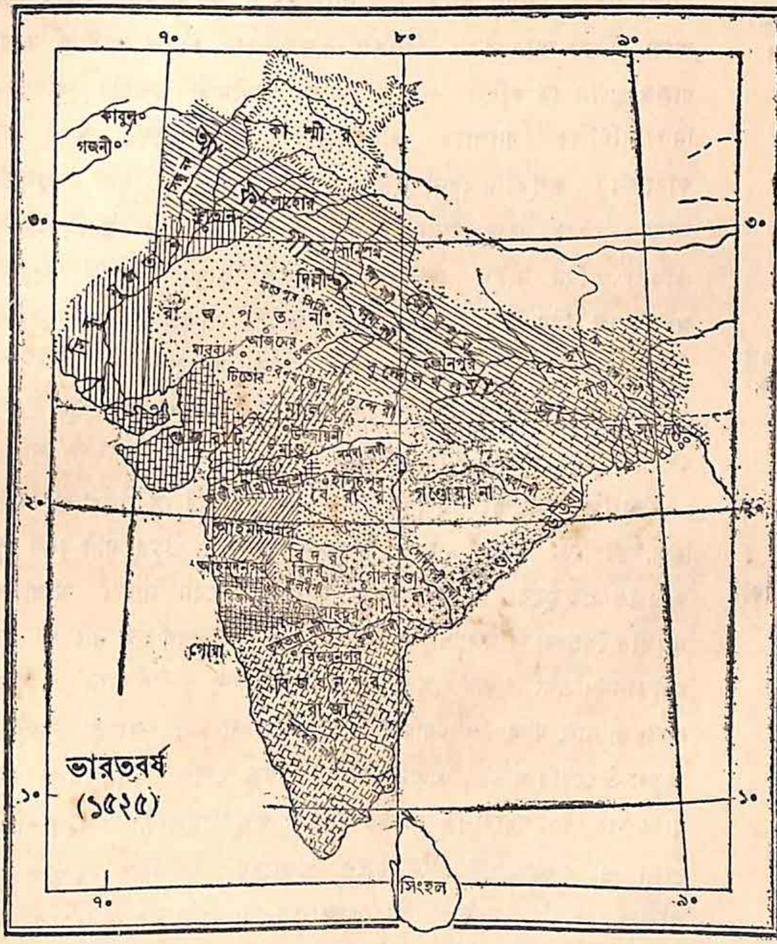
১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে পরাক্রান্ত ওম্‌রাহ্‌গণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা **দৌলত খাঁ লোদী** এবং **আলম্‌ খাঁ** নামক সুল্‌তান ইব্রাহীম লোদীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কাবুলের অধিপতি বাবুরকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। বাবুর পূর্ব্ব হইতেই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন, এবং ইব্রাহীম লোদীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া লাহোর ও দীপালপুর অধিকার করিলেন (১৫২৫)। পর বৎসর বাবুর পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** (১৫২৬) ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

বাবুর কর্ত্তৃক পঞ্জাব ও দিল্লী অধিকার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সুল্‌তানি আমলে দেশের অবস্থা

শাসন-পদ্ধতি—দিল্লীর সুল্‌তানগণ যে প্রণালীতে দেশ শাসন করিতেন, তাহার প্রশংসা করা যায় না। শাসনকার্য্যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল না। সুল্‌তান স্বেচ্ছাচারী ছিলেন; তাঁহার হুকুমই দেশের আইন রূপে পরিগণিত হইত; তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন 'উজির'। কার্য্যতঃ প্রায়ই সুল্‌তান এবং উজীরের ক্ষমতা রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগে সীমাবদ্ধ থাকিত। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের শাসনভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের উপর ন্যস্ত থাকিত। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কৃষির উন্নতি, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ দিতেন না। তাঁহারা সুল্‌তানের

কেন্দ্রীয় শাসন.



এই মানচিত্রে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালীন ভারতবর্ষের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। কাশ্মীর, বাংলা, গুজরাত, মালব, খান্দেশ, বিজাপুর, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা, বেরার, বীদর —স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। ১৪৮৪-১৫২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহ্‌মনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। বিজয়নগর ও উড়িষ্যা—স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। আসাম—স্বাধীন আহোম রাজ্য। রাজপুতনা ও গোণ্ডোয়ানা কয়েকটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত। জৌনপুর বুহলূল লোদী কর্তৃক অধিকৃত হয়। সীমানাগুলি আনুমানিক।

আভ্যন্তরীণ শাসন

প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত ভাবে দিতে পারিলেই স্ব স্ব প্রদেশে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। সুল্‌তানের দুর্ব্বলতার সংবাদ পাইলে তাহারা রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে জমিদারগণই জনসাধারণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সুল্‌তানি সেনা-বিভাগেও সুশৃঙ্খলার অভাব ছিল। সুল্‌তানি আমলে কোন হিন্দু শাসন-বিভাগে বা সেনা-বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই; কেবলমাত্র মালিক কাফুর প্রভৃতি কয়েকজন স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুর প্রতিপত্তি লাভের বিবরণ পাওয়া যায়। ফৌজদারী

কঠোর বিচার পদ্ধতি

বিচার-প্রথা নিতান্ত নির্ম্মম ছিল। সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। জীবন্ত অবস্থায় চামড়া তুলিয়া ফেলা, বুকে লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি ভয়াবহ শাস্তি প্রচলিত ছিল।

আর্থিক অবস্থা—সুল্‌তানি আমলে ভারতবর্ষ যে ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুল্‌তান মহ্‌মূদ প্রচুর মণি-মুক্তা লুণ্ঠন

অতুল ঐশ্বর্য্য

করিয়াও এই কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিতে পারেন নাই। আলাউদ্দীন খল্‌জীর সৈন্যদল দাক্ষিণাত্য অন্তঃসারশূন্য করিতে সমর্থ হয় নাই। দিল্লীর সুল্‌তানগণ এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ যে সকল প্রাসাদ, মন্দির ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাই ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু দেশে অগাধধনরত্ন সঞ্চিত থাকিলেও জনসাধারণের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাজা ও শাসকগণের অত্যাচারে প্রজাদের সময় সময় বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইত। মুহম্মদ বিন্ তুঘলুকের রাজত্বকালের ইতিহাস ইহার

দ্রব্যাদির সুলভ মূল্য

প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অরাজকতা এবং অনাবৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হইত। তথাপি মোটের উপর প্রজাদের খাদ্যাভাব হইত না; কারণ জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত শস্তা ছিল। ইব্‌ন্ বতুতার লিখিত ববরণে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য জানা যায়।

তুর্কি ও আফ্‌গান শাসকগণের পতনের কারণ—তুর্কি ও আফ্‌গানজাতীয় সুল্‌তানগণ প্রায় তিনশত কুড়ি বৎসর কাল (১২০৬-১৫২৬) দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাবুরের মৃত্যুর পর শের শাহ্‌

আফ্‌গান জাতির প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু এবং তদীয় বংশধরগণের দুর্ব্বলতার ফলে উহা স্থায়ী হয় নাই। বাবুর ও তাঁহার বংশধরগণ প্রকৃতপক্ষে তুর্কিজাতীয় হইয়াও ইতিহাসে 'মুঘল' নামে পরিচিত। যাহা হউক, আলাউদ্দীন খল্‌জী এবং মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক ব্যতীত অন্য কোন তুর্কিজাতীয় সুল্‌তান ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য শাসন করেন নাই। সৈয়দ ও লোদী বংশীয় সুল্‌তানগণের শাসিত রাজ্য এত ক্ষুদ্র ছিল যে, উহাকে 'সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত করা অসঙ্গত।

তুর্কি ও আফ্‌গান সুল্‌তানগণের পতনের তিনটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লকের অদ্ভুত খেয়াল এবং অত্যাচার। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্য এবং বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। দ্বিতীয়তঃ—ফীরূজ শাহ্‌ এবং তাঁহার বংশধরগণের দুর্ব্বলতা। তাঁহারা বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকে পুনরায় বশীভূত করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ—শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন-পদ্ধতির অভাব। সুল্‌তানগণ সাম্রাজ্যের সকল অংশ সাক্ষাৎভাবে শাসন করিতে পারিতেন না; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের যথেচ্ছাচার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করিবার কোন ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই। ফলে সুল্‌তানের দুর্ব্বলতা অথবা দিল্লীর সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইলেই প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। জনসাধারণের সহিত সুল্‌তানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা তাঁহার বিপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত না। এই সকল কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দিল্লীর সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল। সৈয়দ ও লোদীবংশীয় সুল্‌তানগণ সার্ব্বভৌম শাসকের সম্মান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই জন্যই বাবুরের আক্রমণে উত্তর-ভারতে আফ্‌গান প্রভুত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল।

Model Questions

1. Briefly narrate the history of the Slave Dynasty of Delhi. Who was the greatest king of this Dynasty?

2. Give an account of the reign of Ghiyasuddin Balban.

3. Describe briefly the history of the Muslim power in India under the Khalji Dynasty of Delhi.

4. Sketch the career of Alauddin Khalji as a conqueror and a ruler.

5. Narrate briefly the history of the Tughluq Sultans of Delhi.

6. Give an account of the reign of Muhammad-bin-Tughluq Shah and show how his measures led to the decline of the power of the Sultanate of Delhi.

7. Write a note on the reign of Firuz Shah of the Tughluq Dynasty with reference to the services rendered by him to the people.

8. Give an account of the invasion of Timur and compare it with that of Nadir Shah.

9. How long did the Turko-Afghan Sultans rule in Delhi? What were the causes of their downfall?

10. Write notes on: Iltutmish, Raziyya, Malik Kafur, Sikandar Lodi, the First Battle of Panipat.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক স্বাধীন রাজ্যসমূহের বিবরণ

বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন	...	...	১৩৩৬
বহ্‌মনী রাজ্য স্থাপন	...	...	১৩৪৭
গুজরাতের স্বাধীনতা	...	...	১৪০৭-১৫৭২
দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ রাজ্যের উৎপত্তি	...	...	১৪৮৪-১৫২৬
মেবারের সংগ্রামসিংহ	...	...	১৫০৮-২৭
বহ্‌মনী রাজ্যের পতন	...	...	১৫২৬
আক্‌বরের মালব জয়	...	...	১৫৬১
তলিকোটের যুদ্ধ	...	...	১৫৬৫
উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের অবসান	...	...	১৫৬৮

মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের রাজত্বের শেষভাগে তুর্কি সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান

রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের পর দিল্লীর সুল্‌তানগণের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল; কেবলমাত্র লোদীবংশীয় সুল্‌তানগণ বিহার পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট্ আক্‌বর ও ঔরংজীবের সময়ে প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ ক্রমে ক্রমে পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের মৃত্যু, ১৩৫১) হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ (ঔরংজীব কর্ত্তৃক বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মরাঠা রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার, ১৬৮৬-৮৯) পর্য্যন্ত প্রায় সারে তিনশত বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি প্রবল স্বাধীন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহ

কাশ্মীর (১৩৩৯-১৫৮৬)

১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের হিন্দু রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার মুসলমান মন্ত্রী **শাহ্ মীর** সিংহাসন অধিকার করেন। এইরূপে কাশ্মীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুল্‌তান **সিকন্দর শাহ্** (১৩৯৩-১৪১৬) গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি বহু হিন্দু মন্দির এবং দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। তাঁহার সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র **জৈনুল আবিদীন** (১৪২০-৭০) ধর্ম্মসম্বন্ধে আক্‌বরের ন্যায় উদার ছিলেন। তিনি স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং পাণ্ডিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুরা নির্ভয়ে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত। তাঁহার বংশধরগণের দুর্ব্বলতাবশতঃ মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে **গাজী শাহ্** নামক এক মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর কাশ্মীর জয় করেন। **জৈনুল আবিদীন**

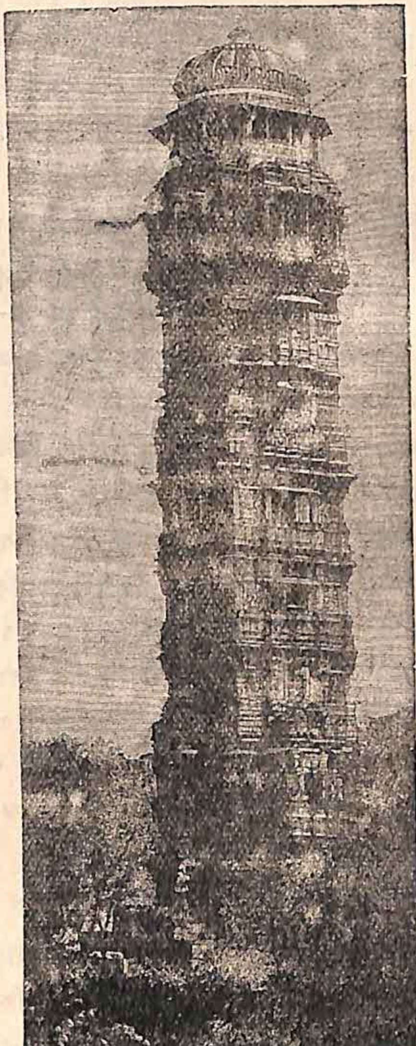
মেবাড়

রাজপুতনার রাজ্যসমূহের মধ্যে মেবাড় বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে **বপ্প** (বা **বাপ্পা**) নামক এক বীর মেবাড়ে প্রাধান্য স্থাপন করেন। মেবাড়ের রাজবংশ **গুহিলোৎ** বা **সীসোদিয়া বংশ** নামে পরিচিত। মেবাড়-রাজগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে বৈদেশিক গুর্জ্জর জাতির বংশধর বলিয়াই মনে হয়। **বাপ্পা**

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মেবাড়ের রাণাগণ বারংবার মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খল্‌জী মেবাড়-রাজধানী চিতোড় অধিকার করেন এবং তদীয় পুত্র খিজির খাঁকে উহার শাসনভার প্রদান করেন। ইহার কিছুকাল পরে—সম্ভবতঃ স্থল্‌তান মুহম্মদ বিন্‌ তুঘ্‌লুকের রাজত্বকালে—সীসোদিয়া বংশীয় বীর **হম্মীর** মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া চিতোড় পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার সময় হইতেই মেবাড়ের গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হম্মীরের বংশধরগণের মধ্যে **কুম্ভা** (আনুমানিক ১৪৩৩-৬৮)

রাণা কুম্ভা

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মালব ও গুজরাতের মুসলমান স্থল্‌তানগণের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবতঃ এই সকল যুদ্ধে তাঁহার জয় হইয়াছিল; কারণ তিনি চিতোড়ে জয়সূচক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।



রাণা কুম্ভার জয়স্তম্ভ—চিতোড়

কুম্ভার পৌত্র রাণা **সংগ্রামসিংহ** বা সাংগা (আনুমানিক ১৫০৮-২৭) "সমর-শত-বিজয়ী" মহাবীর ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মেবাড় রাজ্য

গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। তিনি গুজরাতের সুল্‌তানকে পরাজিত এবং মালবের সুল্‌তানকে বন্দী করেন। মুসলমান রাজশক্তি বিনষ্ট করিয়া ভারতে পুনরায় হিন্দু প্রভুত্ব স্থাপন করাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দিল্লীর সুল্‌তান ইব্রাহীম লোদীর দুর্ব্বলতায় তিনি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ লাভ করিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী বাবুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে, সংগ্রামসিংহ বাবুরকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে **খানুয়ার যুদ্ধে** বাবুর জয়লাভ করিলেন। এই পরাজয়ে সংগ্রামসিংহের সকল আশা বিনষ্ট হইল এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণা সাংগা।

সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে গুজরাতের সুল্‌তান বহাদুর শাহ্ কিছুকালের জন্য চিতোড় অধিকার করিলেন। অতঃপর সম্রাট্ আক্‌বর সংগ্রামসিংহের পুত্র **উদয় সিংহ**কে পরাজিত করিয়া চিতোড় স্বরাজ্যভুক্ত করেন। উদয়সিংহের পুত্র বিখ্যাত বীর **প্রতাপসিংহ** বহুদিন আক্‌বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অবশেষে সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রতাপসিংহের পুত্র **অমর সিংহ** দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন।

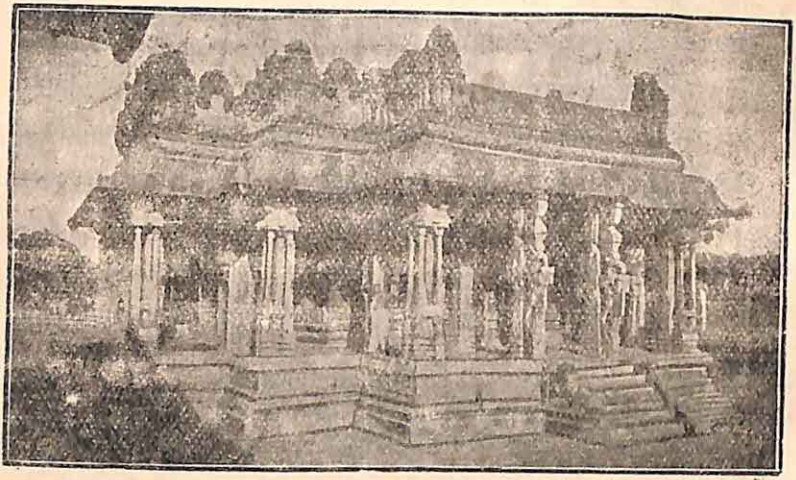
গুজরাত (১৪০৭-১৫৭২)

১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খল্‌জী গুজরাতের বাঘেলাবংশীয় রাজপুত রাজা দ্বিতীয় কর্ণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ইহার পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সুল্‌তানের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণ গুজরাত শাসন করিতে থাকেন। গুজরাত চিরদিনই বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। মুসলমান শাসকগণের সময়েও গুজরাতের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উহা তুর্কি সুল্‌তানগণের অধীন প্রদেশসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পদশালী বলিয়া গণ্য হয়।

মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের রাজত্বের শেষভাগে গুজরাতের বিদেশী আমীরগণ বিদ্রোহী হন। সুল্‌তান তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই গুজরাতের দিল্লীর

করেন। এই বংশের শাসনকালে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও গৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল। আরবীডু বংশের তৃতীয় রাজা **বেঙ্কট** চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি তেলুগু সাহিত্যের এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ অবস্থা—বিদেশীয় পর্য্যটকগণ বিজয়নগরের ধনৈশ্বর্য্য



বিজয়নগরের একটি মন্দির

ও স্থাপত্যসম্পদ্ এবং তত্রত্য হিন্দুরাজগণের সুশাসনের অজস্র প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইতালীয় পর্য্যটক **নিকোলো কন্তি** (১৪২০) হিরাতবাসী মুসলমান দূত **আবতুর্ রজ্জাক** (১৪৪৩), পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক **পাএস** (১৫২২) ও **নুনিজ** প্রভৃতি বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ হিন্দুরাজাদিগের আমলে বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতে এই রাজ্যের এবং রাজগণের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। বিজয়নগরের রাজগণ সংস্কৃত, কানাড়ি ও তেলুগু সাহিত্যের সমাদর করিতেন। তাঁহাদের সময়ে নির্ম্মিত সুদৃশ্য মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে সে যুগের শিল্পীগণের আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণ

বহ্‌মনীরাজ্য (১৩৪৩-১৫২৬)

মুহম্মদ বিন্ তুঘলুকের রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের বিদেশী মুসলমান ওম্‌রাহ্‌গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং কিয়ৎকাল পরে হসন নামক তাঁহাদের জনৈক নেতা এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৭)। হসন **আলাউদ্দীন বহ্‌মন শাহ্‌** নাম গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'বহ্‌মনী রাজ্য' নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে যে, হসন বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন এবং প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ নিজের বংশের ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হসন নিজেকে পারস্যের প্রসিদ্ধ বীর বহ্‌মনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন বলিয়াই 'বহ্‌মন শাহ্‌' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই হসন নানাদিকে অধিকার বিস্তার করেন। পূর্ব্বে বরঙ্গলের সীমারেখা হইতে পশ্চিমে কোঙ্কণ উপকূল এবং উত্তরে বেরার হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। **গুল্‌বর্গা** তাঁহার রাজধানী ছিল। গোয়া ও দাভোল নামক দুইটি বিখ্যাত বন্দর হসনের রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি আটজন মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যটিকে চারিটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন—দৌলতাবাদ, গুল্‌বর্গা, বেরার ও বীদর। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন পরলোকগমন করেন।

আলাউদ্দীন বহ্‌মন শাহ্‌

আলাউদ্দীনের বংশধরগণের মধ্যে **ফীরূজ শাহ্‌** (১৩৯৭-১৪২২) নামক একজন সুল্‌তান বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি সুশাসক এবং সুবিচারক ছিলেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'দাক্ষিণাত্যের আক্‌বর' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। ফীরূজ বিবিধ ভাষায় কথাবর্ত্তা বলিতে পারিতেন। তিনি বিজয়নগরের সহিত তিন বার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম দুইবার তিনি জয়লাভ করেন এবং বিজয়নগরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু তৃতীয়বারে তাঁহার পরাজয় হয়।

ফীরূজ শাহ্‌

মুসলমান ছিলেন। তিনি মণ্ডুতে 'জাহাজমহল' নামক সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

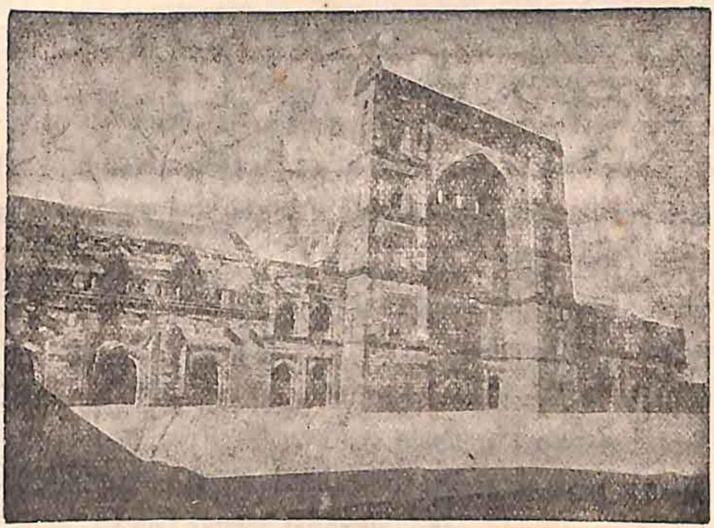
মহ্‌মূদ খাঁ খল্‌জীর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণের দুর্ব্বলতা বশতঃ মালব রাজ্যের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে **দ্বিতীয় মহ্‌মূদ খল্‌জী** নামক সুল্‌তানের রাজত্বকালে প্রকৃত ক্ষমতা **মেদিনী রায়** নামক এক রাজপুত সেনাপতির হস্তগত হয়। এই সময়ে মেবাড়ের রাণা সংগ্রামসিংহ মালব আক্রমণ করিয়া মহ্‌মূদ খল্‌জীকে পরাজিত ও বন্দী করেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া মালব রাজ্য ফিরাইয়া দেন। অভ্যন্তরীণ নানাপ্রকার গোলযোগের ফলে মালবের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের বিখ্যাত সুল্‌তান বহাদুর শাহ্‌ মালব জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিছুদিন পর মালব বহাদুর শাহের হস্তচ্যুত হইয়া দিল্লীর মুঘল সম্রাট্‌ হুমায়ুনের অধীন হয়। হুমায়ুনের পতনের পর **মল্লু খাঁ** নামক এক ব্যক্তি পুনরায় মালবে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু দিল্লীর আফগান সম্রাট্‌ শের শাহ্‌ কর্ত্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর মালব **শুজাৎ খাঁ** নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর শুজাৎ খাঁর পুত্র, স্বাধীন সুল্‌তান **বাজ বহাদুরকে** পরাজিত করিয়া মালব রাজ্য অধিকার করেন।

জৌনপুর (১৩৯৪-১৪৭৯)

তুঘ্‌লুকবংশীয় সুল্‌তান ফীরূজ শাহ্‌ জৌনপুর নগর স্থাপন করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে **খাজা জহান** নামক দিল্লীর এক ওম্‌রাহ্‌ কনৌজ ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া জৌনপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পালিত পুত্র **ইব্রাহীম শাহ্‌** (১৪০২-৩৬) এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুল্‌তান ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু নূর কুতব উল্‌ আলমের অনুরোধে বাংলার স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ উক্ত সাধুর বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি ইব্রাহীম শাহ্‌কে নিবৃত্ত করেন। ইব্রাহীম শাহ্‌ বহু সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন। বিখ্যাত

ইব্রাহীম শাহ্‌

অতালা মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্য তিনিই সমাপ্ত করেন। তাঁহার সময় জৌনপুর মুসলমান সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই বংশের শেষ রাজা **হুসেন শাহ্‌** (১৪৯৮-০৯) জৌনপুরের প্রসিদ্ধ জাম-ই-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান বুহলুল লোদী



জৌনপুরের জাম-ই মস্‌জিদ (হুসেন শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত)

জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বার্‌বক শাহ্‌কে উহার শাসনভার অর্পণ করেন। জৌনপুরের স্বাধীন রাজবংশ **শর্কী** (বা প্রাচ্য) **বংশ** নামে পরিচিত; কারণ এই রাজ্য দিল্লীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল।

আসাম

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী শান জাতির এক শাখা কামরূপে উপস্থিত হয়। ইহারা ইতিহাসে **আহোম** জাতি নামে পরিচিত। কালক্রমে কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ অহোম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাদের নামানুসারে এই প্রদেশ 'আসাম' নামে পরিচিত হয়। **আহোম অধিকার**

আহোম রাজগণের মধ্যে **স্থহুংমুং** (১৪৯৭-১৫৩৯) বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে অহোম রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং **শঙ্করদেব** নামক একজন ধর্ম্মসংস্কারক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

বাংলাদেশ হইতে মুসলমানগণ বারংবার আসাম আক্রমণ করিয়াছিল; তাহারা কখনও আসামে স্থায়ীভাবে অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিহার ও পশ্চিম-বাংলা বিজেতা ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী তিব্বত (অথবা হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ) হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আহোমরাজ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর ঘিয়াসুউদ্দীন, তুঘ্রিল খাঁ প্রভৃতি বাংলার আরও কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা কামরূপে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ব্যর্থকাম হন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও মুসলমানগণ বার বার আসাম আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু আহোমরাজ **প্রতাপসিংহ** (১৬০৩-৪১) তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্‌জহান যখন পীড়িত হন (১৬৫৭-৫৮), তখন তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ পাইয়া আহোমেরা মুঘলদের অধিকৃত গৌহাটী হস্তগত করে। ঔরংজীবের সিংহাসন লাভের পর বাংলার শাসনকর্ত্তা **মীর জুম্‌লা** আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬২-৬৩)। আহোমরাজ **জয়ধ্বজসিংহ** পরাজিত হইয়া বার্ষিক কর দিতে সম্মত হন এবং স্বীয় রাজ্যের কিয়দংশ দান করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই আহোমগণ পুনরায় গৌহাটী অধিকার করে। কামরূপ চিরদিনের জন্য মুঘলদিগের হস্তচ্যুত হয়।

আহোম-মুঘল সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আহোম রাজগণের পতন আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মরাজ আসাম আক্রমণ করেন এবং ঐ দেশটি পাঁচ বৎসর (১৮১৯-২৪) ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতঃপর প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে আসাম ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

উড়িষ্যা

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উড়িষ্যাকে **জাজনগর** রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনারকের সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা **প্রথম নরসিংহ** (আনুমানিক ১২৪০-৬৪) লক্ষ্মণাবতী (অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলমান রাজ্য ও উহার রাজধানী) আক্রমণ করিয়া তুঘ্রিল খাঁকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রথম নরসিংহের শত বর্ষ পরে **তৃতীয় ভানুদেব** নামক গঙ্গরাজের রাজত্বকালে বাংলার সুল্‌তান **শম্‌সউদ্দীন** ইলিয়াস শাহ্ (আনুমানিক ১৩৪২-৫৭) এবং দিল্লীর সুল্‌তান ফীরূজ-শাহ্ (আনুমানিক ১৩৬০) উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কথিত আছে, সুল্‌তান ফীরূজ শাহ্ উড়িষ্যারাজের প্রাসাদ হইতে একটি জগন্নাথ বিগ্রহ দিল্লীতে লইয়া যান। গঙ্গবংশের অধঃপতনের যুগে গুল্‌বর্গা, মালব, জৌনপুর প্রভৃতি রাজ্যের মুসলমান সুল্‌তানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশ

অতঃপর ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে **কপিলেন্দ্র** নামক পুরাতন রাজবংশের জনৈক অমাত্য সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক উড়িষ্যায় সূর্য্যবংশীয়গণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা হইতে সুদূর দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি বাহুবলে বরঙ্গল, কোণ্ডবীডু প্রভৃতি দুর্গ অধিকার করেন। কপিলেন্দ্রের বংশধর **প্রতাপরুদ্র** (আনুমানিক ১৪৯৬-১৫৩৯) চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন। কপিলেন্দ্র

কপিলেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য বংশের পতনের পর **ভোই বংশ** উড়িষ্যায় প্রাধান্য লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের শেষ রাজাকে নিহত করিয়া তেলুগুজাতীয় **মুকুন্দ-হরিচন্দ্র** উড়িষ্যায় অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহার সময়েই আনুমানিক ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুল্‌তান সুলেমান কর্‌রানীর সেনাপতি **কালাপাহাড়** উড়িষ্যায় মুসলমান-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহ

বিজয়নগর

রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সঙ্গম বংশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সুদূর-দক্ষিণ ভারতে একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। কথিত আছে, মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের রাজত্বকালে **সঙ্গম** নামক এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন (আনুমানিক ১৩৩০)। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিজয়নগর। কেহ কেহ বলেন যে, এই নগর হোয়্‌সলবংশীয় রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং সঙ্গমের পুত্রগণ প্রথমতঃ হোয়্‌সল রাজগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। যাহা হউক, অচিরে এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সঙ্গমের পঞ্চপুত্রের মধ্যে **প্রথম হরিহর** এবং **বুক্ক** সমধিক বিখ্যাত। বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার **সায়ন** ও তাঁহার ভ্রাতা **মাধব**, বুক্ক এবং তদীয় পুত্রগণের শাসনকালে বিদ্যমান ছিলেন। বুক্কের পুত্র **দ্বিতায় হরিহর** দক্ষিণে ত্রিচিনোপলী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত সংঘর্ষ

কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের অধিকার লইয়া সঙ্গম বংশের হিন্দু রাজগণের সহিত উত্তরদিক্‌স্থিত বহ্‌মনী রাজ্যের মুসলমান সুল্‌তানদিগের সর্ব্বদাই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র **প্রথম দেবরায়** নামক রাজার সময়ে (আনুমানিক ১৪০৮-২২) সুলতান ফীরূজ শাহ্ হিন্দু রাজধানী বিজয়নগর আক্রমণ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে বন্দীরূপে লইয়া গিয়াছিলেন। দেবরায়কে বাধ্য হইয়া ফীরূজের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া মুসলমানের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে হইল। প্রথম দেবরায়ের পৌত্র **দ্বিতীয় দেবরায়** (আনুমানিক ১৪২২-৪৬) সৈন্যদলে মুসলমান অশ্বারোহী নিযুক্ত করিয়াও বহ্‌মনীবংশীয় আহ্‌মদ শাহ্ এবং আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

শাড়ুব বংশ—১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্গম বংশ বিতাড়িত করিয়া চন্দ্রগিরির শাসনকর্ত্তা **নরসিংহ** বিজয়নগরে শাড়ুব বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। পর্ত্তুগীজ-গণ নরসিংহ শাড়ুবের নামানুসারে বিজয়নগর রাজ্যকে "নরসিংহের রাজ্য"

বলিয়া উল্লেখ করিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের পুত্র তদীয় সেনাপতি তুলুববংশীয় **নরস নায়ক** কর্তৃক নিহত হন। এইরূপে বিজয়নগরে তুলুব বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুলুব বংশ—নরস নায়কের পুত্র **কৃষ্ণদেবরায়** (১৫০৯—২৯) তুলুব বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। শৌর্য্য, সাহসিকতা, উদারতা, সাহিত্যানুরাগ, অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি রাজোচিত গুণ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুল্‌তান ইস্‌মাইল আদিল শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণদেবরায় কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্ত্তী রায়চুর দোয়াব অধিকার করেন। অতঃপর তিনি বিজাপুরের রাজধানী সাময়িকভাবে অধিকার করেন এবং গুলবর্গার দুর্গ ধ্বংস করেন। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার কপিলেন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেবরায় কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেবরায়

আনুমানিক ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র **সদাশিব** বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে শাড়ুববংশীয় মন্ত্রী **রামরায়** সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গোল্‌কুণ্ডা ও বিজাপুরের সুল্‌তানের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া রামরায় আহ্‌মদনগর আক্রমণ করেন। হিন্দু সৈন্যগণ বিজিত মুসলমান রাজ্যটিকে নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করিল এবং দাম্ভিক হিন্দুমন্ত্রী মুসলমান মিত্রগণের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করিলেন। ইহার ফলে বিজাপুর, আহ্‌মদনগর গোল্‌কুণ্ডা এবং বীদরের মুসলমান সুল্‌তানগণ পরস্পরের বিবাদ ভুলিয়া এই পরাক্রান্ত হিন্দু শত্রুকে সমুচিত শিক্ষা দিতে সখ্যবদ্ধ হন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে চারি সুল্‌তানের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত **তলিকোটের** নিকটবর্ত্তী রাক্ষসতঙ্গ্‌ড়িতে রামরায়ের এক ভীষণ **যুদ্ধ** হইল। হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং রামরায় ধৃত ও নিহত হইলেন। বিজয়ী মুসলমানগণ অতঃপর বিজয়নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং শোভাসৌষ্ঠব-মণ্ডিত সমৃদ্ধ হিন্দু রাজাধানীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। তলিকোটের যুদ্ধ

আরবীডু বংশ—আনুমানিক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সদাশিবকে পদচ্যুত করিয়া রামরায়ের ভ্রাতা **তিরুমল** পেনুগোণ্ডতে আরবীডু বংশ প্রতিষ্ঠিত

ফীরূজ শাহের ভ্রাতা **আহ্‌মদ শাহ্‌** (১৪২২-৩৫) ফীরূজকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহ্‌মদ শাহের সময়েও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। তিনি বরঙ্গল অধিকার করেন এবং বীদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি মালবের সুল্‌তান হূশং শাহ্‌কে পরাজিত করেন; কিন্তু গুজরাত আক্রমণ করিয়া তিনি বারবার পরাজিত হন।

আহ্‌মদ শাহ্‌

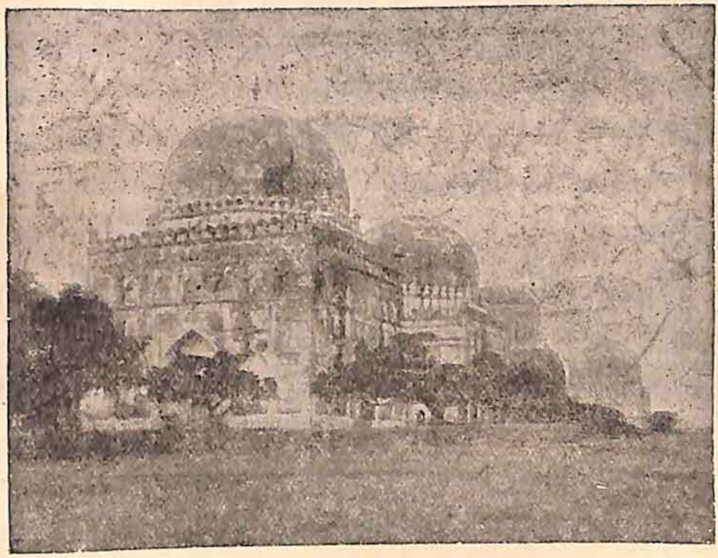
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুল্‌তানগণের অকর্ম্মণ্যতা এবং আভ্যন্তরীণ নানাবিধ গোলযোগের ফলে বহ্‌মনী রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান ওমরাহ্‌গণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন—ভারতীয় ও হাব্‌সীদিগের দল এবং বৈদেশিক (আরব-তুর্কি-পার্শি-মুঘল ওমরাহ্‌গণের সম্মিলিত) দল। ভারতীয় দল প্রধানতঃ সুন্নী সম্প্রদায়ভূক্ত, এবং বৈদেশিক দল প্রধানতঃ শীয়া সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। সুল্‌তানদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া দুইটি দল সর্ব্বদাই ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিত। **তৃতীয় মুহ্‌ম্মদ শাহ্‌** (১৪৬৩-৮২) যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বৈদেশিক দলের নেতা **মহ্‌মূদ গাওয়ান** প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। তিনি তিন জন সুল্‌তানের অধীনে প্রায় ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি উপযুক্ত শাসক এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তদীয় শত্রুপক্ষ মুহম্মদ শাহের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল; তিনিও উহা বিশ্বাস করিয়া উপকারী মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন (১৪৮১)। মহ্‌মূদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর উপযুক্ত শাসকের অভাবে বহ্‌মনীরাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহ্‌মনী সুল্‌তানেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিগণের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন।

মহ্‌মূদ গাওয়ান

বহ্‌মনী রাজ্যের অধঃপতন

ইতিহাসপাঠকের পক্ষে বহ্‌মনী রাজ্যের কাহিনী বিরক্তিকর। অবিরাম যুদ্ধ, নির্ম্মম নরহত্যা, সুল্‌তান ও ওমরাহ্‌গণের বিলাসে আত্মসমর্পণ, রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র—এই সকল বিষয়ই বহ্‌মনী রাজ্যের

ইতিহাসে প্রধান স্থান অধিকার করে। তবে সুল্‌তানগণ শিল্পানুরাগী ছিলেন; তাঁহাদের নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও প্রাসাদসমূহ অদ্যাপি দর্শকের প্রশংসা আকর্ষণ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া-দেশবাসী **নিকিতিন** নামক এক পর্য্যটক বহ্‌মনী রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে বহ্‌মনী রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার কিছু



বীদরে বহ্‌মনী সুল্‌তানগণের সমাধি

পরিচয় পাওয়া যায়। তখন দাক্ষিণাত্য জনবহুল ছিল। দেশে সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। কিন্তু সুল্‌তান ও ওম্‌রাহ্‌গণ বিলাসের জন্য এত অর্থব্যয় করিতেন যে, কৃষকদিগের অভাব পূরণের জন্য সামান্যই অবশিষ্ট থাকিত। ওম্‌রাহে্‌রা রৌপ্যনির্ম্মিত শিবিকায় বহু অনুচর সমভিব্যবহারে যাতায়াত করিতেন। সুল্‌তানগণ মৃগয়াকালে ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০,০০০ পদাতিক সঙ্গে লইতেন। এই বিরাট্ বাহিনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থ আবশ্যক হইত। এই সকল কারণে দেশের জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। **দেশের অবস্থা**

দাক্ষিণাত্যের পঞ্চরাজ্য

১৪৮৪ (অথবা ১৪৮৯) খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশাল বহ্‌মনী রাজ্য পাঁচটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। নিম্নে উহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ইমাদ্‌শাহী বংশ

বেরার—১৪৮৪ (অথবা ১৪৯০) খৃষ্টাব্দে **ফথ্‌ উল্লা ইমাদ্‌-উল্‌ মুল্ক্‌** বেরারে (অর্থাৎ বহ্‌মনী রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে) **ইমাদ্‌শাহী বংশ** স্থাপন করেন। তিনি হিন্দুকুলোদ্ভূত ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি বহ্‌মনী সুল্‌তানদিগের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া উন্নতি-লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় এক শতাব্দী কাল বেরারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদনগরের সুল্‌তান এই রাজ্য অধিকার করেন।

বরীদ্‌শাহী বংশ

বীদর—১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বহ্‌মনী রাজ্যের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী **আমীর বরীদ্‌** হীনবল সুল্‌তানকে পদচ্যুত করিয়া বীদরে (বহ্‌মনী রাজ্যের মধ্যস্থলে) এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নাম **বরীদ্‌শাহী বংশ**। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের বীদরের সুল্‌তান বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং আহ্‌মদনগরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুল্‌তান কর্ত্তৃক বীদর রাজ্য অধিকৃত হয়।

কুতব্‌শাহী বংশ

গোল্‌কুণ্ডা—১৫১৮ খৃষ্টাব্দে **কুলী কুতব্‌ শাহ্‌** নামক বহ্‌মনী সুল্‌তানগণের জনৈক তুর্কিজাতীয় কর্ম্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে গোল্‌কুণ্ডাকে কেন্দ্র করিয়া বহমনী রাজ্যের পূর্ব্বাংশে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার স্থাপিত বংশ **কুতব্‌শাহী বংশ** নামে পরিচিত। এই বংশের **ইব্রাহীম শাহ্‌** (১৫৫০-৮০) বিজাপুর, আহ্‌মদনগর এবং বীদরের সুল্‌তানগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুগণ গুণানুসারে উচ্চপদে নিযুক্ত হইত।

মুঘল সম্রাট্ শাহ্ জহান গোল্কুণ্ডাকে করদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব এই রাজ্য অধিকার করেন। *

আহ্মদনগর—১৪৯০ খৃষ্টাব্দে **মালিক আহ্মদ** নামক বহ্মনী রাজ্যের জনৈক ওম্রাহ্ বিদ্রোহী হইয়া উক্ত রাজ্যের **উত্তর-পশ্চিম** অংশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন; তাঁহার বংশের নাম **নিজাম্শাহী বংশ**। সুল্তান **বুরহান নিজাম শাহ্** (১৫০৮-৫৩) শীয়া ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে বিজয়নগরের হিন্দু রাজার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন। কিন্তু সুল্তান **হুসেন শাহ্** ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গোল্কুণ্ডা এবং বীদরের সুল্তানগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তলিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যদল পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বেরার রাজ্য আহ্মদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুঘল সম্রাট্গণের সহিত নিজামশাহী সুল্তানদিগের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সম্রাট্ আক্বর **চাঁদ-বিবির** চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আহ্মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহ্জানের সময়ে এই রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। †

নিজাম্শাহী বংশ

বিজাপুর—দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ রাজ্যের মধ্যে আয়তনে এবং ক্ষমতায় বিজাপুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে **য়ুসুফ আদিল্শাহ্** কর্ত্তৃক বহ্মনী রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে এই রাজ্য স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ য়ুসুফ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন; কিন্তু জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের সুল্তান দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র ছিলেন। যাহা হউক, বিখ্যাত মন্ত্রী মহ্মূদ গাওয়ানের সাহায্যে তিনি বহ্মনী রাজ্যে উচ্চ পদ লাভ করেন। তাঁহার স্থাপিত রাজবংশ **আদিল্শাহী বংশ** নামে পরিচিত। তিনি শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়ে আলবুকার্কের নেতৃত্বে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া

আদিল্শাহী বংশ

---

* সপ্তদশ অধ্যায়—তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

† সপ্তদশ অধ্যায়—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অধিকার করে (১৫১০)। তিনি জনৈক মরাঠি মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুরা উচ্চ পদ লাভে বঞ্চিত হইত না এবং রাজকার্য্যে মরাঠি ভাষা ব্যবহৃত হইত। তাঁহার বংশধর **প্রথম ইব্রাহীম আদিল্ শাহ্** সুন্নী মত গ্রহণ করেন। কিন্তু **আলি আদিল্ শাহ্** (১৫৫৭-৮০) পুনরায় শীয়া মত প্রবর্ত্তন করেন! তিনি আহ্মদনগর, বীদর ও গোল্কুণ্ডার সুল্তানগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তলিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের মন্ত্রী রামরায়কে পরাজিত করেন। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত বিজাপুর রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। **দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিল্ শাহ্** (১৫৮০-১৬২৬) সুশাসকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ঐতিহাসিক **ফিরিশ্তা** একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্রাহীম আদিল্ শাহ্ আহ্মদনগরের সুল্তানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত সুল্তানের মৃত্যুর পরই বিজাপুরের পতন আরম্ভ হয়। মুঘল সম্রাট্ শাহ্জহানের সময়ে বিজাপুর তাঁহার অধীন মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। অবশেষে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব এই রাজ্য অধিকার করেন। * বিজাপুরের সুল্তানেরা বহু মস্জিদ এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

খান্দেশ (১৩৮২-১৬০১)

১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে মালিক আহ্মদ নামক জনৈক ওম্রাহ্ বহ্মনী রাজ্যের সুল্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৩৮২ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাপ্তী নদীর উপত্যকায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। থাল্নের নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। থাল্নের পরে **অসীরগড়** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এই স্থানের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। **বুর্হান্পুর** খান্দেশের অন্যতম রাজধানী হইয়াছিল। বহ্মনী রাজ্যের সহিত খান্দেশের অধিপতিগণের প্রায়ই যুদ্ধ উপস্থিত হইত। আক্বরের সময়ে (১৬০১) খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের

* সপ্তদশ অধ্যায়—তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজ্যের অধিপতিগণ 'খাঁ' উপাধি গ্রহণ করায় ইহা 'খান্দেশ' (অর্থাৎ, খাঁর দেশ) নামে পরিচিত হইয়াছিল। খান্দেশের রাজবংশ **ফারুকী বংশ** নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

Model Questions

1. Describe the political condition of India on the eve of Babur's invasion.
2. Sketch the history of the Bahmani kingdom.
3. Give an account of the States that arose on the ruins of the Bahmani kingdom.
4. Briefly describe the rise and fall of the kingdom of Vijayanagar with reference to the rule of the most important kings of different dynasties.
5. Write short notes on the history of the following regions during the period of the Delhi Sultanate :—Mewar, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Assam and Orissa.

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার ইতিহাস

তুর্কিগণের বাংলা জয়	... ...	আনুমানিক ১২০২
তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ	... ...	১২৭৯
বাংলার স্বাধীনতা	... ...	আনুমানিক ১৩৩৮-১৫৭৬
ইলিয়াস শাহ্	... ...	,, ১৩৪৩-৫৭
সিকন্দর শাহ্	... ...	,, ১৩৫৭-৯৩
রাজা গণেশ	... ...	,, ১৪১৪
হুসেন শাহ্	... ...	,, ১৪৯৩-১৫১৮
শের শাহ্	... ...	,, ১৫৩৮-৪৫
আকবরের বাংলা জয়	... ...	,, ১৫৭৬

তুর্কিগণের বাংলা বিজয়—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় **ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার**

মুসলমান অধিকারের সূচনা

খল্‌জী নামক এক ভাগ্যন্বেষী তুর্কি সেনানায়ক পালবংশীয় জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া বিহার এবং সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করিয়া পশ্চিম-বাংলা অধিকার করেন। মালদহ জেলায় বর্ত্তমান গৌড়ের নিকটবর্ত্তী **লক্ষ্মণাবতী** নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহার পর পূর্ব্ব-বাংলায় সেনরাজগণ আরও কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বাংলাদেশ তুর্কিদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

দিল্লীর সহিত সম্বন্ধ—বাংলার মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত দিল্লীর সুল্‌তানদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। সেকালের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "দিল্লী হইতে লক্ষ্মণাবতীতে যে সকল শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইতেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই পথের দূরত্ব এবং যাতায়াতের অসুবিধার সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। তাহারা স্বয়ং বিদ্রোহী না হইলে অন্য কেহ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া দেশ অধিকার করিত। সেই দেশের লোক বহুদিন হইতেই বিদ্রোহে অভ্যস্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে অসন্তুষ্ট এবং কুবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়ই শাসনকর্ত্তৃগণকে রাজদ্রোহে প্ররোচিত করিতে সমর্থ হইত।" দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্ব বশতঃই হউক, অথবা বাংলার দুষ্ট লোকের প্ররোচনার ফলেই হউক, বাংলার শাসনকর্ত্তৃগণ যে সুযোগ পাইলেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস

দিল্লীর দাস বংশের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণ—দিল্লীর দাস সুল্‌তানদিগের অধীন শাসনকর্ত্তারা প্রায় ৮৫ বৎসর (আনুমানিক ১২০২-৮৭) বাংলাদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণাবতী জয়ের কয়েক বৎসর পরে **ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন** বোধ হয় তিব্বত জয়ের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় আসামের আহোম রাজার সৈন্যগণ তাঁহার পথরোধ করে। তিনি বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আলীমর্দ্দান খল্জী নামক এক ওম্রাহ্‌কে সুল্‌তান কুতবউদ্দীন বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সুল্‌তানের মৃত্যুর (১২১০) পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বাংলার শাসনকর্ত্তৃগণ নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সুল্‌তান ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-৩৬) বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন। ইল্‌তুৎমিসের সমসাময়িক শাসনকর্ত্তা **ঘিয়াসউদ্দীন ইউজ** উড়িষ্যা, পূর্ব্ব-বাংলা ও মিথিলায় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ নামে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাজনগর (উড়িষ্যা) ও আসামের হিন্দুরাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন

সুল্‌তান ঘিয়াস্‌দ্দীন বল্‌বনের রাজত্বকালে (১২৬৬-৮৭) বাংলার শাসনকর্ত্তা **তুঘ্রিল খাঁ** বিদ্রোহী হন। উপর্য্যুপরি দুইবার বলবনের প্রেরিত সৈন্যদল তুঘ্রিলকে দমন করিতে অকৃতকার্য্য হইল। তখন বল্‌বন স্বয়ং বাংলাদেশে উপস্থিত হইয়া তুঘ্রিলকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। তুঘ্রিলের আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল। অতঃপর বলবন স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বুঘ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তুঘ্রিল খাঁ

বুঘ্‌রা খাঁ প্রায় দশবৎসর কাল বাংলাদেশ শাসন করেন (১২৮২-৯২)। ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে বল্‌বনের মৃত্যু হয়। এই সময় পর্য্যন্ত বুঘ্‌রা খাঁ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতেন; কিন্তু পরে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি দিল্লীর সিংহাসন দাবি না করায় তাঁহার পুত্র কৈকুবাদ সুল্‌তান হইয়াছিলেন। বুঘ্‌রা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলারাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—পশ্চিম-বাংলা (লক্ষ্মণাবতী), পূর্ব্ব-বাংলা (সোনারগাঁ) ও দক্ষিণ-বাংলা (সপ্তগ্রাম)। বুঘ্‌রা খাঁ

বুঘ্‌রা খাঁর বংশধরগণের মধ্যে কলহের সুযোগ পাইয়া দিল্লীর সুল্‌তান ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক বাংলায় আগমন করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় এই প্রদেশে পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন বাংলা—মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুকের রাজত্বকালে যখন দিল্লী সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, তখন পূর্ব্ব-বাংলার শাসনকর্ত্তা **ফখ্রুউদ্দীন মুবারক শাহ্** (আনুমানিক ১৩৩৬-৫২) স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন্ বতুতা চট্টগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তখন বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত সুলভ ছিল।

ফখ্রুউদ্দীন

ফখ্রুউদ্দীনকে পরাজিত করিয়া **শম্স্উদ্দীন ইলিয়াস শাহ্** (আনুমানিক ১৩৪২-৫৭) সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুল্তান হন। কথিত আছে যে, তিনি বিহার অধিকার করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য দিল্লীশ্বর ফীরুজ শাহ্ বাংলাদেশে আগমন করেন (১৩৫৩)। কিন্তু ইলিয়াস শাহ্ **একডালা** দুর্গে * আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ফীরুজ শাহ্ ব্যর্থমনোরথ হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার পর বাংলার সুল্তানগণ দুই শত বৎসরের অধিকাল (আক্বরের রাজত্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত) দিল্লীর অধিপতিগণের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

শম্স্উদ্দীন ইলিয়াস শাহ্

ইলিয়াস শাহের পুত্র **সিকন্দর শাহ্** (আনুমানিক ১৩৫৭-৯৩) পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ **আদিনা মস্জিদ** নির্ম্মিত হয়। এরূপ বিশাল মস্জিদ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। সিকন্দর শাহের পুত্র **ঘিয়াস্ উদ্দীন** (আনুমানিক ১৩৯৩-১৭১০) ধর্ম্মভীরু ও সুবিচারক ছিলেন।

সিকন্দর শাহ্

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-বাংলার অন্তর্গত ভাতুরিয়ার জমিদার **গণেশ** (১৪১৪) সুল্তান ইলিয়াস শাহের একজন বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করেন। গণেশ ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ ছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। মুসলমান সাধু নূর কুতব্ উল্ আলমের অনুরোধে জৌনপুরের শর্কী বংশীয় ইব্রাহীম শাহ্ গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ সম্ভবতঃ

রাজা গণেশ

* এই দুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, একডালা ঢাকার নিকট অবস্থিত ছিল; আবার কাহারও মতে ইহা মালদহ জেলার অন্তর্গত।

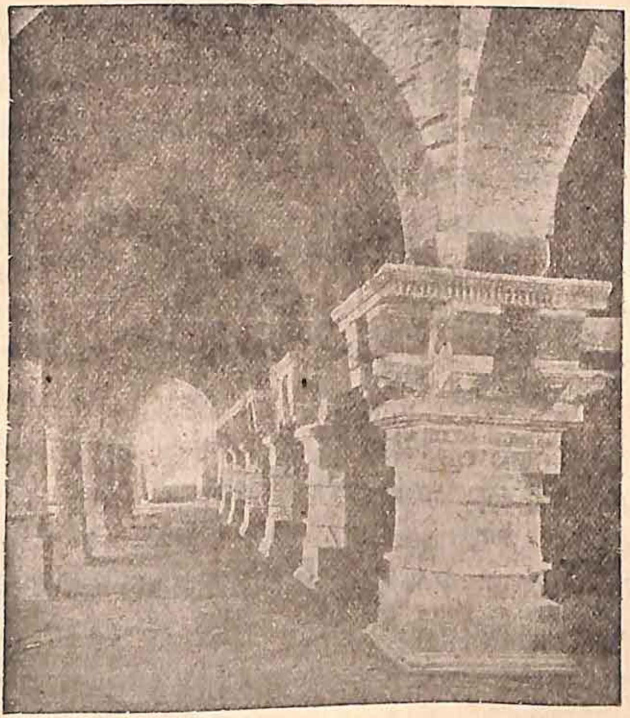
হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করিয়া মুসলমানগণের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **যদু** বা জয়মল্ল রাজ্য অধিকার করেন। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া **জলাল্‌উদ্দীন** নামে পরিচিত হন। তাঁহার সমসাময়িক **দনুজমর্দ্দন** (১৪১৭-১৮) নামক একজন হিন্দু রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ব-বাংলায় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, গণেশ ও দনুজমর্দ্দন একই ব্যক্তি।

মুসলমান-প্রাধান্য পুনরুদ্ধার—পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় পুনরায় মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় **শ্রীহট্ট** মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহের পরবর্ত্তী রাজগণ হাব্‌সী (আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার অধিবাসী) ক্রীতদাসগণকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ফলে, মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতগণের প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ইলিয়াস শাহের বংশের শেষ সুল্‌তান একজন হাব্‌সী ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হন। এই ক্রীতদাসকে নিহত করিয়া **সৈফ্‌উদ্দীন ফীরূজ শাহ্‌** বাংলার সুল্‌তান হন (আনুমানিক ১৪৮৬)। ইহাতেও ষড়যন্ত্র বন্ধ হইল না। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যে-কেহ রাজাকে হত্যা করিত, সেই-ই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী রূপে সম্মানিত হইত। **অরাজকতা**

অরাজকতার অবসান করিবার জন্য রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ আনুমানিক ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে **আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌** নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করেন। হুসেন শাহ্‌ সম্ভবতঃ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি হাব্‌সী ক্রীতদাসগণের ক্ষমতা নষ্ট করেন। তাঁহার সময়ে গোপীনাথ বসু, পুরন্দর, রূপ ও সনাতন প্রভৃতি হিন্দু কর্ম্মচারিগণ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হুসেন শাহের মুদ্রায় লিখিত আছে যে, তিনি কামরূপ (আসাম), কামতা (কোচবিহার ও রংপুর) **হুসেন শাহ্‌**

এবং উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিহারের কিয়দংশ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের **শ্রীচৈতন্য** তাঁহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে গৌড়ের ছোট সোনা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়।



আদীনা মস্‌জিদের বারান্দা (সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত).

হুসেন শাহের সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী **বিজয়গুপ্ত** বাংলা পদ্যে **পদ্মাপুরাণ** রচনা করেন। এই গ্রন্থ অদ্যাপি সাদরে পঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী **শ্রীকরণ নন্দী** নামক আর এক কবি বাংলা পদ্যে মহাভারতের অনুবাদ করেন। বর্দ্ধমানের অধিবাসী **মালাধর বসু** একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র **নসরৎ শাহ্** ত্রিহুত অধিকার করেন এবং বাবুরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ এবং কদম রসুল মসজিদ নির্মিত হয়। স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে এই দুইটি মসজিদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। নসরৎ শাহ্

শেরশাহ্—আনুমানিক ১৫৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে সের খাঁ নামক বিহারের জনৈক সুর বংশীয় পাঠান ওম্‌রাহ্ হুসেন শাহের বংশধর তৎকালীন সুল্‌তানকে বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া দিল্লীর মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া 'শের শাহ্' নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যে শাসনকর্ত্তার উপর বাংলার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি বিদ্রোহী হন। শের শাহ্ বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দমন করিলেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশের শাসনকর্ত্তার পদ উঠাইয়া দিয়া সমগ্র প্রদেশটি ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগের শাসনভার একজন আমীরের উপরে প্রদান করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমিয়া গেল। ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য-গঠনই শের শাহের প্রধান লক্ষ্য ছিল; তাই তিনি বাংলার উন্নতির প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। শের শাহের সুশাসন

আফ্‌গান রাজত্ব—শের শাহের মৃত্যুর (১৫৪৫) পর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাংলা দেশ আফ্‌গান আমীরগণের শাসনাধীন ছিল। **সুর বংশ** কিছুদিন রাজত্ব করিবার পর **কররানী** বংশ বাংলার সিংহাসন অধিকার করে। মুঘল সম্রাট্ আকবরের সময় **সুলেমান খাঁ কররানী** তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি **কালাপাহাড়** উড়িষ্যা ও আসাম আক্রমণ করেন এবং বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **দাউদ খাঁ** আকবরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতে থাকেন। সুলেমান খাঁ

আক্‌বর তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনীম খাঁ ও রাজা তোড়লমলকে প্রেরণ করেন এবং একবার স্বয়ং সসৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হন। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন এবং আক্‌বর বাংলা দেশ অধিকার করেন।

মুঘল অধিকার

বার-ভুঁইয়া—দাউদ খাঁ বাংলার শেষ স্বাধীন সুল্‌তান; কিন্তু তাঁহার পতনের পরেও ভাওয়ালের **ঈশা খাঁ**, বিক্রমপুরের **কেদার রায় ও চাঁদরায়**, বাক্‌লার (বাখরগঞ্জ জেলার) **রামচন্দ্র রায়**, যশোহরের **প্রতাপাদিত্য** প্রভৃতি পরাক্রান্ত জমিদারগণ সময় সময় মুঘল শাসনের বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। এইরূপ কতিপয় বিখ্যাত জমিদার ইতিহাসে 'বার-ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। ইহারা বারবার মুঘল সেনাপতিগণকে বিতাড়িত করিয়া বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই বাংলার মুঘল শাসন বদ্ধমূল হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের কাহিনী বাংলার ইতিহাসের এক পরম গৌরবময় অধ্যায়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নিমাই, গৌরাঙ্গ ও চৈতন্য নামে পরিচিত। তিনি অল্প বয়সে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে তিনি বাংলায় ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। উড়িষ্যাপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

চৈতন্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রভাবে উহা সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। প্রেম ও ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়—ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম। এই ধর্ম্মে বর্ণভেদ তেমন কঠোর ছিল না; সকল জাতিই এই ধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী ছিল। এমন কি, একজন মুসলমান এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাম্যবাদ ও মিলনমন্ত্র বাংলার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষিদ্‌বর্গের জীবনী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত,' জয়ানন্দ-রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাস-রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' সর্ব্বাগ্রে উল্লেখনীয়। কাব্য, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই সকল গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব কবিগণের রচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য

Model Questions

1. Give an account of the history of Bengal during the period of the Delhi Sultanate.
2. Write notes on :—Tughril Khan, Shamsuddin Ilyas Shah, Sikandar Shah, Raja Ganes, Alauddih Husen Shah, Sri Chaitanya, the Bhuiyans.

পঞ্চদশ অধ্যায়

আকবরের পূর্ব্বকালীন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ—ধর্ম্ম

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য—ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সভ্যতা উদার ও প্রাণবান্ ছিল। শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলিকে নিজ সমাজের অঙ্গীভূত করিতে হিন্দু তখন দ্বিধাবোধ করে নাই। কালক্রমে হিন্দুসমাজের এই উদারতা হ্রাস পাইয়াছিল; জাতিভেদ ও সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। মুসলমানগণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদেশিক জাতিসমূহের ন্যায় হিন্দুসমাজে গৃহীত হয় নাই। এই পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ ছিল। মুসলমানেরা একেশ্বর-বাদী এবং প্রতিমাপূজার বিরোধী; তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা সাম্যবাদের মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য

উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত তাহাদের মতবাদের বিভিন্নতা এত বেশী যে, তাহারা অধিকপরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইতে পারে নাই।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার—মুসলমানগণের সিন্ধুবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার আরম্ভ হয়। মুসলমান রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি হইল। জিজিয়া প্রভৃতি অতিরিক্ত কর হইতে মুক্তিলাভের জন্য এবং উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তির আশায় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হিন্দু সমাজের অনুদারতা এবং উচ্চ বর্ণের নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও সম্ভবতঃ বহু নীচজাতীয় হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় ছয়শত বর্ষব্যাপী মুসলমান শাসনের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে দলে দলে হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতীয় মুসলমানগণের অধিকাংশই এই সকল স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুর বংশধর।

হিন্দুর ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ

হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা—মুসলমান যুগে বহু হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বটে ; কিন্তু পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে মুসলমানগণ স্বধর্ম্ম প্রচারে যতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ভারতবর্ষে তেমন হয় নাই। কেবলমাত্র স্পেন ব্যতীত মুসলমানদিগের বিজিত অন্যান্য দেশে তথাকার জনসমাজের অধিকাংশ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। এই ঘটনা হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিচায়ক। এই শক্তির ফলেই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমাজের নেতৃগণ কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম ও আচারের শুচিতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুস্‌লমান যুগে রচিত স্মৃতি-গ্রন্থসমূহে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ আছে। মধ্যে যুগের স্মার্ত্তগণের মধ্যে **মাধবাচার্য্য** ও **রঘুনন্দন** বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের রচিত বিধানাবলীতে উদারতার অভাব আছে সত্য ; কিন্তু ঐরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধন রক্ষা করা যাইত কি-না সন্দেহ।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের শক্তি

স্মার্ত্তগণ

হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টা—চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মগত বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ পরিষ্কৃত হইতেছিল। যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহারা হিন্দুসমাজে প্রচলিত বহু আচার-ব্যবহার পালন করিত। মুসলমান রাজা ও ওম্‌রাহ্‌গণ সময় সময় হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করিতেন। আলাউদ্দীন খল্‌জী গুজরাতের রাজমহিষী কমলা দেবীকে এবং আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খাঁ কমলা দেবীর কন্যা দেবলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তুঘ্‌লুকবংশীয় সুলতান ফীরূজ শাহের মাতা রাজপুত-কন্যা ছিলেন। বহমনীবংশীয় সুল্‌তান ফীরূজ শাহ বিজয়নগরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। বিজাপুর রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা য়ুসুফ আদিল শাহ্‌ জনৈক মরাঠি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিবাহের ফলে মুসলমান সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তার লাভ করিত। তুঘ্‌লুকবংশীয় ফীরূজ শাহ্‌ এবং সিকন্দর লোদী ধর্ম্মসম্বন্ধে অনুদার ছিলেন; কিন্তু কাশ্মীরের সুল্‌তান জয়নুল আবিদীন উদার মতাবলম্বী ছিলেন। বহুদিন একত্র বাস করিয়া হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল যে, উভয়ের মতামতের আংশিক সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যম্ভাবী ছিল। হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ

ধর্ম্মসংস্কারকগণ—চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্ম্ম-প্রচারক হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মসংস্কারকগণ ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্তি লাভ ও নৈতিক জীবন যাপনই মুক্তি পাইবার উপায়; জটিল পূজাপদ্ধতি এবং জাতিভেদ প্রভৃতি কৃত্রিম ব্যবস্থার সহিত যথার্থ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—ইহাই ঐ ধর্ম্মপ্রচারক-গণের বাণীর সার মর্ম্ম। এই উদার মত সেকালে উচ্চ-নীচ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং হিন্দুদের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। ধর্ম্ম বিষয়ক উদারত

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে (মতান্তরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে) মহারাষ্ট্র দেশে শূদ্রবংশে **নামদেব** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম্মে যোগ না দিয়া একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করাই মানুষের পক্ষে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

নামদেব

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত প্রচারক **রামানন্দ** বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্কার করেন। তিনি উত্তর ভারতের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দি ভাষায় স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না; সকল জাতি হইতেই শিষ্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য কবীর মুসলমান ছিলেন। ঈশ্বরের একত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব রামানন্দের বাণীর সার মর্ম্ম।

রামানন্দ

দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ **বল্লভাচার্য্য** বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান সংস্কারক। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের আরাধনা করাই মুক্তির উপায়—ইহাই তাঁহার ধর্ম্মমত।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক **শ্রীচৈতন্য**। তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মমতের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।*

মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণ **একনাথ** জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয় লোকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন।

এই সম্পর্কে বিষ্ণুভক্ত **মীরাবাঈ**র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি মেবাড়ের রাণা কুম্ভার পত্নী ছিলেন বলিয়া যে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। মীরাবাঈ রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রবধূ ছিলেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

মীরাবাঈ

কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান; বস্ত্রবয়ন তাঁহার ব্যবসায় ছিল। কবীর সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-জ্ঞান ছিল না। তিনি আপনাকে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কবীর হিন্দি ভাষায় সরল কবিতা রচনা করিয়া গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত।

কবীর

---

* ১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিখ ধর্মের প্রবর্ত্তক **নানক** ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর জিলার অন্তর্গত তালবন্দী নামক গ্রামে ক্ষত্রী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ইস্‌লাম ধর্মের মূল তথ্য অবগত হইবার জন্য তিনি মক্কা ও বগ্‌দাদে গিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ত্তারপুর নামক স্থানে বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে নানক পরলোক গমন করেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্মের মূল সত্যগুলি সম্মিলিত করিয়া তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ **শিখ** নামে পরিচিত। গুরু নানক ও শিখ সম্প্রদায়

'নাম' (ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন), 'দান' (সেবা) এবং স্নান'—ইহাই শিখ ধর্মের সার মর্ম্ম। শিখগণ পরে এক বিশেষ ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল।

মুসলমান সাধুগণ—মধ্য যুগের সাধনা যে কেবলমাত্র হিন্দুদিগের চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা নহে; মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু ধর্মনিষ্ঠ মহাপ্রাণ সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এই যুগেই **সূফী** মতের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হয়। আজমেরের বিখ্যাত সূফী ফকীর **খাজা মুইন্‌উদ্দীন চিস্‌তী** হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত ফকীর **নিজাম্‌উদ্দীন আউলিয়া** দিল্লীতে বাস করিতেন। আলাউদ্দীন খল্‌জী এবং মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। বাংলা দেশে পাণ্ডুয়ার **নূর কুতব্ উল আমল** এবং শ্রীহট্টের **শাহ্ জলাল** বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কবীরের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সংস্কৃতি

সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি—হিন্দু জাতির স্বাধীনতা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; কারণ সেকালে রাজানুগ্রহ ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধা হইত না। তথাপি মুসলমান যুগে

সংস্কৃত সাহিত্য মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত-চর্চ্চা করিতেন। দেশের সর্ব্বত্র টোল ছিল। কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সংস্কৃত-চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী **সায়নাচার্য্য** বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। **হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন** প্রভৃতি গ্রন্থকার স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত-চর্চ্চা

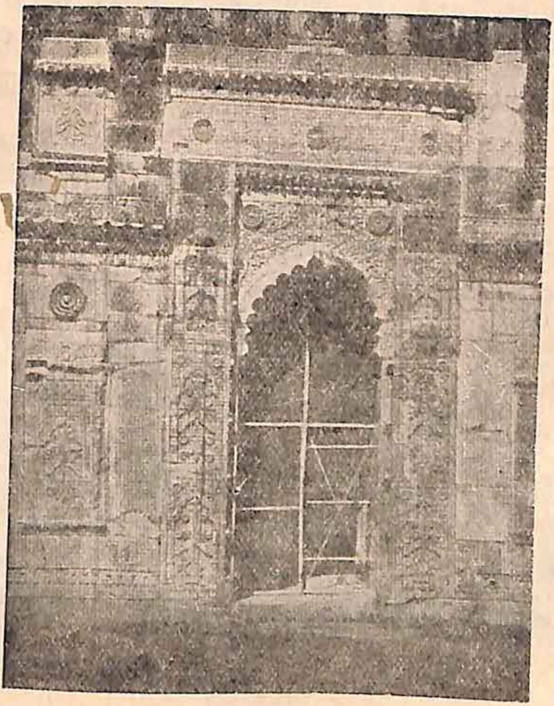
প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি—মুসলমান যুগে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্ম্ম প্রচারকগণ দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে স্ব স্ব মত সহজে বুঝাইবার জন্য প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষাদান ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বিশেষ উন্নত হয়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুচরগণের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিবার জন্য বাংলা ভাষায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের সুমধুর পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলা ভাষার অমূল্য রত্ন। হুসেন শাহ্, নস্‌রৎ শাহ্ প্রভৃতি মুসলমান সুল্‌তানগণের সময়ে বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাও ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দিভাষার উন্নতি করেন। একনাথের চেষ্টায় মরাঠি এবং নানকের চেষ্টায় পঞ্জাবি (গুরুমুখি) ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

বাংলা সাহিত্য

উর্দ্দু ভাষা—তৎকালে মুসলমানগণ তুর্কি ও ফার্‌সি ভাষা এবং হিন্দুগণ হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ব্যবহার করিত। ইহাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তার বিশেষ অসুবিধা হইত। কালক্রমে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হয়। উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণ হিন্দি ব্যাকরণের ন্যায়; কিন্তু ইহার শব্দগুলি আর্‌বি, ফার্‌সি ও হিন্দি ভাষা হইতে গৃহীত। এইজন্য এই নূতন ভাষা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বোধগম্য হইল। তুর্কি ভাষায় 'উর্দ্দু' শব্দের অর্থ শিবির। এই ভাষা প্রথমতঃ শিবিরের হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ভুক্ত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। উর্দ্দু ভাষায় বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত মিলন

ফারসি সাহিতের উন্নতি—মুসলমান রাজগণ ফারসি সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ভারতীয় ফারসি কবিগণের মধ্যে **আমীর খুসরু** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ঘিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুকের সময় পর্য্যন্ত দিল্লীর সুল্‌তানগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। **হসন-ই-দিল্‌বী** নামক আর একজন কবিও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাব্য-সাহিত্য

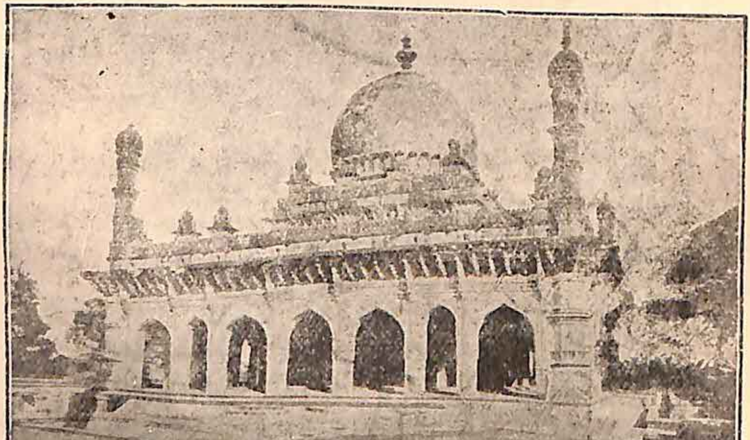


ছোট সোনা মস্‌জিদের প্রবেশদ্বার—গৌড়

ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় মুসলমানগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সুল্‌তান নাসিরুউদ্দীন মহমূদের রাজত্বকালে **মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন** 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ফীরুজ শাহের সময় **জিয়াউদ্দীন** ঐতিহাসিক সাহিত্য

বরনী এবং **শমস্-ই-সিরাজ আফিফ** দুইখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানা গ্রন্থেরই নাম 'তারীখ-ই-ফীরূজশাহী'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে **ইয়াহিয়া বিন্ আহম্মদ** নামক এক ঐতিহাসিক 'তারীখ-ই-মুবারক্শাহী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনার জন্য এই সকল গ্রন্থই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

শিল্পের উন্নতি—মুসলমান রাজগণের মধ্যে অনেকেই শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র বহু সুন্দর মস্‌জিদ্, সমাধি-মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সময় সময় হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই উপাদান দ্বারা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইত, আবার কোন কোন স্থলে মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদিগকে মস্‌জিদে পরিণত করা হইত। হিন্দু স্থাপত্য-রীতির সহিত মুসলমান ভাবধারার



আদিল শাহের কবর—বিজাপুর

সংমিশ্রণে এক বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতির উৎপত্তি হইল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রীতির প্রচলন হইয়াছিল। দিল্লী, জৌনপুর, বাংলা, দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাত বিভিন্ন রীতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। দিল্লীর কুতব্ মিনার ও মস্‌জিদসমূহ বিখ্যাত। পাণ্ডুয়ার আদীনা মস্‌জিদ এবং গৌড়ের

সোনা মস্‌জিদ, কদম-রসুল এবং দাখিল দরওয়াজা বাংলার স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জৌনপুরের অতালা মস্‌জিদ, গুজরাতের তিন দরওয়াজা ও জাম-ই মস্‌জিদ (আহ্‌মদাবাদ), মণ্ডুর জাম্‌-ই মস্‌জিদ ও হিন্দোলা মহল নামক দরবার গৃহ এবং বহ্‌মনী ও বিজাপুর রাজ্যের মস্‌জিদ ও সমাধি-মন্দিরসমূহ এখনও দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। মুসলিম স্থাপত্য

কেবল যে মুসল্‌মান রাজগণই স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাহা নহে। বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজপুতানা ও গুজরাতে কয়েকটি সুন্দর জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। চিতোরের রাণা কুম্ভা এক বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মধ্য যুগে ভারতবর্ষে শিল্পকলার যথেষ্ট সমাদর ছিল, সন্দেহ নাই। হিন্দু স্থাপত্য

Model Questions

1. What do you know about the factors that helped or prevented the social union of the Hindus and Mahomedans ?

2. Give an account of the medieval religious teachers (both Hindu and Musalman) and their activities.

3. Briefly describe the art, architecture and literature of the period of the Delhi Sultanate.

4. Write notes on :—Ramananda, Kabir, Guru, Nanak, and Mirabai.

ষোড়শ অধ্যায়

*আফ্‌গান-মুঘল সংঘর্ষ (১৫২৬-৩০)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	...	...	১৫২৬
খানুয়ার যুদ্ধ	...	...	১৫২৭
শের শাহের রাজত্বকাল	...	...	১৫৩৯-৪৫
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	...	...	১৫৫৬

প্রথম পরিচ্ছেদ—বাবুর (১৫২৬-৩০)

প্রথম জীবন—বাবুরের প্রকৃত নাম জহির্‌উদ্দীন মুহম্মদ; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি বাবুর (অর্থাৎ, সিংহ বা ব্যাঘ্র) নামেই পরিচিত। তিনি এশিয়ার দুইজন প্রসিদ্ধ বীরের বংশধর। তাঁহার পিতা তৈমূরলঙ্গের বংশে এবং মাতা চিঙ্গীস খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তিনি মুঘলরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি চঘ্‌তাই তুর্কিজাতীয় এবং তৈমূরবংশীয় ছিলেন।

বাবুরের বাল্যজীবনের কাহিনী উপকথার ন্যায় রোমাঞ্চকর। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। এগার বৎসর বয়সে তিনি মধ্য-এশিয়ায় তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফর্‌ঘনা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁহার বীরত্ব ও সাহস অসাধারণ ছিল। তিনি তিনবার সমরকন্দ অধিকার করেন; কিন্তু কোন বারই তাঁহার অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ফর্‌ঘনা রাজ্যও তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। বাবুর ইহাতেও বিচলিত না হইয়া অবস্থার উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হন। বহু চেষ্টার পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কাবুল অধিকার করেন। অবশেষে বাবুর পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ, ভারতবর্ষে) রাজ্যবিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি চারিবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

কাবুল অধিকার

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ—এই সময়ে ইব্রাহীম লোদীর কুশাসনের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগ চলিতেছিল। অবশেষে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা **দৌলত খাঁ লোদী** এবং

আলম খাঁ নামক সুল্তান ইব্রাহীম লোদীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাবুরকে ভারত আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বাবুর ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে লাহোর ও দীপালপুর অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি পুনরায় পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন এবং দৌলত খাঁ লোদীকে পরাজিত করিয়া আলম খাঁর সমভিব্যাহারে সুল্তান ইব্রাহীম লোদীর সম্মুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। বাবুরের সৈন্যসংখ্যা লোদী-সৈন্য অপেক্ষা অনেক কম ছিল; কিন্তু অসামান্য সামরিক প্রতিভাবলে ও কামানের সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার পদানত হইল।

লাহোর অধিকার

দিল্লী অধিকার

খানুয়ার যুদ্ধ—বাবুর যখন দিল্লী ও আগ্রায় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন মেবাড়ের পরাক্রান্ত রাণা মহাবীর **সংগ্রামসিংহ**

বংশলতা ঃ—

(ক) আফ্গান-সূর বংশ

- হসন খাঁ
  - (১) শের শাহ্ (১৫৩৯-৪৫)
    - (২) ইস্লাম শাহ্ (১৫৪৫-৫৪)
      - (৩) ফীরূজ শাহ্ (১৫৫৪)
- (ভ্রাতা)
  - (৫) ইব্রাহীম শাহ্ (১৫৫৩-৫৪)
- (ভ্রাতা)
  - (৬) সিকন্দর শাহ্ (১৫৫৪-৫৫)
  - নিজাম খাঁ
    - (৪) মুহম্মদ আদিল শাহ্ (১৫৫৪-৫৫

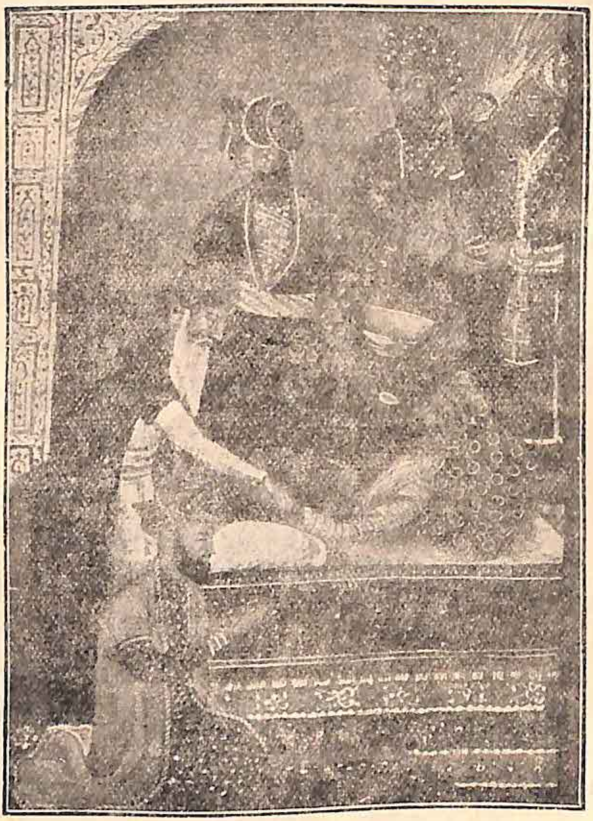
(খ) মুঘল—তৈমুরবংশ

- (১) বাবুর (১৫২৬-৩০)
  - (২) হুমায়ূন (১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)
    - (৩) আক্বর (১৫৫৬-১৬০৫)
  - কাম্রান
  - হিন্দাল
  - আস্কারী

তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বহু রাজপুত রাজা এবং লোদী বংশের কয়েকজন অনুচর তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। বাবুরকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন করাই বোধ হয় সংগ্রামসিংহের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না; ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে বাবুর তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

সংগ্রাম সিংহের পরাজয়

রাজ্যবিস্তার—অতঃপর বাবুর মেওয়াট এবং মধ্য ভারতের অন্তর্গত



হুমায়ুনের রোগশয্যাপার্শ্বে বাবুর [সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে]

চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। তিনি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পাটনার নিকটে **গোগ্রার যুদ্ধে** বিহারের আফ্‌গান আমীরদিগকে পরাজিত করিলেন (১৫২৯। এইরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে তাঁহার প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে বৃহত্তর রাজ্য গঠন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু—১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবুরের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাবুর তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট স্বীয় প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। ইহার পর হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পরে বাবুর স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

চরিত্র—বাবুরের চরিত্রে বিবিধ গুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তিনি যে কেবল সাহসী, ধৈর্য্যশীল, উদ্যোগী এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন তাহা নহে; তিনি সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক এবং শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি তুর্কি ভাষায় **আত্মচরিত** রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট ও এবং মূল্যবান্। ইহাতে তিনি সরলভাবে নিজের দোষগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ফার্সি, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাবুর ফার্সি ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদাশয়, উদার এবং স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। সারাজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহ বিসর্জ্জন দেন নাই।

সাহিত্যানুরাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হুমায়ুন (১৫০৩-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)

চরিত্র—১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সাহসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতার অভাব ছিল। তখন দিল্লীর বাদ্‌শাহের চারিদিকে শত্রু; তাঁহার আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত; বিহারে আফ্‌গানদিগের নায়ক শের খাঁ ক্ষমতা বিস্তারের জন্য উৎসুক; পশ্চিমে গুজরাতের পরাক্রান্ত সুল্‌তান বহাদুর শাহ্‌, মালব ও রাজপুতানায় প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর। এই সকল প্রবল শত্রু দমন করিয়া মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি হুমায়ুনের ছিল না।

দৃঢ়তার অভাব

তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বহু রাজপুত রাজা এবং লোদী বংশের কয়েকজন অনুচর তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। বাবুরকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন করাই বোধ হয় সংগ্রামসিংহের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না; ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে বাবুর তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

সংগ্রাম সিংহের পরাজয়

রাজ্যবিস্তার—অতঃপর বাবুর মেওয়াট এবং মধ্য ভারতের অন্তর্গত



হুমায়ূনের রোগশয্যাপার্শ্বে বাবুর [সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে]

চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। তিনি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পাটনার নিকটে **গোগ্রার যুদ্ধে** বিহারের আফ্‌গান আমীরদিগকে পরাজিত করিলেন (১৫২৯)। এইরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে তাঁহার প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে বৃহত্তর রাজ্য গঠন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু—১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবুরের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাবুর তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট স্বীয় প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। ইহার পর হুমায়ূন আরোগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পরে বাবুর স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

চরিত্র—বাবুরের চরিত্রে বিবিধ গুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তিনি যে কেবল সাহসী, ধৈর্য্যশীল, উদ্যোগী এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন তাহা নহে; তিনি সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক এবং শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি তুর্কি ভাষায় **আত্মচরিত** রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট ও এবং মূল্যবান্। ইহাতে তিনি সরলভাবে নিজের দোষগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ফার্সি, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাবুর ফার্সি ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদাশয়, উদার এবং স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। সারাজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহ বিসর্জ্জন দেন নাই। **সাহিত্যানুরাগ**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হুমায়ূন (১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)

চরিত্র—১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সাহসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতার অভাব ছিল। তখন দিল্লীর বাদশাহের চারিদিকে শত্রু; তাঁহার আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত; বিহারে আফ্‌গানদিগের নায়ক শের খাঁ ক্ষমতা বিস্তারের জন্য উৎসুক; পশ্চিমে গুজরাতের পরাক্রান্ত সুল্‌তান বহাদুর শাহ্‌ মালব ও রাজপুতানায় প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর। এই সকল প্রবল শত্রু দমন করিয়া মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি হুমায়ূনের ছিল না। **দৃঢ়তার অভাব**

রাজ্যবিভাগ—হুমায়ূন রাজ্যলাভ করিয়াই তাঁহার ভ্রাতা কাম্‌রানকে কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ দান করিলেন; হিন্দাল এবং আস্কারী নামক তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাও স্বতন্ত্র ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্য খণ্ডিত করিয়া হুমায়ূন নিজের শক্তি হ্রাস করিলেন। কাম্‌রানের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতেই হুমায়ূনকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইত; কিন্তু কাম্‌রান তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক না থাকায় এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা জন্মিয়াছিল।

শক্তি হ্রাস

বহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধ—গুজরাতের স্বাধীন সুল্‌তান বহাদুর শাহ্ পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি চিতোর ও মালব অধিকার করিয়া আপনার রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। বহাদুর মুঘল শক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া হুমায়ূনের কয়েকজন শত্রুকে আশ্রয় দান করেন। হুমায়ূন তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মালব অধিকার করেন এবং গুজরাতে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি দুর্গ জয় করেন (১৫৩৫)। ইতিমধ্যে আগ্রা ও বিহারে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাই হুমায়ূন গুজরাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন (১৫৩৬)। মালব ও গুজরাত তাঁহার হস্তচ্যুত হইল।

মালব ও গুজরাত

শের খাঁর সহিত যুদ্ধ—শের খাঁ নামক এক আফ্‌গান সর্দ্দার অসাধারণ প্রতিভাবলে বিহার অধিকার করিয়া ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। হুমায়ূন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হইয়া চুণার দুর্গ অধিকার করেন (১৫৩৭)। ইত্যবসরে শের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়া বাংলায় প্রাধান্য স্থাপন করেন। হুমায়ূন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া গৌড় অধিকার করেন (১৫৩৮)। শের খাঁ গৌড়ে তাঁহাকে বাধা না দিয়া তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশ (বারাণসী ও জৌনপুর) আক্রমণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ূন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু শের খাঁ পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্ত্তী **চৌসার যুদ্ধে** তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (১৫৩৯)। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ূন পুনরায় **কনৌজের** (বা **বিল্‌গ্রামের**) শের কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

হুমায়ূনের পরাজয়

হুমায়ুনের পলায়ন ও প্রত্যাবর্ত্তন—হুমায়ুনের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাজপুতানার রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হন। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া হুমায়ুন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন (১৫৪৪)। পারস্যের



হুমায়ুন (সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

রাজার সাহায্যে তিনি কিছুকাল পরে কান্দাহার অধিকার করেন এবং কামরানকে বিতাড়িত করিয়া কাবুলে অধিকার স্থাপন করেন। এদিকে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করিতে আরম্ভ করেন। সুযোগ পাইয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সূর বংশ (১৫৩৯-৫৫)

শের শাহ্ (১৫৩৯-৪৫)

বাল্যজীবন—শের শাহের প্রকৃত নাম ফরীদ খাঁ সূর। স্বহস্তে একটি ব্যঘ্র বধ করিয়া তিনি 'শের' (ব্যাঘ্র) উপাধি প্রাপ্ত হন। আনুমানিক ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সূর-বংশীয় আফ্গান (বা পাঠান) ছিলেন। তাঁহার পিতা হসন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার ছিলেন। বিমাতার প্রভাবে শের খাঁ পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হন। বাল্যকালে তিনি কিছুদিন জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং আরবি ও ফারসি সাহিত্যে বিশেষ অধিকার লাভ করেন। কথিত আছে যে, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফারসি কাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

ক্রমোন্নতি—কিছুদিন পর হসন পুত্রের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় জায়গীরের একটি অংশের শাসনভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন; শের খাঁ বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় বিমাতার প্ররোচনায় শেরের পিতা তাঁহাকে জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিলেন। শের খাঁ আগ্রায় গিয়া জনৈক ওমরাহের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং হসনের মৃত্যুর পর পৈতৃক জায়গীর প্রাপ্ত হন। অতঃপর শের খাঁ বিহারের স্বাধীন সুল্তান বিহার খাঁ বা মুহম্মদ শাহের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাবালক পুত্র জলাল খাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিহার খাঁই তাঁহাকে ব্যাঘ্র-হত্যার পুরস্কার স্বরূপ 'শের খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে শত্রুদের ষড়্যন্ত্রে শের খাঁ পৈতৃক জায়গীর হইতে বঞ্চিত হন। অতঃপর তিনি কারা প্রদেশের মুঘল শাসনকর্ত্তার সাহায্যে জায়গীর পুনরুদ্ধার করেন এবং বাবুরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

বিহারে আধিপত্য স্থাপন—অল্পদিনের মধ্যেই শের খাঁ বাবুরের বিরাগভাজন হন এবং বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বিহার খাঁর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। বিহার খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জলাল খাঁ বিহারে সুল্তান হন; শের খাঁ তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

বিহারের ওম্‌রাহ্‌গণ শের খাঁর অসাধারণ প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় নাবালক সুল্‌তান জলাল খাঁ বাংলার সুল্‌তান ঘিয়াসুউদ্দীন মহ্‌মুদ শাহের সহিত সম্মিলিত হইয়া শের খাঁকে আক্রমণ করেন। শের খাঁ **সুরজগড়ের যুদ্ধে** সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া বিহারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। সুরজগড়ের যুদ্ধ



শের শাহ্‌ (সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

অতঃপর চুণার দুর্গের অধিপতির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া তিনি উক্ত দুর্গ এবং প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন (১৫৩০)। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন তাঁহাকে আক্রমণ করেন; কিন্তু গুজরাতে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই।

বাংলা আক্রমণ—অতঃপর শের খাঁ বাংলাদেশে অধিকার বিস্তার করিতে কৃতসংকল্প হন। বাংলার সুল্‌তান ঘিয়াস্‌উদ্দীন মুহ্‌মুদ শাহ্‌কে বিতাড়িত করিয়া তিনি গৌড় অধিকার করিলেন। বিহারের অন্তর্গত রোহ্‌তাস দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল।

হুমায়ূনের সহিত যুদ্ধ—গুজরাত হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর হুমায়ূন, শেরখাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহারে উপস্থিত হইয়া চুণার দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর হুমায়ূন বাংলায় উপস্থিত হইয়া গৌড় অধিকার করিলেন। শের খাঁ তাঁহাকে বাংলা দেশে বাধা না দিয়া তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশ (বারাণসী ও জৌনপুর) আক্রমণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ূন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু শের খাঁ পথিমধ্যে বাধা প্রদান করিয়া বক্সারের নিকটবর্ত্তী **চৌসার যুদ্ধে** তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (১৫৩৯)। হুমায়ূনের বেগম এবং শিবিরস্থ অন্যান্য মহিলাগণ শের খাঁর হস্তে বন্দী হন; কিন্তু শের খাঁ প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহাদিগকে সসম্মানে হুমায়ূনের নিকট প্রেরণ করিলেন। শের খাঁ অতঃপর 'শের শাহ্‌' নাম ধারণ করিয়া আপনাকে সম্রাট্‌রূপে ঘোষণা করেন (১৫৩৯)। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ূন পুনরায় **কনৌজের (বা বিল্‌গ্রামের) যুদ্ধে** শের শাহ্‌ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

হুমায়ূনের পরাজয়

রাজ্যবিস্তার—হুমায়ূনের পরাজয়ের পর শের শাহ্‌ **পঞ্জাব** অধিকার করেন। অতঃপর বাংলায় বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্ব্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (১৫৪১)। বিদ্রোহের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ উঠাইয়া দিয়া সমগ্র প্রদেশ 'সরকার' নামে অভিহিত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক বিভাগ একজন আমীরের হস্তে অর্পণ করিলেন। বাংলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি **মালব** জয় করেন। **গোয়ালিয়র** এবং **রণথম্ভোর** দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। পর বৎসর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি রাজপুত বীর পূরণমলের অধীন **রায়সীন দুর্গ** অধিকার করেন। **সিন্ধু** এবং **মূলতান** তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৪৩

পাঞ্জাব অধিকার

বাংলার শাসন-সংস্কার

মধ্য ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার

খৃষ্টাব্দে তিনি চতুরতা দ্বারা মারবাড়ের পরাক্রান্ত রাজপুত রাজা **মালদেবকে** পরাজিত করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে **কালিঞ্জর দুর্গ** অবরোধকালে বোমার আগুনে আহত হইয়া শের শাহ্ প্রাণত্যাগ করেন।

শাসন-পদ্ধতি—শের শাহ্ যে কেবল বুদ্ধিমান্, সাহসী ও সুদক্ষ সেনা-নায়ক ছিলেন, তাহা নহে; শাসন-সংস্কারের জন্য নানাবিধ সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

শের শাহের বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আবার প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন সরকার ও পরগণায় রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইত। সরকার ও পরগণা

তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য **জরিপ** করাইয়া প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দ্দিষ্ট করাইয়া দেন। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ **রাজস্ব** রূপে ধার্য্য হইয়াছিল। প্রজাগণ ইচ্ছামত শস্য বা অর্থদ্বারা রাজকর দিতে পারিত। শের শাহ্ **কবুলিয়ত ও পাট্টা** প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া জমিদার ও প্রজার পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণের যথেচ্ছাচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইল। অকবরের রাজস্ব-সংস্কার শেরশাহের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজস্ব বিভাগীয় সংস্কার

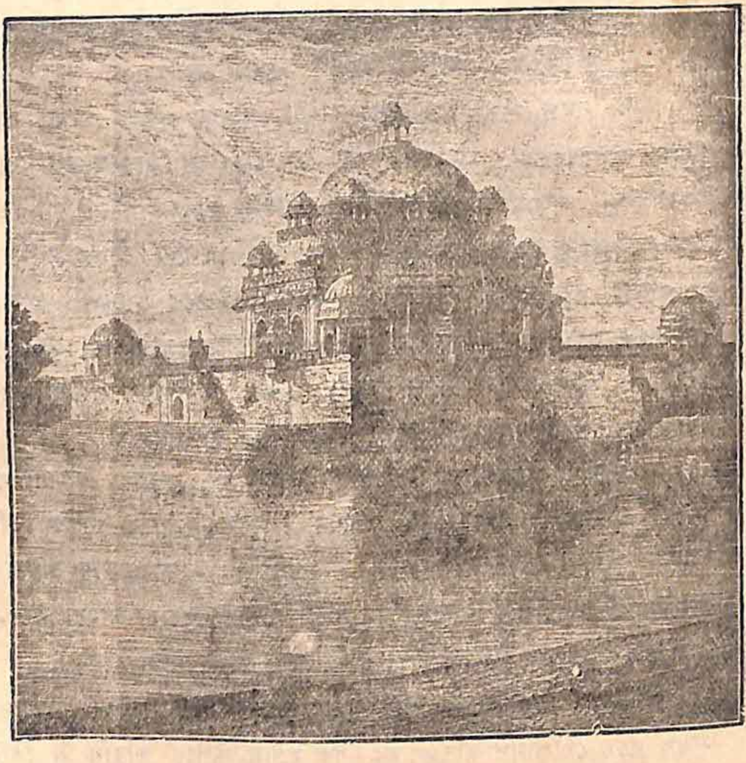
শের শাহ্ ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যাহাতে দুর্ব্বল প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, সেজন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রামে শান্তিরক্ষা ও চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য তিনি পুলিশ বিভাগে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিচার বিভাগীয় সংস্কার

শের শাহ্ দেশের প্রচলিত মুদ্রার সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার সময়ে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হয় এবং মুদ্রার উপরে ফারসি ও হিন্দি ভাষায় তাঁহার নাম লিখিত হয়। বাণিজ্য এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বহু রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। বাংলাদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত তিনি যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে মুদ্রা সংস্কার রাস্তা-নির্ম্মাণ

উহা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড (Grand Trunk Road) নামে পরিচিত। তিনি এই সকল রাস্তার দুইধারে বৃক্ষরোপণ এবং মাঝে মাঝে সরাইখানা স্থাপন করিয়া জনসাধরণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন।

সেকালে সৈন্যদলের দক্ষতা এবং রাজভক্তির উপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। সুতরাং শের শাহ্ সৈন্যদলের উন্নতি বিধান করেন এবং কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করেন।

চরিত্র—শের শাহ্ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া তিনি উত্তর ভারতব্যাপী



শের শাহের সমাধি—সাসারাম (বিহার)

এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, এবং মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে শাসনসংস্কার এবং প্রজার হিতজনক নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

করিয়াছিলেন। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে তাঁহার তুলনা পাওয়া যায় না। ইস্‌লাম ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াও তিনি হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করিতেন। একজন হিন্দুকে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আক্‌বরের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, শের শাহের সময়েই তাহার সূত্রপাত হয়। শের শাহ্ শিল্পানুরাগী ছিলেন। সাসারামে তাঁহার সমাধি-ভবন ভারতীয় মুস্‌লিমস্থাপত্যের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। দিল্লীতেও তিনি একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রায়সীন ও মারবাড় আক্রমণ কালে বিশ্বাসঘাতকতা ও চতুরতা দ্বারা শের শাহ্ স্বীয় চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি যে অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ...ার ধর্ম্ম-নীতি

শের শাহের পরবর্ত্তী সূর রাজগণ (১৫৪৫-৫৫)

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের অকর্ম্মণ্যতা ও আত্মকলহের ফলে সুরবংশের ক্ষমতা অল্প দিনের মধ্যেই লুপ্ত হয় এবং মুঘল প্রাধান্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পুত্র **ইস্‌লাম শাহ** (বা **সলীম শাহ্**) ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইস্‌লাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র **ফারুজ শাহ্‌কে** হত্যা করিয়া শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র **মুহম্মদ আদিল শাহ্** সিংহাসন অধিকার করেন। এই অকর্ম্মণ্য সুল্‌তান রাজকার্য্যের ভার **হীমু** নামক একজন নীচজাতীয় হিন্দু কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। হীমু সামরিক ব্যাপার এবং শাসনকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আফ্‌গান ওমরাহ্‌গণ আদিল শাহের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। **ইব্রাহীম শাহ্** এবং **সিকন্দর শাহ্** নামক শের শাহের দুইজন খুল্লতাত যথাক্রমে পঞ্জাবের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন (১৫৫৫)। কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র আক্‌বর, বৈরাম খাঁ নামক সেনাপতির অভিভাবকতায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন

সুরবংশের অধঃপতন

হুমায়ুনের প্রত্যাবর্ত্তন

হীমু

(১৫৫৬)। এদিকে হীমু দিল্লী অধিকার করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে পুনরায় হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে** হীমু পরাজিত হন; বৈরাম খাঁর প্ররোচনায় আক্‌বর স্বহস্তে বন্দী হীমুর মস্তক ছেদন করেন। দিল্লী ও আগ্রা আক্‌বরের হস্তগত হইল। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ আদিল শাহ্ বাংলার সুল্‌তানের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ঐ বৎসরই সিকন্দর শাহ্ আক্‌বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইব্রাহীম শাহ্ বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে আফ্‌গান বা পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইল। মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় ও প্রসারলাভ করিতে লাগিল।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

Model Questions

1. Sketch the career and character of Babur.

2. Review the greatness of Sher Shah with special reference to his (a) character, (b) conquests, and (c) administration.

3. Give an account of the career of Humayun with reference to his struggle with Sher Shah.

সপ্তদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য (১৫৫৬-১৭০৭)

প্রথম পরিচ্ছেদ—আক্‌বর (১৫৫৬-১৬০৫)

জন্ম	...	...	...	১৫৪২
সিংহাসনে আরোহণ	...	...	...	১৫৫৬
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	...	...	...	১৫৫৬
স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ	...	...	...	১৫৬২
উত্তর ভারত জয়	...	...	...	১৫৫৯-৯২
কান্দাহার জয়	...	...	...	১৫৯৫
আহ্‌মদনগর জয়	...	...	...	১৬০০
খান্দেশ জয়	...	...	...	১৬০১
মৃত্যু	...	...	...	১৬০৫

বাল্যজীবন—১৫৪২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে আক্‌বরের জন্ম হয়। তখন তাঁহার পিতা হুমায়ুন, শের শাহের আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। হুমায়ুন যখন পারস্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আক্‌বর হুমায়ুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাবুলের অধিপতি কাম্‌রানের নিকট রহিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই; কিন্তু বাল্যকালেই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হন। তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি **বৈরাম খাঁ** তাঁহার অভিভাবক হইলেন।

আফ্‌গান শক্তির সহিত সংঘর্ষ—সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই আক্‌বরকে এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। হুমায়ুন কেবলমাত্র দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ তখনও সুরবংশীয় আফ্‌গান নেতৃগণের অধিকারভুক্ত ছিল হুমায়ুনের মৃত্যুতে মুঘলশক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে মনে

হীমু করিয়া সূরবংশীয় সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হীমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। হীমু এবং আফ্‌গান নেতৃগণকে দমন করিতে না পারিলে ভারতে মুঘল প্রভুত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। বৈরাম খাঁর সাহস ও দক্ষতার ফলে হীমু **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে** পরাজিত ও বন্দী অবস্থায় নিহত হন (১৫৫৬)। সূরবংশীয় নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ নিহত হইলেন। কেহ বা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বৈরাম খাঁ ও আকবর আপাততঃ বিপন্মুক্ত হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ—১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈরাম খাঁ আকবরের নামে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু আকবরের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর হইল তখন তিনি আর বৈরাম খাঁর অধীনে থাকা পছন্দ করিলেন না। তাঁহার মাতা, ধাত্রী মাতা, ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকেন। ফলে আকবর, বৈরামকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া মক্কা যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈরাম

বৈরাম খাঁর বিদ্রোহ

মুঘল সম্রাট্‌গণের সংক্ষিপ্ত বংশলতা :—

(১) বাবুর (১৫২৬-৩০)

(২) হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)

(৩) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) মীর্জা মুহম্মদ হকীম

(৪) জহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) মুরাদ দানিয়াল

খুস্রু পর্ব্বীজ (৫) শাহ্‌জহান (১৬২৭-৫৮) শাহ্‌রীয়র

দারা শুজা (৬) ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭) মুরাদ

রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করিতে অসম্মত ছিলেন না; কিন্তু **ধাত্রী-মাতার** উদ্ধত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বিদ্রোহী হন।

আক্‌বর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। মক্কার পথে বৈথাম খাঁ একজন শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন।

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতির পরেও আক্‌বর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার ধাত্রী-মাতা **মাহম অনগা** এবং অন্যান্য কয়েকজন স্ত্রীলোক কিছুদিন পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ইহাদের শাসনে রাজ্যমধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর স্বহস্তে সমুদয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।



আক্‌বর (সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

রাজ্য বিস্তার—সমগ্র ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করাই আক্‌বরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত

হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রায় সফল হইয়াছিল; কারণ কাবুল হইতে বাংলা এবং কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহ্‌মদনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। আক্‌বর অসাধারণ ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য-স্রষ্টা ছিলেন, সন্দেহ নাই।

জৌনপুর

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বৈরাম খাঁ দিল্লী ও আগ্রায় মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া **গেয়ালিয়র ও জৌনপুর** জয় করেন (১৫৫৯)। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী এই সকল প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায় আক্‌বর দূরবর্ত্তী রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইলেন।

মালব

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে **মালব** অধিকৃত হইল এবং কয়েক বৎসর পরে মালবের অধিপতি বাজবহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আক্‌বরের সেনাপতি অসফ খাঁ **গোণ্ডোয়ানা** (বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ) আক্রমণ করেন। এই প্রদেশের প্রধান রাজ্যের হিন্দু রাজা নাবালক ছিলেন; তাঁহার মাতা রাজপুত-বংশীয়া বীর রমণী **রাণী দুর্গাবতী** রাজার অভিভাবিকাস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অসফ খাঁর সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ চালাইবার পর স্বাধীনতা রক্ষার আশা নাই দেখিয়া রাণী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করিলেন; তাঁহার পুত্রও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। গোণ্ডোয়ানার কিয়দংশ আক্‌বরের অধিকারভুক্ত হইল

গোণ্ডোয়ানা

অতঃপর আক্‌বর **রাজপুতনায়** প্রাধান্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হন। রাজপুতগণ চিরদিনই বীরত্ব ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ; তাহারা বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মুসলমান আক্রমণ হইতে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। রাজপুতদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা প্রায় অসম্ভব জানিয়া আক্‌বর তাহাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে চাহিলেন। তাঁহার উদার নীতির ফলে রাজপুত রাজগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। অম্বর (জয়পুর), মারবাড় (যোধপুর), বিকানীর, বুন্দী, জৈসল্মের প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ আক্‌বরের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুঘল সম্রাট্-পরিবারের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রাজপুতগণের সহিত মিত্রত

আকৃবর স্বয়ং অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত-কুলমণি সংগ্রাম সিংহের পুত্র মেবাড়ের রাণা **উদয়সিংহ** জাতীয় ধর্ম্ম, কুলমর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকৃবর **চিতোড়** আক্রমণ করেন। **চিতোড় অধিকার**



রাণা প্রতাপ (প্রাচীন চিত্র হইতে)

রাণা আত্মরক্ষার জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; **জয়মল, পত্তা** প্রভৃতি সাহসী সেনাপতিগণ চিতোড় রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জয়মল সম্রাট্ আকৃবর কর্ত্তৃক নিহত হইলে চিতোড়

মুঘল সৈন্যদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল (১৫৬৮)। রাজপুত রমণীরা জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

চিতোড় অধিকৃত হইল বটে; কিন্তু মেবার রাজ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল না। রাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর পর (১৫৭২) তাঁহার বীরপুত্র **প্রতাপসিংহ** সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মুঘলদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন।

রাণা প্রতাপসিংহ

প্রতাপের বীরত্বকাহিনী উপকথা অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর! স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল; ক্ষুদ্র এক পার্ব্বত্য রাজ্যের অধিপতি হইয়াও প্রায় ২৫ বৎসর কাল (১৫৭২-৯৭) তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তির গতিরোধ করিয়াছিলেন। অম্বররাজ মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুত রাজগণ আক্‌বরের সহিত যোগ দিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতেও বীরবর প্রতাপ বিচলিত হন নাই। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে **গোগুণ্ডা বা হলদিঘাটের যুদ্ধে** প্রতাপ মুঘলবাহিনী কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি সপরিবারে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পার্ব্বত্য প্রদেশে কালযাপন করেন। তথাপি রাজৈশ্বর্য্য ভোগের লোভে প্রতাপ আক্‌বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেন নাই। যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ দুর্গ মুঘল অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজধানী চিতোড় তিনি আর হস্তগত করিতে পারেন নাই। মৃত্যুশয্যায় তিনি পুত্র ও অনুচরদিগকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে **রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর** দুর্গ আক্‌বরের অধিকারভুক্ত হয়।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর সমৃদ্ধিশালী **গুজরাত** রাজ্য আক্রমণ করেন। পর বৎসর ঐ রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বাংলা অধিকার

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে **বাংলা ও বিহারের** আফ্‌গান সুলতান সুলেমান কর্‌রানীর মৃত্যু হয়। সুলেমান স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিলেও সময় সময় উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া আক্‌বরকে সন্তুষ্ট রাখিতেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র **দাউদ খাঁ** আক্‌বরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া

স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ আরম্ভ করেন। ফলে আক্‌বর বাংলা বিজয়ের জন্য মুনীম খাঁ ও রাজা তোড়লমলের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন এবং বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ইহার পরেও ভাওয়ালের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায় ও চাঁদ রায়, বাক্‌লার (বাখরগঞ্জ জেলার) রামচন্দ্র রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি পরাক্রান্ত জমিদারগণ সময় সময় মুঘল শাসনের বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন।

কাবুল

আক্‌বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জ্জা মুহম্মদ হকীম **কাবুল** প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কয়েকজন বিদ্রোহী নেতার সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর কাবুল অধিকার করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে হকীমের মৃত্যু হইলে কাবুল প্রকৃতপক্ষে অক্‌বরের সাম্রাজ্যের অংশরূপে পরিণত হয়।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে **কাশ্মীর** ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে **সিন্ধু** এবং ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে **উড়িষ্যা** আক্‌বরের হস্তগত হয়। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে **বেলুচিস্থান** এবং পর বৎসর **কান্দাহার** অধিকৃত হয়।

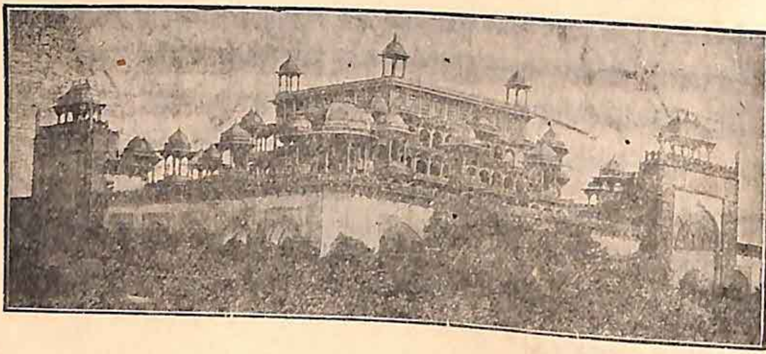
বেরার ও আহ্‌মদনগর

উত্তর-ভারতে আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আক্‌বর দক্ষিণ-ভারত বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই তিনি **আহ্‌মদনগর** রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই রাজ্য তখন এক নাবালক সুল্‌তানের শাসনাধীন ছিল। বিজাপুরের রাজমহিষী এবং আহ্‌মদনগরের রাজকন্যা বীর রমণী **চাঁদ সুলতানা** অসীম সাহস ও বুদ্ধিবলে মুঘল বাহিনীর আক্রমণ হইতে আহ্‌মদনগর রক্ষা করিলেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি দ্বারা আহ্‌মদনগরের সুল্‌তান বেরার প্রদেশ আক্‌বরকে প্রদান করেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে আভ্যন্তরীণ নানাবিধ গোলযোগের ফলে চাঁদবিবি নিহত হন (অথবা আত্মহত্যা করেন)। তখন আক্‌বর পুনরায় আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের কিয়দংশ অধিকার করেন (১৬০০)।

খান্দেশ

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর **খান্দেশ** রাজ্য আক্রমণ করিয়া ঐ রাজ্যের সুল্‌তানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মুঘল সৈন্য

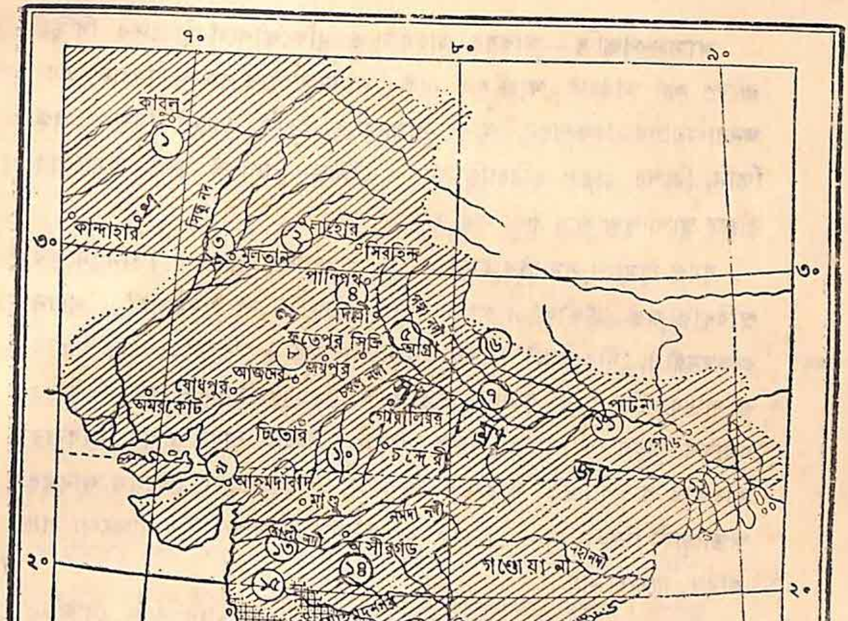
আহ্মদনগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে খান্দেশের স্থলতান তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অসম্মত হন। এই অপরাধে আকবর ১৬০১ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ রাজ্য অধিকার করেন। অসীরগড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়।



সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি (জহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত)

বিদ্রোহ—আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে কয়েকবার বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। ১৫৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী উজবেগ কুলের কয়েকজন দলপতির বিদ্রোহের স্থযোগ পাইয়া মীর্জ্জা মুহম্মদ হকীম পঞ্জাব আক্রমণ করেন। অতঃপর সেনাপতি অসফ খাঁ বিদ্রোহী হন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারের আফ্গান দলপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র সলীম বিদ্রোহী হইয়া পিতার প্রিয় মন্ত্রী আবুল ফজলকে গোপনে হত্যা করেন। আকবর এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া স্বকীয় প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শেষ জীবন—শেষ জীবনে আকবর বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। সলীমের বিদ্রোহ এবং আবুল ফজলের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়ালের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার শোকভার আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়।



আক্‌বরের মৃত্যুকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা এই মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাবুল ও কান্দাহার—মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ (২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। রাজপুতানায় মেবাড়ের কিয়দংশ স্বাধীন (২০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাংলায় জমিদারগণ কার্য্যতঃ প্রায় স্বাধীন (২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গোণ্ডোয়ানার কিয়দংশ স্বাধীন (২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দাক্ষিণাত্যে আহ্‌মদনগরের কিয়দংশ স্বাধীন (২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইতিপূর্ব্বেই বেরার আহমদনগরের এবং বীদর বিজাপুরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। (১৬৪ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য) বিজারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর (১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সীমানাগুলি আনুমানিক।

শাসন-পদ্ধতি—আক্‌বর বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান এবং জনসাধারণের হিতসাধন দ্বারা সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপনকর্ত্তারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় শাসন

সমগ্র সাম্রাজ্য সম্রাটের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইত। তিনি নিজের সুবিধার জন্য 'উকীল' (প্রধান মন্ত্রী), 'উজীর' বা 'দেওয়ান' (প্রধান রাজস্বমন্ত্রী), 'মীর বক্সী' (সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা), 'সদর' (ধর্ম্ম, বিচার ও দাতব্য বিভাগের কর্ত্তা) প্রভৃতি মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিবার অধিকার বা সামর্থ্য কাহারও ছিল না। স্বৈরাচারী হইলেও আক্‌বর অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত, সন্দেহ নাই।

মনসব প্রথা

আক্‌বরের পূর্ব্বে সৈন্যাধ্যক্ষ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকে বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর প্রদান করা হইত। ইহাতে রাজ্যের আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইত এবং জায়গীরদারগণের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা বাড়িয়া যাইত। আক্‌বর জায়গীর প্রথা উঠাইয়া দিয়া **মন্‌সব প্রথা** প্রবর্ত্তন করেন। মন্‌সবদারগণ ৩০টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। পদের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে নগদ বেতন দেওয়া হইত।

বিচার ব্যবস্থা

মুঘল সম্রাট্‌গণের **বিচার বিভাগ** শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। সম্রাট্ স্বয়ং দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিতেন। 'সদর' তাঁহার অধীনে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক ছিলেন। বড় বড় সহরে এবং কোন কোন গ্রামে 'কাজী' থাকিতেন। কাজীদের সাহায্য করিবার জন্য সময় সময় 'মুফ্‌তী' নিয়োগ করা হইত।

প্রাদেশিক শাসন

প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য আক্‌বর সমগ্র সাম্রাজ্য ১৫টি **সুবা** বা প্রদেশে বিভক্ত করেন—লাহোর, কাবুল, মুলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমের, আহ্‌মদাবাদ, মালব, বিহার, বাংলা (উড়িষ্যা সহ), খান্দেশ, বেরার এবং আহমদনগর। প্রত্যেক

সুবায় 'সিপাহ্সালার' বা 'নাজিম' (পরবর্ত্তী যুগের 'সুবাদার') উপাধিধারী একজন সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। তিনি নিজের সুবায় সুশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রত্যেক সুবায় 'দেওয়ান' উপাধিধারী একজন উচ্চ কর্ম্মচারী রাজস্ব বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রতি জেলায় 'ফৌজ্দার' উপাধিধারী কর্ম্মচারীর উপর শান্তিরক্ষার ভার থাকিত। 'কাজী' এবং 'মীর আদল' সংজ্ঞক দুইজন কর্ম্মচারীর উপর বিচার-বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে 'সদর' (মসজিদ ও দাতব্য বিভাগের কর্ত্তা), 'আমীল' (রাজস্ব আদায়কারী), 'বকাইনবিশ' (সংবাদ সংগ্রাহক বা গুপ্তচর) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজস্ব বিভাগীয় সংস্কার

আকবর **রাজস্ব** বিভাগে বহু সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজা **তোড়লমল** রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসারে সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করা হয়। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকররূপে ধার্য্য হইল। প্রজাগণ ইচ্ছামত নগদ টাকা বা শস্য দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিতে পারিত। আকবর নানাবিধ কর রহিত করিয়া প্রজাগণের উপকার করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি—আকবর নিরক্ষর হইলেও শিল্প ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ফতেপুর সীক্রীতে একটি অতি সুন্দর শহর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি-ভবন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আগ্রায় ও লাহোরে তিনি সুরম্য প্রাসাদ-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। আকবরের সময়ে চিত্র শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল।

স্থাপত্য

আকবর সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক **তানসেন** তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। মালবের ভূতপূর্ব্ব সুল্তান **বাজবহাদুর** আকবরের অধীন কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে এবং হিন্দি সঙ্গীতে তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ছিল।

সঙ্গীত

সাহিত্য ও ইতিহাস

আক্‌বরের সময়ে ফার্‌সি ও হিন্দি সাহিত্যের উন্নতি হয়। আক্‌বরের প্রিয় সহচর **আবুল ফজ্‌ল্** 'আইন-ই-আকবরী', এবং 'আক্‌বরনামা' নামক দুইখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে আকবরের রাজত্বের বিস্তারিত ইতিহাস এবং তাঁহার শাসন-পদ্ধতির বিবরণ জানিতে পারা যায়। এই সময়েই **নিজামউদ্দীন আহ্‌মদ** এবং **বদায়ূনী** দুইখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আবুল ফজ্‌লের ভ্রাতা **ফৈজী** বিখ্যাত কবি ছিলেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানা সংস্কৃতগ্রন্থ ফার্‌সি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মহাকবি **তুলসীদাস** আক্‌বরের সময়েই 'রামচরিতমানস' নামক বিখ্যাত হিন্দি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

উদার ধর্ম্ম নীতে

হিন্দুদিগের প্রতি ব্যবহার—আকবর বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষে হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করা সম্ভব নহে। তাঁহার মন অতি উদার ছিল; তাই তিনি সহজেই হিন্দুদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ও তাহাদের প্রতি সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিলেন। আকবর স্বয়ং এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলীম কয়েক-জন রাজপুত রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জিজিয়া এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দুদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। আক্‌বর গোহত্যা নিবারণ করিতে এবং হিন্দুকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রথা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে **তোড়লমল** এবং মানসিংহের নাম সুপ্রসিদ্ধ। তোড়লমল সুদক্ষ সেনাপতি এবং রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। অম্বররাজ **মানসিংহ** আক্‌বরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আক্‌বরের উদার নীতির ফলে হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং রাজপুতগণের সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছিল।

হিন্দু কর্ম্মচারী

আক্‌বরের ধর্ম্মমত—আক্‌বর বাল্যজীবনে গোঁড়া সুন্নী মুসলমানরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সূফী

সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার ফলে তাঁহার গোঁড়ামি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানপিপাসার উৎপত্তি হইল। তিনি প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক হইলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ফতেপুর সীক্রীতে **ইবাদৎখানা** নামক এক উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং সেখানে ইস্‌লাম ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সম্মেলন ও বিচার-বিতর্কের ব্যবস্থা করিলেন। কয়েক বৎসর পরে সেখানে মুসলমান মৌলানাদের সহিত হিন্দু, জৈন, পার্শি এবং খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের সম্মেলন হইতে লাগিল। সম্রাট্ স্বয়ং প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট হইতে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। আকবরের পূর্ব্বে কোন মুসলমান নৃপতি এইরূপ উদারতা এবং ধর্মবিষয়ক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন নাই।

ধর্মসম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা

'ইবাদৎখানা'র বিচার-বিতর্কের ফলে আকবরের জীবনে এক বিরাট্ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। প্রকাশ্যে ইস্‌লাম ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও তিনি অন্যান্য ধর্মের কোন কোন অনুষ্ঠান পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আচার্য্য জরথুশ্‌ত্র প্রবর্ত্তি প্রাচীন পারসিক ধর্মের চতুর্দ্দশটি ধর্মোৎসব পালন করিতেন এবং উক্ত ধর্মের মতানুযায়ী অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। জৈন ধর্মের প্রভাবে তিনি জীবহত্যার প্রতি বীতস্পৃহ হন। ফলে তিনি স্বয়ং নিরামিষ আহার আরম্ভ করেন এবং বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক দিনে পশুবধ নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করেন। হিন্দু এবং খৃষ্ট ধর্মের ভাবধারা তাঁহার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমসাময়িক লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অনেকেই আকবরকে পার্শি, জৈন, খৃষ্টান বা হিন্দু বলিয়া মনে করিত।

অমুস্‌লিম ধর্মের প্রভাব

ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি আকবরের যথার্থ অনুরাগ ছিল কিনা, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, অন্য ধর্মমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত মহাগ্রন্থ কুর্‌-আনের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। যাহা হউক, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এক অনুজ্ঞা (Infallibity Decree) প্রচার করিলেন যে, ইস্‌লাম ধর্মের সমুদয় অনুশাসন এবং অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্রাটের ব্যক্তিগত মত

ধর্ম সংস্কার

চূড়ান্ত মীমাংসারূপে গণ্য হইবে। এই আজ্ঞার ফলে শাসন ব্যাপারের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েও সম্রাটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতঃপর আক্‌বর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য নূতন এক ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন (১৫৮২)। এই মত ইতিহাসে **দীন-ইলাহী** নামে পরিচিত। সমস্ত ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সমন্বয় করিয়া এই ধর্ম্মমত গঠিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস এই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। সুতরাং সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। ভারতের বিভিন্নজাতি ও সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করিবার জন্যই আক্‌বর এই মহান্ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। খুব কম লোকই স্বেচ্ছায় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আক্‌বর বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করিতেন না; তাই তিনি কাহাকেও নবধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন

সমাজ-সংস্কার—আক্‌বর কাহারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসে বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিতেন না। কিন্তু সামাজিক অনাচার দমন করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা রোধ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন এবং অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকাদের বিবাহ বন্ধ করেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ যথার্থরূপে প্রতিপালিত হইলে হিন্দু সমাজের অনেক উপকার হইত।

সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ

চরিত্র—আক্‌বর যে কেবল ভারতবর্ষের মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি অসাধারণ সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রে সরলতা, অমায়িকতা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তিনি সকল শ্রেণীর প্রজার হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অদম্য ছিল। তিনি অবসর সময়ে পণ্ডিত ও যাজকগণের সহিত আলাপ করিতেন এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি শ্রবণ করিতেন। ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

জ্ঞানপিপাসা

বিজেতা ও শাসকরূপে তাঁহার সমকক্ষ নৃপতি বিরল। তিনি বাহুবলে এবং বুদ্ধি কৌশলে এক বিরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া উহার সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-কাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)

খুস্রুর বিদ্রোহ	...	১৬০৬
নূরজহানের সহিত বিবাহ	...	১৬১১
মেবাড়ের বশ্যতা স্বীকার	...	১৬১৫
আহমদনগর জয়	...	১৬১৬
পারসিকগণের কান্দাহার জয়	...	১৬২২

খুস্রুর বিদ্রোহ—আক্‌বরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলীম নূর্‌উদ্দীন মুহম্মদ জহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইহার কয়েক মাস পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুস্রু বিদ্রোহী হন। খুস্রু সম্রাট্ আক্‌বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সলীম যখন আক্‌বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন খুস্রুকে আক্‌বরের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অম্বররাজ মানসিংহ খুস্রুর মাতুল এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যাহাহউক, খুস্রু বিদ্রোহী হইলে জহাঙ্গীর স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। খুস্রু পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার অনুচরগণেকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় এবং কিছুদিন পরে খুস্রুকে অন্ধ করা হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে খুস্রুর মৃত্যু হয়। **খস্রুর পরাজয়**

শিখ দমন—পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের গুরু বা নেতা **অর্জ্জুন** খুস্রুকে অর্থ সাহায্য করিয়া জহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হন। সম্রাট্ অর্জ্জুনের অর্থদণ্ড করেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাহা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়। জহাঙ্গীর স্বীয়ং তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন যে, শিখগুরুকে বিদ্রোহের অজুহাতে হত্যা করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে শিখ ধর্ম্ম দমন করাই এই কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। **গুরু অর্জ্জুনের হত্যা**

সম্রাজ্ঞী নূর্জাহান—১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার অন্তর্গত বর্দ্ধমানের জায়গীরদার শের আফ্‌গান সম্রাটের প্রেরিত একদল সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তাঁহার পত্নী **মিহ্‌র্ উন্নীসা** সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে জহাঙ্গীরের সহিত এই পরম রূপবতী মহিলার বিবাহ হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ আকবরের সময়ে জহাঙ্গীর মিহ্‌র্ উন্নীসার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন; কিন্তু আক্‌বর এই প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া শের আফ্‌গানের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জহাঙ্গীর রাজ্যলাভ করিয়াই শের আফ্‌গানকে হত্যা করাইয়া মিহ্‌র্ উন্নীসাকে লাভ করেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন কোন লেখক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মিহ্‌র্ উন্নীসা বিবাহের পর 'নূর্জহান' (বা জগতের আলো) নামে পরিচিতা এবং সম্রাটের প্রধানা মহিষীরূপে পরিগণিতা হন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। জহাঙ্গীরের উপর তাঁহার প্রভাব এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজকীয় মুদ্রায় জহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার নামও মুদ্রিত হইত। তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

নূরজহানের প্রভাব

রাজ্য-বিস্তার—জহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। আক্‌বর দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া **বাংলা** কতকটা বশীভূত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বাংলার ক্ষমতাশালী হিন্দু ও মুসলমান জমিদার-গণ এবং আফ্‌গান ওম্‌রাহ্‌গণ বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের নানাস্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। জহাঙ্গীরের সময়ে ইস্‌লাম খাঁ নামক একজন সুযোগ্য সুবাদার বাংলায় মুঘল অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভাওয়ালের ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং বাকলার রামচন্দ্র রায়কে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীহট্টে আফ্‌গান দলপতি ওস্‌মান খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি কোচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশ (বর্ত্তমান আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা) অধিকার করেন। পরে আহোম রাজ্যের সহিত মুঘলগণের যুদ্ধ হয় এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শান্তি

বাংলাদেশ

স্থাপিত হয়। ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়া ঐ শহরের নাম 'জহাঙ্গীরনগর' রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘলেরা অল্প-দিনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করে এবং বারবার আরাকানের মগদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়।

মেবাড় রাজ্যের অধিপতি মহাবীর প্রতাপসিংহ যাবজ্জীবন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র **অমরসিংহ** জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬১৫) মুঘল-প্রভুত্ব স্বীকার করেন। অমরসিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার নেতা ছিলেন জহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রম। জহাঙ্গীর অনান্য রাজপুত রাজগণ অপেক্ষা রাণা অমরসিংহকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে স্বীকার করিলেন। স্থির হইল যে, অনান্য রাজাদিগের ন্যায় মেবাড়ের রাণা কখনও সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইবেন না এবং সম্রাট্‌-পরিবারের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। মেবাড়ের বশ্যতা স্বীকারের ফলে সমগ্র রাজ-পুতানায় মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। **মেবাড়ের বশ্যতা**

আকবরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। **আহ্‌মদনগর** রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রথমতঃ মুঘলবাহিনী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; কারণ আহ্‌মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী **মালিক অম্বর** সৈন্য এবং রাজস্ব বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া উক্ত রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজপুত্র খুর্‌রম স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া আহ্‌মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন (১৬১৬)। এই জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ খুর্‌রম সম্রাট্‌ কর্ত্তৃক 'শাহ্‌জহান' (অর্থাৎ, জগৎপতি) উপাধিতে ভূষিত হইলেন। **আহ্‌মদনগর**

১৬২০ খৃষ্টাব্দে মুঘল সৈন্য পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত **কাংরা** দুর্গ অধিকার করে। জহাঙ্গীর বাংলায়, দাক্ষিণাত্যে ও রাজপুতানায় রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পারসিকগণের আক্রমণে **কান্দাহার** তাঁহার হস্তচ্যুত হয় (১৬২২)।

শাহ্‌জহানের বিদ্রোহ—জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহাকে বহু দুঃখ ও অপমান ভোগ করিতে হইয়াছিল। পারসিকগণ কর্ত্তৃক কান্দাহার

জয়ের পর তাঁহার প্রিয় পুত্র শাহ্ জহান বিদ্রোহী হন। সিংহাসনের লোভ এই বিদ্রোহের কারণ। জহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু পূর্ব্বেই শাহ্ জহানের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পর্ব্বীজ সিংহাসন লাভের যোগ্য ছিলেন না। তৃতীয় পুত্র শাহ্ জহান বীরত্ব ও বুদ্ধিবলে পিতার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নূর্ জহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মুম্‌তাজকে বিবাহ করিয়া শাহ্ জহান সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে শাহ্ জহান মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পথে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না। কিন্তু জহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্ রীয়র' নূর্ জাহানের (শের আফ্ গানের ঔরসজাত) কন্যাকে বিবাহ করায় নূর্ জহান নিজের জামাতাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই জহাঙ্গীর শাহ্ জহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আফ্ গানিস্থানে প্রেরণ করিতে চাহিলেন। তখন শাহ্ জহানের সন্দেহ হইল যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে নূর্ জহান নিজের ষড়্ যন্ত্র সফল করিয়া তুলিবেন। তাই তিনি জহাঙ্গীরের আদেশ অমান্য করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল এবং তিনি দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্রে সন্ধি স্থাপিত হয়।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ—মহবৎ খাঁ জহাঙ্গীরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার রাজভক্তির অভাব ছিল না; তিনি শাহ্ জহানের বিদ্রোহ দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নূর্ জহানের ঔদ্ধত্য ও ষড়্ যন্ত্রে বিরক্ত হইয়া ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। একদিন তিনি অতর্কিতে সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিয়া জহাঙ্গীরকে বন্দী করিলেন। নূর্ জহান সম্রাট্ কে উদ্ধার করিতে না পারিয়া স্বয়ং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেন। অবশেষে একদিন নূর্ জহান নিজের বুদ্ধি-কৌশলে স্বামীর মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্ জহান পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া মেবাড়ের রাণার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাবৎ খাঁ মেবাড়ে গমন করিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই জহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচার—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক **ভাস্কো ডা গামা** আফ্রিকার অন্তর্গত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার করেন। ইহার পর বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আগমন করে এবং ক্রমশঃ ভারত মহাসাগরে এবং ভারতের উপকূলস্থিত গোয়া, চৌল, হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি বন্দরে তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের অনেক গোঁড়ামী ছিল ; তাহারা হিন্দু ও মুসলমানদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত। তাহারা দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিত এবং মুসলমান তীর্থযাত্রিপূর্ণ জাহাজসমূহ অধিকার করিত। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জহাঙ্গীর সমস্ত পর্ত্তুগীজ বণিকদিগকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য সম্রাট্ তাহাদের প্রতিদ্বন্দী ওলন্দাজ (Dutch) বণিক্গণের সহিত সন্ধি করেন।

সার টমাস রো (Sir Thomas Roe)—১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্সের প্রেরিত সার টমাস রো নামক এক দূত জহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় চারি বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তাঁহার অনুরোধে জহাঙ্গীর ইংরেজ বণিক্দিগকে বাণিজ্যবিষয়ক সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। সার টমাস রো জহাঙ্গীরের দরবারে এক সুন্দর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। . . . .

জহাঙ্গীরের চরিত্র—জহাঙ্গীর পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন না ; তথাপি তাঁহার চরিত্রে বহু সদ্‌গুণ ছিল। তিনি মদ্যপায়ী ও অহিফেনসেবী ছিলেন এবং সময় সময় অসাধারণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেন ; কিন্তু তিনি শিল্প, সাহিত্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত ইতিমাদ্-উদ্দৌলার সমাধি মুঘল শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি স্বয়ং চিত্রকর এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার **আত্মজীবনী** অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। জহাঙ্গীর ন্যায়বিচারকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দীনতম প্রজাও স্বয়ং সম্রাটের নিকট আপনার অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিত। তিনি বহু কর উঠাইয়া দিয়া প্রজাগণের হিতসাধন করেন।

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শাহ্‌জাহান (১৬২৭-৫৮)

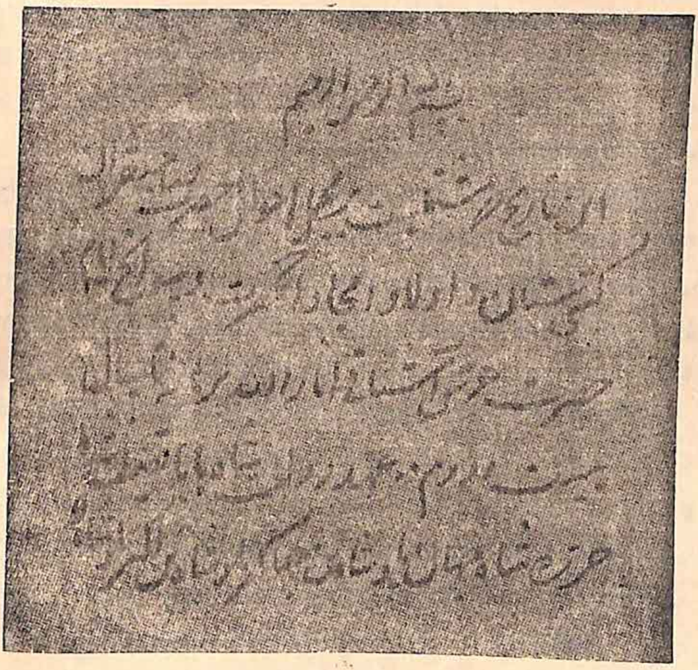
রাজ্যলাভ—জহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহান সহজেই সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার শ্বশুর (নূর্‌জহানের ভ্রাতা) অসফ খাঁ এবং বিখ্যাত সেনাপতি মহাবৎ খাঁ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহান আপনাকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ভবিষ্যতে যাঁহারা সিংহাসনের দাবি করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন। নূরজহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হইল।

বিদ্রোহ দমন—শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল; কিন্তু তিনি সহজেই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়াছিলেন। **খাঁ জহানলোদী** নামক একজন আফ্‌গান আমীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শাহ্‌জহানের রাজত্বের প্রথম ভাগেই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৬২৯-৩১), কিন্তু অবশেষে পরাজিত ও নিহত হন। **জুঝর সিংহ** নামক একজন বুন্দেলা দলপতিও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; তাঁহাকে দমন করিতে মুঘল বাহিনীর বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

পর্ত্তুগীজ দমন ও হুগলী অধিকার—জহাঙ্গীরের ন্যায় শাহ্‌জহানও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেও পর্ত্তুগীজগণ নানা প্রকারে দেশের ক্ষতি করিত। তাহাদের অধিকৃত শহরসমূহে তাহারা সমুদয় পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিত। পর্ত্তুগীজেরা হিন্দু ও মুসলমান বালক-বালিকাদিগকে ধরিয়া

পর্ত্তুগীজের অত্যাচার

ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। তাহারা জলদস্যুরূপে বণিক্ এবং উপকূল প্রদেশের অধিবাসিগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত। এই সকল কারণে সম্রাট্ বাংলার সুবাদার কাসিম খাঁকে পর্ত্তুগীজগণের প্রধান আশ্রয়-স্থল হুগলী অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুঘল সৈন্য কর্ত্তৃক হুগলী অধিকৃত হয়। বহু পর্ত্তুগীজ বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরিত ও নির্য্যাতিত হইল।



শাহ্‌জহানের হস্তলিপি

হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন বেগম কর্ত্তৃক রচিত 'হুমায়ুন নামা' নামক ফার্‌সি গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপিতে সম্রাট্ শাহ্‌জহান স্বহস্তে এই কয়টি পংক্তি লিখিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এইরূপ :—"দয়াময় ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। তৈমুর, তাঁহার গৌরবান্বিত বংশধরগণ এবং আক্‌বরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তক আক্‌বরের সময় লিখিত হইয়াছিল। স্বাক্ষর—আক্‌বর বাদ্‌শাহের পুত্র জহাঙ্গীর বাদ্‌শাহের পুত্র শাহ্‌জাহান বাদ্‌শাহ।"

আসাম অভিযান—শাহ্‌জহানের সময়ে আসামের আহোম রাজগণের সহিত মুঘল বাহিনীর বারবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কামরূপ জেলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত মুঘল অধিকার বিস্তৃত হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি—জহাঙ্গীরের সময় পারসিকগণ-কর্তৃক **কান্দাহার** অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্রোহী পারসিক সেনাপতি উহা শাহ্‌জহানকে প্রত্যর্পণ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৬৪৯) পারসিকেরা পুনরায় কান্দাহার অধিকার করে। শাহ্‌জহান স্বীয় পুত্র ঔরংজীবের নেতৃত্বে দুইটি (১৬৪৯ এবং ১৬৫২) এবং দারার নেতৃত্বে একটি (১৬৫৩) অভিযান প্রেরণ করিয়াও কান্দাহারে মুঘল-প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই।

কান্দাহার

ইতিমধ্যে শাহ্‌জহান মধ্য-এশিয়ায় পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃত প্রদেশ-সমূহ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চতুর্থ পুত্র মুরাদ্ হিন্দুকুশ পর্ব্বত এবং অক্সস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী বল্‌খ্ ও বদক্‌শান প্রদেশ অধিকার করেন; কিন্তু কিছুদিন পরে মুঘল সৈন্য বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঐ দুইটি প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার—মধ্য-এশিয়ায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়া শাহ্‌জহান ব্যর্থকাম হন বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আশা সফল হইয়াছিল।

আহ্‌মদনগর

আক্‌বর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে **আহ্‌মদনগর** রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জহান এই রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। ঐ রাজ্যের নিজাম্‌শাহী রাজ-বংশ বিলুপ্ত হইল।

দাক্ষিণাত্যে বহ্‌মনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত আর দুইটি মুসলমান রাজ্য ছিল—**বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডা**। এতদিন পর্য্যন্ত মুঘল সম্রাট্‌গণ আহ্‌মদনগর বিজয়ে ব্যস্ত থাকায় বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে শাহ্‌জহান এই দুইটি রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শাহ্‌জহান স্বয়ং সুন্নী ছিলেন; তাই শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত গোল্‌কুণ্ডা ও বিজাপুরের সুল্‌তানদ্বয়কে দমন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ঐ দুইজন

গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর

সুলতানকে মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করিতে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। গোল্‌কুণ্ডার সুলতান শাহ্‌জহানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া এবং বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বিজাপুরের সুলতানও শাহ্‌জহানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু বার্ষিক করপ্রদানের অপমান হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। বিজিত আহ্‌মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ তাঁহাকে দেওয়া হইল, এবং তিনি মুঘলদের করদ রাজ্য গোল্‌কুণ্ডার কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬৩৬)।

বিজাপুরের সহিত সন্ধির অব্যবহিত পরেই শাহ্‌জহানের তৃতীয় পুত্র **ঔরংজীব** দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে মুঘল সম্রাটের অধিকৃত অংশ চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—খান্দেশ (রাজধানী বুর্‌হান্‌পুর), বেরার (রাজধানী ইলিচ্‌পুর), তেলিঙ্গনা (রাজধানী নন্দের) এবং আহ্‌মদনগর (রাজধানী আহ্‌মদনগর, পরে দৌলতাবাদ)। প্রায় আট বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে কার্য্য করিয়া ঔরংজীব উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। বহুদিনের কুশাসনে দাক্ষিণাত্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহাতে শাসনকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না ঔরংজীব প্রথমেই রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। এই বিষয়ে **মুর্শীদ কুলী খাঁ** নামক একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মুর্শীদ কুলী খাঁ রাজা তোড়লমলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে জরিপ ও জমা ধার্য্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

দাক্ষিণাত্যে ঔরংজীব

শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া ঔরংজীব রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। গোল্‌কুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানগণ শাহ্‌জহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঔরংজীব ঐ দুইটি রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী কুশাসন ও রাজনৈতিক

দলাদলির ফলে ঐ রাজ্য দুইটি অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল। কাজেই মুঘল বাহিনীকে বাধা প্রদান করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না।

মীর জুম্‌লা

গোল্‌কুণ্ডার সুল্‌তান বার্ষিক কর প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং স্বীয় প্রধান মন্ত্রী **মীর জুম্‌লা** ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, এই অজুহাতে ঔরংজীব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬৫৬)। মীর জুম্‌লা পারশ্যদেশ হইতে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সাহস ও দক্ষতার গুণে গোল্‌কুণ্ডা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। সুল্‌তান তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; তিনিও কর্ণাটক অধিকার করিয়া ক্রমশঃ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেষে মীর জুম্‌লার পুত্রের ঔদ্ধত্যে সুল্‌তানের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। সুল্‌তান তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে চাহিলে, মীর জুম্‌লা ঔরংজীবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোল্‌কুণ্ডা জয়ে মীরজুম্‌লার সাহায্য কার্য্যকর হইবে জানিয়া ঔরংজীব তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। যাহা হউক, ঔরংজীবের আক্রমণে যখন গোল্‌কুণ্ডার পতন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তখন শাহ্‌জহান স্বয়ং যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। গোল্‌কুণ্ডার সুল্‌তান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থ এবং রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল সম্রাট্‌কে দান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন (১৬৫৬)।

গোলকুণ্ডার বশ্যতা

অতঃপর ঔরংজীব বিজাপুর আক্রমণ করেন। বিজাপুরের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শাহ্‌জহান ঔরংজীবকে সন্ধি করিতে আদেশ দিলেন। ফলে বিজাপুরের সুল্‌তান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থ এবং রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল সম্রাট্‌কে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন (১৬৫৭)। শাহ্‌জহান যদি ঔরংজীবকে বাধা প্রদান না করিতেন, তবে তিনি গোল্‌কুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। শাহ্‌জহান এই সময় তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। পাছে ঔরংজীব গোল্‌কুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করিয়া অত্যধিক ক্ষমতাশালী হন এবং সিংহাসন দাবি করেন, এই ভয়ে দারা তাঁহার জয়লাভে

বিজাপুরের বশ্যতা

বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডার সুল্‌তানগণ দারাকে ঔরংজীবের বিরুদ্ধমতাবলম্বী জানিয়া উৎকোচ দ্বারা তাঁহার সাহায্য ক্রয় করিয়াছিলেন।

সিংহাসনের জন্য বিরোধ (১৬৫৭-৫৯)—১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জহান গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়া তদীয় পুত্রগণ সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে ঔরংজীব জয়ী হন। তিনি পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃগণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

শাহ্‌জহানের চারি পুত্র ছিলেন—দারা, শুজা, ঔরংজীব ও মুরাদ। **দারা** সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকটেই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। শাহ্‌জহান তাঁহাকেই সিংহাসন দান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দারা বিদ্বান্ এবং উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। আক্‌বরের ন্যায় তিনিও অনেক সময় হিন্দু পণ্ডিত এবং খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার আদেশে কয়েকখানি উপনিষদ্ সংস্কৃত হইতে ফার্‌সি ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। এইজন্য গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না। শাহ্‌জহানের দ্বিতীয় পুত্র **শুজা** বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সাহসী ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন; কিন্তু ভোগাসক্তি ও বিলাসপ্রিয়তা তাঁহার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। শাহ্‌জহানের তৃতীয় পুত্র দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা **ঔরংজীব** বুদ্ধিমান, সাহসী ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি গোঁড়া মুসলমানদিগের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ **মুরাদ** গুজরাতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না; কিন্তু তিনি মদ্যপায়ী ও অদূরদর্শী ছিলেন। সিংহাসনের চার দাবিদার

শাহ্‌জহানের পীড়ার সময় দারা রাজধানী আগ্রায় বাস করিতেছিলেন। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া শুজা, ঔরংজীব ও মুরাদ মনে করিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দারা নির্ব্বিবাদে সিংহাসন লাভ করিবার জন্য মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়াছেন। শুজা বিরোধের সূচনা

তৎক্ষণাৎ বাংলার রাজধানী রাজমহলে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুরাদও গুজরাতের রাজধানী আহ্মদাবাদে আপনাকে বাদ্শাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঔরংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে অগ্রসর হইয়া মালবে মুরাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার শর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

ইতিমধ্যে শাহ্জহান আরোগ্যলাভ করিয়া শুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের বিদ্রোহ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ঔরংজীব ও মুরাদের মিলিত বাহিনীর গতিরোধ করিবার জন্য যোধপুর-রাজ যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। দারার পুত্র সুলেমান সসৈন্যে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উজ্জয়িনীর নিকটস্থ **ধর্ম্মৎ** নামক স্থানের **যুদ্ধে** যশোবন্তসিংহ ও কাসিম খাঁ ঔরংজীব ও মুরাদের মিলিত বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হন (১৬৫৮)। বিজয়ী ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুতবেগে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে বাঁধা দিবার জন্য দারা সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু আগ্রার নিকটবর্ত্তী **সামুগড়** নামক স্থানের **যুদ্ধে** তিনি পরাজিত হন (১৬৫৮)। ঔরংজীব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে জন্মের মত বন্দী করিলেন এবং স্বয়ং 'আলম্গীর' (অর্থাৎ বিশ্বজয়ী) উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি মুরাদকে কৌশলে বন্দী করেন এবং কিছুদিন পরে মিথ্যা অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন (১৬৬১)।

দারার পরাজয়

মুরাদের প্রাণদণ্ড

ইতিমধ্যে দারার পুত্র সুলেমান শুজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দারার পরাজয়ের পর সুলেমান যখন শক্তিহীন হন, তখন শুজা সুযোগ পাইয়া বারাণসী, জৌনপুর ও এলাহাবাদ অধিকার করিলেন। এইবার ঔরংজীব স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ফতেপুর জিলার অন্তর্গত **খজোয়া** নামক স্থানের **যুদ্ধে** তাঁহাকে পরাজিত করেন (১৬৫৯)।

সুজার পরাজয়

শুজা বাংলা অভিমুখে পলায়ন করিলেন ; ঔরংজীবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জুম্‌লা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শুজা বিতাড়িত হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৬৬০)। কিছুদিন পর আরাকানরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি সপরিবারে নিহত হন।

দারার প্রাণদণ্ড

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দারা পঞ্জাব এবং সিন্ধু দেশের মধ্যে দিয়া গুজরাতে উপস্থিত হন এবং তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আজমেরের নিকটবর্তী **দেওরাই** নামক স্থানের **যুদ্ধে** তিনি পুনরায় পরাজিত হইলেন (১৬৫৯)। তখন তিনি বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জনৈক আফ্‌গান দলপতির বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ঔরংজীবের হস্তে বন্দী হন। ঔরংজীবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কয়েকজন মৌলানা ধর্ম্মদ্রোহের অজুহাতে দারার প্রাণদণ্ড বিধান করেন (১৬৫৯)। দারার পুত্র স্থলেমান নিরুপায় হইয়া গাড়োয়ালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঔরংজীবের হস্তে বন্দী হন। দুই বৎসর পরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

মৃত্যু

শাহ্‌জহানের শেষজীবন—জীবনের শেষ আট বৎসর কাল (১৬৫৮-৬৬) শাহ্‌জহান আগ্রার দুর্গে নজরবন্দী ছিলেন। রাজ্যচ্যুতি এবং পুত্র-পৌত্রাদির শোকে তাঁহার শরীর ও মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ঔরংজীব শেষ সময়ে তাহার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। এই দুর্ভাগ্যের দিনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা **জহানারা** শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার শোকভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ সম্রাটের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়।

শাহ্‌জহানের চরিত্র—শাহ্‌জহানের শেষ জীবনের দুর্ভাগ্য আমাদের মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে বটে ; কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিজেও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে অপরাধী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর

ব্যবহার করিতেন; কিন্তু পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ ছিল। তাঁহার পত্নী মুম্‌তাজ্‌মহলকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মুম্‌তাজ্‌মহলের জীবদ্দশায় শাহ্‌জহানের চরিত্র পবিত্র ছিল। রাজ্যশাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের অভাব ছিল না। তাঁহার সময়ে দেশে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত। শাহ্‌জহান পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন। তিনি যে কেবল খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করিতেন, তাহা নহে; রাজপুতবংশীয়া মাতার গর্ভজাত হইয়াও তিনি রাজ্যমধ্যে হিন্দুর দেবমন্দির নির্ম্মাণ বন্ধ করেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন। তাঁহার আদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

অনুদার ধর্ম্মনীতি

শাহ্‌জহানের ঐশ্বর্য্য—শাহ্‌জহানের রাজত্বকাল ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক পরম গৌরবময় যুগ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু শাহ্‌জহানের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। ফরাসি দেশীয় খ্যাতনামা পর্য্যটক টেভার্নিয়ার ও বার্নিয়ার তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সপ্তদশ শতাব্দীর জাঁকজমকের সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শিল্পানুরাগ

শাহ্‌জহান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মুম্‌তাজ্‌মহলের সমাধির উপর **তাজ্‌মহল** নামক মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই অত্যাশ্চর্য্য সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল এবং একুশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। মুকরমৎ খাঁ ও মীর আব্দুল করিম নামক দুইজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর তত্ত্বাবধানে তাজ্‌মহল নির্ম্মিত হয়। হিন্দু শিল্পিগণও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। তাজ্‌মহল হিন্দু-পারসিক স্থাপত্যরীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোন যুগে এরূপ মনোহর সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। তাজ্‌মহলের বর্ণনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

তাজমহল

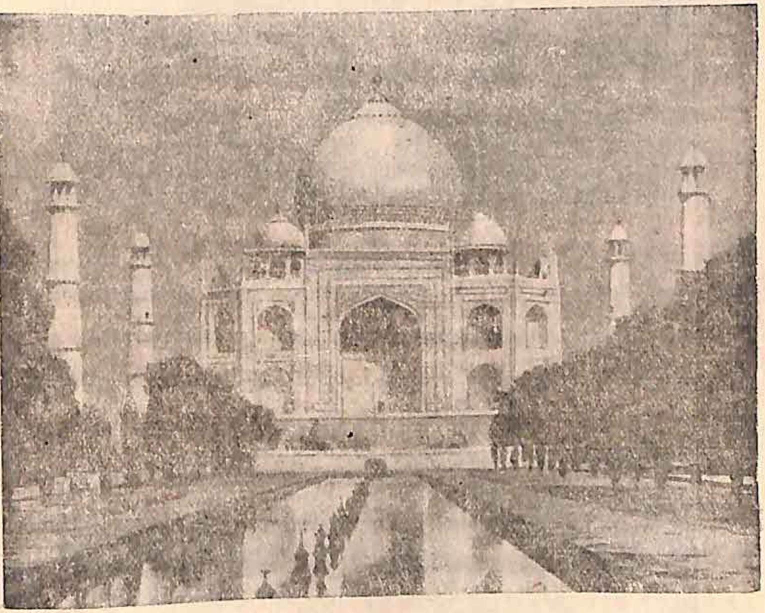
"একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

শাহ্‌জহান দিল্লীর নিকটে এক নূতন নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নাম অনুসারে এই নগর **শাহ্‌জহানাবাদ** আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সম্রাট্ এই নগর বহু মনোরম অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। **দেওয়ান-ই-খাস** এবং **দেওয়ান-ই-আম** নামক প্রসিদ্ধ হর্ম্যদ্বয় এই নগরেই অবস্থিত। দিল্লীর **জাম-ই-মস্‌জিদ** এবং আগ্রার **মোতী মস্‌জিদ** শাহ্‌জহানের শিল্পানুরাগের দুইটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। শাহ্‌জহানের নির্ম্মিত **ময়ূর**

শাহ্‌জহানাবাদ

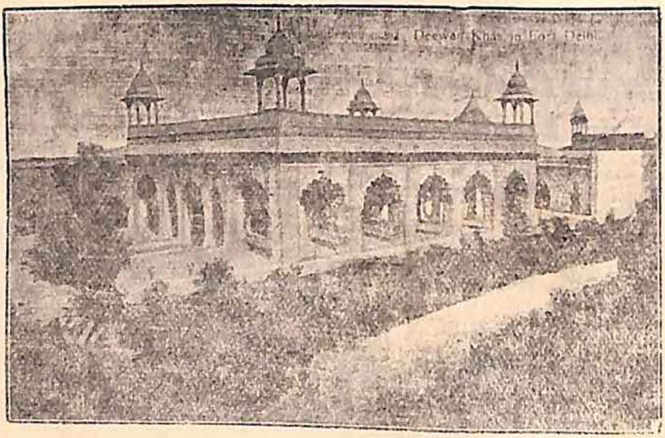
হর্ম্যাদি

ময়ূর সিংহাসন

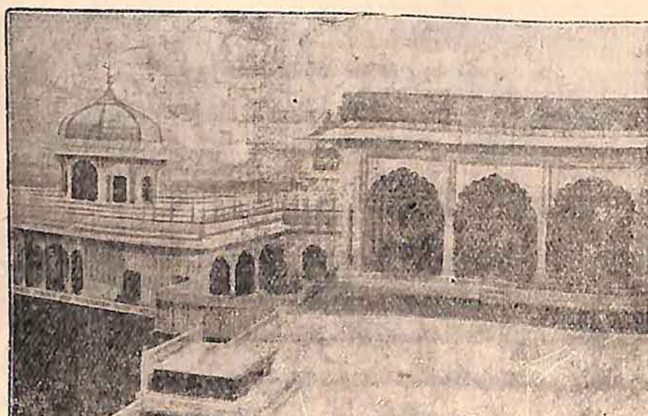


তাজমহল

সিংহাসন পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। সাত বৎসরের পরিশ্রমের ফলে শিল্পী বেবাদল খাঁর তত্ত্বাবধানে এই মণিমাণিক্য-খচিত বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোহিনূর নামক বিখ্যাত মণি শাহ্‌জহানের শিরস্ত্রাণের শোভা বর্দ্ধন করিত। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ দিল্লী লুণ্ঠন করেন; তিনি ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর মণি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।



দেওয়ান-ই-খাস



দেওয়ান-ই-আম

শাহ্‌জহানের সময়ে **চিত্র-শিল্পের** বিশেষ **উন্নতি** সাধিত হয়। তাঁহার আমলের অনেক হস্তলিখিত ফার্‌সি পুঁথি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল পুঁথিতে বহু সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।* চিত্রবিদ্যা

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি এবং পতনের সূত্রপাত—কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা কঠিন। সত্য বটে, শাহ্‌জহানের সময়ে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ অথবা বৈদেশিক আক্রমণে সাম্রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট হয় নাই; কিন্তু তাঁহার রাজত্ব কালেই কান্দাহারে মুঘল বাহিনীর অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। শাহ্‌জহানের ঐশ্বর্য্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে; কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকগণ করভারে উৎপীড়িত ছিল। বার্নিয়ার বলিয়াছিলেন যে, সম্রাটের দরবার এবং সৈন্যদল পোষণ করিবার জন্য কৃষকগণকে অনশনে বা অর্দ্ধানশনে দিন যাপন করিতে হইত। সম্রাট্‌ স্বয়ং সুবিচারক হইয়াও প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণের অত্যাচার দমন করিতে পারিতেন না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিতেছিল। শাহ্‌জহানের ধর্ম্মনীতি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিয়া এবং মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তিনি ঔরংজীবের অনুদার নীতির সূচনা করিয়াছিলেন। আকবরের উদার ধর্ম্ম নীতি পরিত্যাগ করিয়া শাহ্‌জহান রাজনৈতিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই। পতনের সূত্রপাত

---

* এই পুস্তকের ১৮৬, ১৮৯, ১৯১, ১৯৯, এবং ২১৭ পৃষ্ঠায় যে সকল চিত্র আছে তাহা ঐরূপ একখানি পু থি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭)

আসাম অভিযান	...	১৬৬১-৬৩
চট্টগ্রাম জয়	...	১৬৬৬
তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ড	...	১৬৭৫
মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ	...	১৬৬০-১৭০৭
রাজপুতাদিগের সহিত যুদ্ধ	...	১৬৭৯-১৭১০
বিজাপুর জয়	...	১৬৮৬
গোলকুণ্ডা জয়	...	১৬৮৭

চরিত্র—ঔরংজীব প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফ্‌গানিস্থানের কিয়দংশব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। পিতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিন্দার্হ সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যুগে তৈমুরবংশীয় সম্রাট্‌গণের পক্ষে তদ্রূপ নিষ্ঠুর আচরণ তেমন অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না। ঔরংজীবের চরিত্রে বহু রাজোচিত গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সাহস ও বুদ্ধি অসাধারণ ছিল। বিপৎকালে তিনি আত্মহারা হইতেন না। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। পাণ্ডিত্য তিনি স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহী ছিলেন। তিনি সযত্নে বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে তিনি আরবি ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আইনবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তিনি তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহার উৎসাহে 'ফতোয়া-ই-আলমগীর' নামক বিখ্যাত আইনগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য মুসলমান রাজগণের ন্যায় ঔরংজীব বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার আহার্য্য ও পরিচ্ছদ নিতান্ত সাধারণ ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারিতেন। নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠা ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে তিনি কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন

করেন নাই। তিনি স্বহস্তে 'কুর্-আন' নকল করিতেন। মুসলমানেরা ঔরংজীবকে জীবন্ত পীর ('জিন্দা পীর') বলিয়া মনে করিত এবং তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করিত। ইউরোপীয় পরিব্রাজক মানুসি লিখিয়াছেন যে, বন্যার সময় সম্রাট্ স্বয়ং কাগজে কয়েকটি মন্ত্র লিখিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন এবং মনে করিতেন যে, উহাতে বন্যা প্রশমিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে ঔরংজীব সাহস, বিদ্যা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট্‌রূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দুইটি প্রধান ত্রুটি ছিল। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; সকল কার্য্যই তিনি নিজে করিতে চেষ্টা করিতেন। এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার এক ব্যক্তির পক্ষে বহন করা সম্ভব নহে। সম্রাট্ এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া মন্ত্রিগণের দায়িত্ববোধ ক্ষুণ্ণ করিলেন। ফলে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোন বংশধর বা মন্ত্রীর আর বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা রহিল না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মবিষয়ক উদারতার অভাবে ঔরংজীব হিন্দু জাতির বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। রাজপুত, মরাঠা, শিখ্, জাঠ প্রভৃতি জাতির বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হইল। ভারতবর্ষে হিন্দুর সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না, এই সহজ সত্যটি বুঝিতে না পারিয়া ঔরংজীব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

অবিশ্বাসমূলক শাসননীতি

অনুদার ধর্ম্মনীতি

সাম্রাজ্য বিস্তার—ঔরংজীব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে মুঘল সাম্রাজ্য সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এবং পূর্ব্বদিকে আসামের পূর্ব্বাংশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সিংহাসনের কণ্টকসমূহ নির্ম্মূল করিয়াই ঔরংজীব রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

কোচবিহার ও আসাম অভিযান—ঔরংজীবের বিশ্বস্ত সেনাপতি **মীর জুমলা** বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার

ও আসাম জয় করিতে যাত্রা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শাহ্‌জহানের পীড়ার সময় তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ পাইয়া আহোমেরা মুঘল-শাসনাধীন গৌহাটী অধিকার করিয়াছিল; কোচগণও মুঘল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মীর জুম্‌লা কোচবিহারের রাজধানী

গড়গাঁও হস্তগত করিয়া আসামের রাজধানী গড়গাঁও অধিকার করেন (১৬৬২)। আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ দান করেন। কিন্তু বর্ষার প্রকোপে ও মড়কে মুঘলবাহিনী ধ্বংসপ্রায় হইল; মীর জুম্‌লা স্বয়ং ঢাকা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৬৬৩)।

কোচবিহার কোচবিহারের রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল শাসনাধীন হয়। ইহাই মীর জুম্‌লার অভিযানের স্থায়ী ফল। কারণ চারি বৎসর পর আহোমেরা পুনরায় গৌহাটী অধিকার করে।

চট্টগ্রাম অভিযান—মীর জুম্‌লার মৃত্যুর পর **শায়েস্তা খাঁ** বাংলার কর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচার হইতে দক্ষিণ-বাংলা রক্ষা করেন এবং আরাকানরাজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া

মগ অত্যাচার দমন

সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৫-৬৬)। ইতিপূর্ব্বে মগেরা বারবার বরিশাল, নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলা লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে বহু লোককে বন্দী করিয়া আরাকানে দাসরূপে বিক্রয় করিত। শায়েস্তা খাঁর সুব্যবস্থার ফলে তাহারা আর এরূপ ভয়াবহ অত্যাচার করিতে পারে নাই। শায়েস্তা খাঁ প্রায় ১৩ বৎসর বাংলা দেশ শাসন করেন। কথিত আছে, তাহার সময়ে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। তখন ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসিগণ প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া মুঘল বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিত। এই সকল বিদ্রোহের ফলে ঔরংজীব মরাঠা নেতা শিবাজীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে

য়ুসুফজাই ও আফ্রিদি বিদ্রোহ

শক্তি নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে য়ুসুফ্‌জাঈ জাতি সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের কৃষকগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ

করে। তাহাদিগকে দমন করিবার পর আফ্রিদিগণ বিদ্রোহী হয় এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে। এই বিদ্রোহ দমিত হইবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। অবশেষে দলপতিগণকে উৎকোচ দ্বারা বাধ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রোহ হইতে বিরত করা হয়।

ঔরংজীবের ধর্ম্মনীতি—মুসলমান রাজগণের মধ্যে শের শাহ্ই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদিগকে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন। মহামতি সম্রাট্ আক্‌বর এই নীতির অনুসরণ করিয়া উদারতার দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের সময়েই এই উদারতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঔরংজীবের অনুদারতার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়।

ঔরঙ্গীব সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠার ফল রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইত না, তাহাদিগকে তিনি করভারে প্রপীড়িত করিতেন। হিন্দুদিগকে অতিরিক্ত হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হইত। হিন্দুরা যাহাতে কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে না পারে, সেজন্য মেলা ও উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সম্রাটের আদেশে বহু দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইল; বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথের মন্দির এবং মথুরার কেশবের মন্দির প্রভৃতিও রক্ষা পাইল না। হিন্দুরা নূতন কোন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। হিন্দুদিগকে প্রায় সমুদয় রাজকার্য্য হইতে বর্‌খাস্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর পুনরায় স্থাপিত হয়। শিবাজী (মতান্তরে মেবাড়ের রাণা রাজসিংহ) এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া সম্রাটের নিকট এক পত্র লিখিলেন; কিন্তু উহাতে কোন ফল হইল না। রাজপুত ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুর পক্ষে পাল্কী, হস্তী বা অশ্বে আরোহণ এবং অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হইল।

হিন্দু পীড়ন

জিজিয়া

এই নীতির ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। উত্তর-ভারতে শিখ ও জাঠ জাতি বিদ্রোহী হইল। যে রাজপুতগণ আকবরের সময়ে সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল তাহারা ঔরংজীবের পরম শত্রুতে পরিণত হইল। দাক্ষিণাত্যে নবজাগ্রত মরাঠা জাতি ক্রমশঃ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্রোহ দমনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে ঔরংজীব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।

জাঠদিগের বিদ্রোহ—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মথুরার নিকটবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী জাঠগণ বিদ্রোহী হয়। তাহাদিগকে দমন করিতে ঔরংজীবের বহু সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে জাঠগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঔরংজীব তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াও সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাঠগণ এক পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ—বুন্দেলা-রাজ **চম্পৎ রায়** ঔরংজীবের রাজত্বের প্রারম্ভে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে আত্মহত্যা করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হয় (১৬৬১)। তাঁহার পুত্র **ছত্রসাল** শিবাজীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

সৎনামী বিদ্রোহ—সৎনামী নামে পরিচিত এক হিন্দু সম্প্রদায় দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস করিত। জনৈক সরকারী পেয়াদার সঙ্গে ঝগড়া উপলক্ষ করিয়া সৎনামী কৃষকগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাহাদিগকে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করা হইয়াছিল (১৬৭২)।

শিখ সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন—সপ্তদশ শতাব্দীতে শিখ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল এবং ক্রমশঃ মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইয়াছিল। ঔরংজীবের ধর্ম্মনীতির প্রতিবাদ করিবার অপরাধে গুরু **তেগ বাহাদুর** বন্দী হন। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রাণদান করা হইবে, ঔরংজীব তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস দেন। সাহসী শিখগুরু শির রক্ষার জন্য ধর্ম্মের সার বিসর্জ্জন দিতে

গুরু তেগবহাদুরের প্রাণদণ্ড

স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল (১৬৭৫)। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শিখগণ অতঃপর সুযোগ পাইলেই মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

শিবাজীর সহিত সংঘর্ষ—ঔরংজীবের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই মরাঠা জাতির নেতা শিবাজী দাক্ষিণাত্যে শক্তি সঞ্চয় করিতে-ছিলেন। ঔরংজীবের আদেশে দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্ত্তা **শায়েস্তা খাঁ** শিবাজীকে দমন করিতে অগ্রসর হন এবং পুণা শহর ও কল্যাণ প্রদেশ হইতে মরাঠাদিগকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজী কৌশলে শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করেন এবং পর বৎসর **সুরত বন্দর লুণ্ঠন** করেন। অতঃপর ঔরংজীব অম্বর-রাজ **জয়সিংহ** এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবার শিবাজী পরাজিত হইলেন এবং **পুরন্দরের সন্ধি** (১৬৬৫) দ্বারা তদধিকৃত বহু দুর্গ মুঘলদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রায় গমন করেন (১৬৬৬)। সেখানে সম্রাটের কৌশলে তিনি নজরবন্দী হন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শিবাজী চাতুর্য্যপ্রভাবে প্রহরীদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করেন। দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা তিনি যে সকল দুর্গ মুঘলদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুনরায় উদ্ধার করিলেন। সুরত বন্দর পুনরায় লুণ্ঠিত হইল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ছত্রপতি' অর্থাৎ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি তাঁহাকে দমন করিতে পারিল না।

শায়েস্তা খাঁর পরাজয়

পুরন্দরের সন্ধি

শিবাজীর সাফল্য

রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধ—ঔরংজীবের সন্ধিগ্ধচিত্ততা এবং অনুদার ধর্ম্মনীতির ফলে রাজপুতানায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে মারবাড়রাজ যশোবন্তসিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জমরুদ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি শাহ্‌জহান ও ঔরংজীবের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতিরূপে বহুদিন কার্য্য করেন; কিন্তু ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দারার পক্ষ সমর্থন করিয়া ঔরংজীবের

মাড়বার

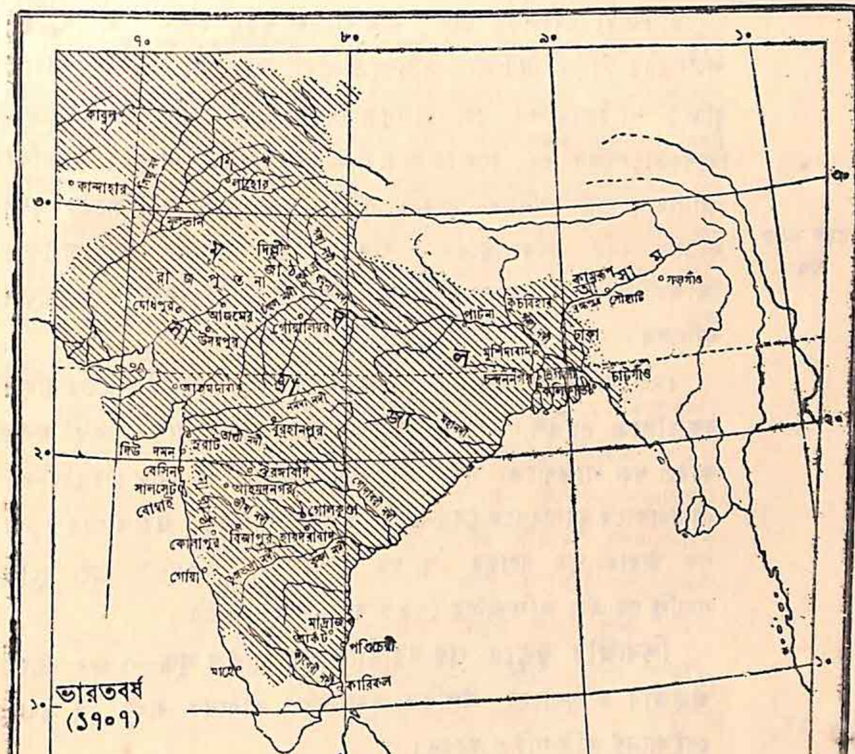
বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যশোবন্তসিংহের শিশুপুত্র **অজিত সিংহ** দিল্লীতে আনীত হইলে, ঔরংজীব বলিলেন যে, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন না। যশোবন্তসিংহের দুর্দ্ধর্ষ রাঠোর অনুচরগণ রাজকুলের ধর্ম্ম ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে রাঠোড় বীর **দুর্গাদাসের** বীরত্ব ও কৌশলে অজিতসিংহ সম্রাটের কবল হইতে রক্ষা পান এবং বহুকষ্টে মারবাড়ে উপস্থিত হন।

মেবাড়পতি রাজসিংহ

যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঔরংজীব মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত যোধপুর প্রভৃতি প্রধান নগরগুলি অধিকার করিয়াছিলেন (১৬৭৯)। বহু মন্দির ধ্বংস হইল এবং মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল। রাঠোড়গণ তখন মেবাড়ের রাণা **রাজসিংহ** নামক মহাবীরের সাহায্য প্রার্থনা করিল। অজিতসিংহের মাতা মেবাড় রাজবংশের কন্যা ছিলেন। ঔরংজীব হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করায় রাজসিংহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সহজেই অজিতসিংহের পক্ষ সমর্থন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন (১৬৭৯)। মুঘল সৈন্য মেবাড়ের সমতল প্রদেশ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিল; রাজসিংহ পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করা সম্রাটের সৈন্যদিগের পক্ষে কঠিন হইল।

সম্রাটপুত্র আকবরের বিদ্রোহ

ঔরংজীব স্বীয় পুত্র আকবরকে রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজপুতদিগের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিতে পারিবেন মনে করিয়া আকবর ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। **আকবরের বিদ্রোহ** ঔরংজীবের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইল; কারণ রাজপুতগণ আকবরকে সাহায্য করিতেছিল। সম্রাট্ স্বয়ং রাজপুতানায় উপস্থিত হইয়া কৌশলে আকবরের বিরুদ্ধে রাজপুতদিগের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিলেন। রাজপুতগণ আকবরের পক্ষ পরিত্যাগ করিল। আকবর নিরুপায় হইয়া রাঠোড় বীর দুর্গাদাসের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন এবং মরাঠারাজ (শিবাজীর পুত্র) শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ঔরংজীব স্বয়ং



ঔরংজীবের মৃত্যুকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা এই মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। আসামে ঔরংজীব স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই (২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয় (২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আহমদনগর শাহ্‌জহানের সময় অধিকৃত হইয়াছিল (২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ প্রকৃত পক্ষে মরাঠাগণের অধীন ছিল (২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া আকবরকে বিতাড়িত করেন। আকবর জলপথে পারস্যদেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সেখানে বহু বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭০৪)।

মেবাড়ের সহিত সন্ধি

ইতিমধ্যে মেবাড়ের রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র জয়সিংহের সহিত ঔরংজীব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৬৮১)। সমাট্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজপুতদিগকে দমন করা সহজ নহে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী মরাঠাদিগের সাহায্যে আকবর নানাবিধ গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন জানিয়া তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে রাণা জয়সিংহ জিজিয়া করের পরিবর্ত্তে সমাট্‌কে স্বীয় রাজ্যের একটি অংশ প্রদান করিলেন।

মেবাড়ের সহিত ঔরংজীবের সন্ধি হইল বটে, কিন্তু মারবাড়ের সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সমাট্ সেনাপতিগণের উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোড়গণ নানাপ্রকারে মুঘলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বহাদুর শাহের রাজত্বকালে (১৭১০) এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং অজিতসিংহ পৈতৃক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ—১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন এবং জীবনের বাকী ২৫ বৎসর সেইখানেই অতিবাহিত করেন।

শম্ভুজী

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **শম্ভুজী** মরাঠারাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী আকবরকে আশ্রয় দিয়া তিনি ঔরংজীবের বিশেষ বিরাগভাজন হন। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৬৮৯)। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা **রাজারাম** মরাঠা সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অধীন কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ মরাঠা সেনানায়ক নানাপ্রকারে মুঘলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার তেজস্বিনী পত্নী **তারাবাঈ** স্বীয় পুত্র **তৃতীয় শিবাজীকে** রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া

মরাঠাদিগের সাফল্য

স্বয়ং মরাঠারাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মরাঠারা ক্রমশঃ বেরার, মালব ও গুজরাত লুণ্ঠন করেন। ঔরংজীবের বিশালবাহিনী মরাঠাদিগকে দমন করিতে পারে নাই।

বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডা জয়—শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে ঔরংজীব বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডা রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া তিনি এই দুইটি রাজ্য জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বহুদিনব্যাপী কুশাসন ও রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্রের ফলে বিজাপুর ও গোল্‌কুণ্ডা রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর এবং পর বৎসর গোল্‌কুণ্ডা অধিকৃত হইল। আদিলশাহী ও কুতুব্‌শাহী বংশ বিলুপ্ত হইল। মুঘল সাম্রাজ্য তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

শেষ জীবন—ঔরংজীবের শেষ জীবন নিতান্ত দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মুহম্মদ এবং আক্‌বর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অপর দুই পুত্র—শাহ্‌আলম ও কামবক্স্‌—গোপনে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঔরংজীবের জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার পুত্রগণ অস্ত্রের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তি তুচ্ছ করিয়া মরাঠাগণ ক্রমশঃ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছিল। সম্রাট্‌ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যের পতনের আর বিলম্ব নাই। তথাপি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু

আকবর ও ঔরংজীবের মধ্যে তুলনা—ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণের মধ্যে আক্‌বর এবং ঔরংজীব উভয়েই অতি উচ্চ আসন লাভের যোগ্য। উভয়েই সাহসী, রণকুশল, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান্‌ এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন। আক্‌বর নিরক্ষর হইয়াও জ্ঞানলিপ্সু এবং পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঔরংজীব স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আক্‌বর উদার মতাবলম্বী এবং পরমতসহিষ্ণু ছিলেন; কিন্তু ঔরংজীব ইস্‌লাম ধর্ম্মে ভক্তিমান্‌ এবং পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন। ধর্ম্মমতের এই পার্থক্য উভয়ের রাজনীতিতেও ধর্ম্মনীতিগত পার্থক্য

প্রতিফলিত হইয়াছিল। আকবর হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধানে তাহাদের সহকারিতা লাভ করিয়াছিলেন; ঔরংজীব হিন্দুগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া এবং তাহাদিগকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। চরিত্র-গৌরবে ঔরংজীব আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি আকবরের ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

হিন্দুর প্রতি ব্যবহারে পার্থক্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—মরাঠা জাতির অভ্যুদয়

মরাঠা জাতি—বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোঙ্কণ অঞ্চল এবং নাসিক, পুণা, সাতারা, আহ্‌মদনগর ও শোলাপুর এবং হায়দারাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদ জেলায় মরাঠাগণ বাস করিত। মহারাষ্ট্র প্রদেশ নিতান্ত পর্ব্বতসঙ্কুল—পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণীর নানা শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিভক্ত। এই প্রদেশের অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই যুদ্ধপ্রিয় এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহারা নামে আহ্‌মদনগর ও বিজাপুর রাজ্যের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ প্রায় স্বাধীন ভাবেই বাস করিত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারকের চেষ্টায় তাহাদের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। মরাঠা নায়কদিগের মধ্যে অনেকেই বিজাপুর বা আহ্‌মদনগরের সুলতান-গণের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অর্থ, সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। মরাঠা জাতির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে শিবাজীর আবির্ভাব হয়।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য

শিবাজী

জন্ম	...	১৬২৭ বা ১৬৩০
তোর্ণা অধিকার	...	১৬৪৬
জাউলী অধিকার	...	১৬৫৬
আফ্‌জল খাঁর মৃত্যু	...	১৬৫৯
শায়েস্তা খাঁর সহিত যুদ্ধ	...	১৬৬০-৬৩
সুরত লুণ্ঠন	...	১৬৬৪, ১৬৭০
পুরন্দরের সন্ধি	...	১৬৬৫
আগ্রায় গমন	...	১৬৬৬
'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ	...	১৬৭৪
মৃত্যু	...	১৬৮০

বাল্য জীবন—১৬২৭ অথবা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের নামক গিরিদুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা **শাহ্‌জী** প্রথমে আহ্‌মদনগরের স্থল্‌তানের অধীনে ক্ষমতাশালী জায়গীর-দার ছিলেন। আহ্‌মদনগর রাজ্য শাহ্‌জহান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে তিনি বিজাপুরের স্থল্‌তানের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন (১৬৩৬)। শাহ্‌জী পূর্ব্বে আহ্‌মদনগর সরকার হইতে পুণা জেলায় এক বিস্তৃত



শিবাজী

(শিবাজীর মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

জায়গীর পাইয়াছিলেন; পরে বিজাপুরের স্থল্‌তান তাঁহাকে কর্ণাটকে অপর একটি জায়গীর প্রদান করেন। শাহ্‌জী স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে লইয়া কর্ণাটকে বাস করিতেন। শিবাজী তাঁহার মাতার সহিত **দাদাজী কোন্দদেব** নামক এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর অভিভাবকত্বে পুণায় বাস করিতেন। শিবাজীর বাল্য ও কৈশোরে এই ব্রাহ্মণই তাঁহার

দাদাজী কোন্দদেব

শিক্ষাদাতা ছিলেন। বাল্যজীবনে শিবাজী কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সাহস এবং অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। বাল্যকালেই তিনি অস্ত্রচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিশালী মাওলীজাতীয় কৃষকদিগকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়া তিনি নানারূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে রত হইতেন। মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন এবং হিন্দু জাতির পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধার—ইহাই ক্রমশঃ তাঁহার জীবনের আদর্শরূপে পরিণত হইল।

শিবাজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ক্ষমতাবৃদ্ধি—যত দিন দাদাজী কোন্দদেব জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি শিবাজীর দুঃসাহসিক কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর (১৬৪৭) এই বীর যুবক স্বাধীনভাবে ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে (১৬৪৬) তিনি কৌশলে বিজাপুরের অধীন **তোর্ণা** দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ছলে, বলে ও কৌশলে আরও কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিলেন এবং কয়েকটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিজাপুরের সুল্‌তান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শিবাজী প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্ত্তা, সম্রাট্ শাহ্‌জহানের পুত্র মুরাদের সাহায্যে পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কিছুদিন পরে বিজাপুরের কয়েকজন মুসলমান ওম্‌রাহের অনুরোধে বিজাপুরের সুল্‌তান শাহ্‌জীকে কারামুক্ত করেন (১৬৪৯)। তখন শিবাজী পুনরায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জনৈক মরাঠা সর্দ্দারের অধীন সাতারা জেলার অন্তর্গত **জাউলী** নামক রাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর আরও কয়েকটি দুর্গ হস্তগত হয়।

তোর্ণা

জাউলী অধীকার

বিজাপুরের সহিত সংঘর্ষ—শিবাজীর ক্ষমতা ক্রমশঃ এত বাড়িতেছিল যে, বিজাপুরের সুল্‌তান তাঁহাকে আর উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সেনাপতি **আফ্‌জল খাঁ** সসৈন্যে তাঁহাকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর সেনানীগণ আফ্‌জল খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করাই সঙ্গত মনে করিলেন; কারণ সম্মুখ যুদ্ধে

আফ্জল খাঁকে পরাজিত করা মরাঠাদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিবাজী তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে আফ্জল খাঁ সন্ধির সর্ত্ত আলোচনা করিবার জন্য শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিবাজী সম্মত হইয়া মাত্র তিনজন অনুচর সহ আফ্জল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ গুপ্তভাবে নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিল। সাক্ষাৎকালে আফ্জল খাঁ কৌশলে ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজী এরূপ অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিতে 'বাঘনখ' নামক লৌহ-নির্ম্মিত কৃত্রিম নখ ছিল। তিনি উহার সাহায্যে আফ্জল খাঁকে হত্যা করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুরের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; মরাঠীগণ সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত করিল। ইহার পর বিজাপুরের সৈন্য পুনরায় শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু শিবাজী যে কেবল আত্মরক্ষা করিলেন তাহা নহে; বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল।

আফ্জল খাঁ

শিবাজীর সাফল্য।

ঔরংজীবের সহিত সংঘর্ষ—বিজাপুরের আক্রমণ রোধ করিয়াও শিবাজী নিরাপদ হইতে পারিলেন না; বরঞ্চ তিনি আরও অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইলেন। ঔরজীব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা, তখনই শিবাজীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সিংহাসন লাভ করিয়া ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা **শায়েস্তা খাঁ** নামক সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৬৬০)। শায়েস্তা খাঁ পুণা অধিকার করিলেন এবং কোঙ্কণের উত্তরাংশ হইতে মরাঠাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজী এক আকস্মিক নৈশ আক্রমণে পুণা উদ্ধার করেন। শায়েস্তা খাঁর এক পুত্র নিহত হইল। তিনি স্বয়ং এক অঙ্গুলি হারাইয়া কোনমতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভের ফলে, শিবাজীর ক্ষমতা ও খ্যাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি মুঘলদিগের অধিকারভুক্ত **সুরত বন্দর লুণ্ঠন** করিয়া প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করিলেন (১৬৬৪)।

শায়েস্তা খাঁর পরাজয়

সুরত লুণ্ঠন

শিবাজীকে দমন করা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া ঔরংজীব অতঃপর অম্বররাজ **জয়সিংহ** ও বিখ্যাত সেনাপতি দিলীর খাঁকে সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন (১৬৬৪)। এবার শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে **পুরন্দরের সন্ধি** অনুসারে শিবাজী মাত্র দ্বাদশটি দুর্গ নিজের হাতে রাখিয়া অন্যান্য সমস্ত দুর্গ মুঘলদিগকে সমর্পণ করেন। ইহার পর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে তাঁহার সহায়তা করেন।

জয়সিংহ

পুরন্দরের সন্ধি

অতঃপর জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য **আগ্রায় গমন** করিলেন (১৬৬৮)। রাজদরবারে আশানুরূপ সম্মান প্রাপ্ত না হইয়া তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তখন ঔরংজীব তাঁহাকে নজরবন্দী করেন। এই বিপদেও শিবাজী হতাশ হইলেন না। বিনা কৌশলে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। কিছুদিন পরে শিবাজী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আগ্রার ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং ওমরাহগণকে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করিয়া দ্বাররক্ষকগণের সন্দেহ দূর হইল। অকস্মাৎ একদিন শিবাজী একটি ঝুড়িতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

শিবাজীর আগ্রা গমন

শিবাজীর বন্দিত্ব ও মুক্তিলাভ

ছদ্মবেশে বহু হিন্দুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শিবাজী স্বরাজ্যে উপস্থিত হন। সেখানে প্রায় তিন বৎসর কাল তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত রহিলেন। এই সময়ে তিনি ঔরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মুঘলদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিবাজী পুনর্ব্বার **সুরত লুণ্ঠন** করিলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে শিবাজী আবার বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে তাঁহার **রাজ্যাভিষেক** কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তিনি 'ছত্রপতি' এবং 'গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক' উপাধি ধারণ করেন।

শিবাজীর অভিষেক

শেষ জীবন—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় ঔরংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে মুঘল সৈন্যদলের একাংশ তথায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। ইহাতে শিবাজীর খুব সুবিধা হইল। তিনি ছলে, বলে ও কৌশলে বারবার মুঘলদিগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। ১৬৭৭

খৃষ্টাব্দে শিবাজী গোলকুণ্ডার সুল্‌তানের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত কর্ণাটক প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং জিঞ্জি, বেলুর প্রভৃতি বহু দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর মহিশূরের কিয়দংশ তাঁহার হস্তগত হয়। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অধিকার উত্তরে সুরতের নিকটস্থ ধরমপুর রাজ্য হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলার অন্তর্গত কারওয়ার, এবং কোহ্লাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কয়েকটি জেলা, কর্ণাটকের এক অংশ এবং মহিষুর রাজ্যর উত্তর পূর্ব্ব অংশও তাঁহার রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিবাজীর রাজ্য।

চরিত্র—ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণে শিবাজীর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া প্রতিভাবলে তিনি পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাট্‌কে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় মরাঠা জাতির প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। শিবাজী অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ না হইলে এইরূপ অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আদর্শচরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন না। মস্‌জিদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি নিষ্কর জমি দান করিতেন। কখনও 'কুর্‌-আন' গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি কোন মুসলমানকে উহা দান করিতেন। যে যুগে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক উদারতার একান্তই অভাব ছিল, সেই যুগে, পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি এরূপ উদারতা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের জন্য শিবাজী সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক এবং হিন্দু স্বাধীনতার প্রতীক ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা

শাসন-প্রণালী—শিবাজী যে কেবল সাহসী যোদ্ধা ছিলেন. তাহা নহে। তিনি রাজ্যশাসনের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় শাসন

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী মরঠা রাজ্যে **রাজা** স্বয়ং সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে কাহারও বাধা প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপার তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত।

পেশবা

আট জন মন্ত্রী বা **প্রধান** শাসনকার্য্যে রাজাকে সাহায্য করিতেন। প্রধান মন্ত্রীর পদবী ছিল মুখ্যপ্রধান বা পেশবা। মন্ত্রিগণের মধ্যে ছয় জন শাসনসংক্রান্ত কার্য্য ব্যতীত সৈন্য পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিতেন, এবং অন্ততঃ তিন জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিতেন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ত্রিশটি বিভিন্ন বিভাগ ছিল। মন্ত্রিগণ এই সকল বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রাদেশিক শাসন

শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। **প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ** রাজা বর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীনে আট জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অপেক্ষা কর্ণাটক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব বেশী ছিল।

সমর বিভাগ

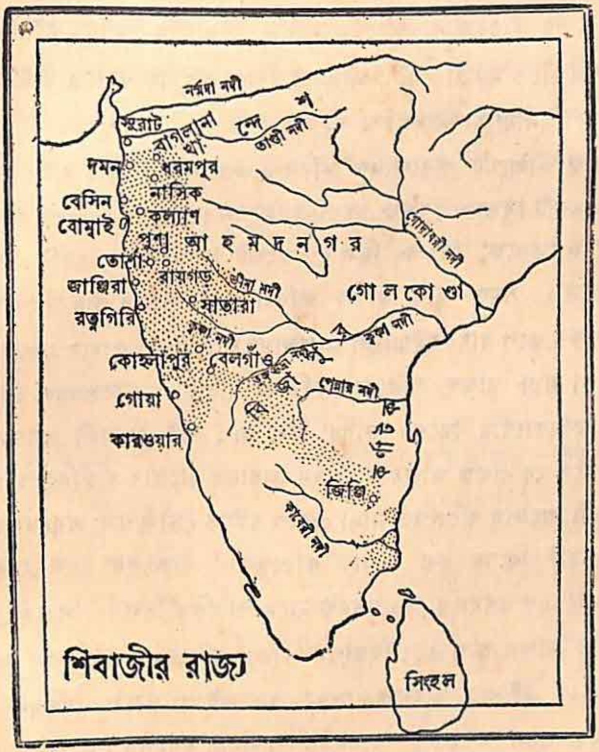
মরাঠা রাজ্য সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং শিবাজী **সামরিক বিভাগ** সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষগণকে জায়গীর না দিয়া নগদ বেতন দিতেন। সৈন্যদলের কর্ত্তা ছিলেন **সেনাপতি**; তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পদমর্য্যাদা অনুসারে সামরিক কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।

বার্গীর ও শিলাদার

সৈন্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—**বার্গীর** ও **শিলাদার**। যাহারা সরকারী তহবিল হইতে নিয়মিতভাবে সাজসজ্জা ও বেতন পাইত, তাহাদিগকে 'বার্গীর' বলা হইত। যাহারা স্বকীয় সাজসজ্জা ও অস্ত্রাদি সহ সৈন্যদলে যোগদান করিত এবং সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় ও বেতন বাবদ নির্দিষ্ট অর্থ পাইত, তাহারা 'শিলাদার' নামে পরিচিত ছিল।

দুর্গ

সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য শিবাজী বিভিন্ন স্থানে বহু **দুর্গ** নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে মোট দুইশত চল্লিশটি দুর্গ ছিল। তাঁহার সময়ে **সৈন্যদলে কঠোর শাসন** প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় মুঘল শিবিরে বহু স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকিত; কিন্তু শিবাজী স্বীয় সৈন্যদলকে এই কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ



শিবাজীর অধিকার উত্তরে সুরতের নিকটস্থ ধরমপুর রাজ্য হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলার অন্তর্গত কারওয়ার, এবং পূর্ব্বে বাগলানা হইতে কোহ্লাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র পশ্চিম উপকূলের মধ্যে কেবলমাত্র পর্ত্তুগীজগণের অধিকৃত দমন, সলসেট, বেসিন, চৌল ও গোয়া তাঁহার হস্তগত হয় নাই। বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কয়েকটি জেলা, কর্ণাটকের এক অংশ এবং মহিসুর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।

করিতে দেন নাই। শিবাজী বহু **যুদ্ধ জাহাজ** নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বোম্বাইর দক্ষিণে অবস্থিত জাঞ্জিরা দ্বীপের সিদ্দি বা আবিসিনীয়গণের সহিত এবং সুরতের ইংরেজ বণিক্‌গণের সহিত শিবাজীর নৌযুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতব্দীতে মরাঠা নৌ-সেনাদল ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিসমূহের নৌবাহিনীর সমকক্ষ হইয়াছিল।

নৌবল

রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য শিবাজী স্বীয় রাজ্য 'প্রান্ত' নামক কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করাইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রান্ত কয়েকটি 'পরগণা' ও 'তরফে' বিভক্ত ছিল। কয়েটি গ্রাম লইয়া একটি 'তরফ' গঠিত হইত। সমস্ত জমি জরিপ করিয়া উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজকর রূপে ধার্য্য হইয়াছিল। প্রজাগণ শস্য অথবা তাহার মূল্য স্বরূপ নগদ টাকা দ্বারা রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত। পর্ব্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা ছিল না; তাই শিবাজী কৃষকগণের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় করিতেন তাহাতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। তিনি রাজ্যের বহিঃস্থিত নানা প্রদেশ হইতে **চৌথ** এবং **সরদেশমুখী** নামক দুইটি বিশেষ কর আদায় করিতেন। রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ চৌথ, এবং এক-দশমাংশ সরদেশমুখী নামে পরিচিত ছিল। শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশ এবং বিজাপুর রাজ্য হইতে এই দুইটি কর আদায় করিতেন। এই কর তাঁহাকে দেওয়া না হইলে মরাঠা সৈন্যগণ উক্ত অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিত। রামনগর (বর্ত্তমান ধরমপুর) রাজ্যের রাজা পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইত চৌথ আদায় করিতেন; সম্ভবতঃ শিবাজী ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে মহারাষ্ট্র প্রদেশের 'সর্‌দেশমুখ' বা প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া দাবি করিতেন, এইজন্য তিনি ঐ কর্ম্মচারীর প্রাপ্য রাজস্বের দশমাংশ (সর্‌দেশমুখী) আদায় করিতেন। চৌথ ও সরদেশমুখী হইতে মরাঠা রাজ্যের প্রভূত আয় হইত।

রাজস্ব বিভাগ

চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ (১৬৮৯-১৭৪৮)

শম্ভূজী—(১৬৮০-৮৯) শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভূজী মরাঠা-রাজ্যের রাজা হন। তিনি সাহসী হইলেও নিতান্ত দুশ্চরিত্র

ছিলেন। তাঁহার সময়ে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগে মরাঠা রাজ্যের শক্তিক্ষয় হয়। তিনি ঔরংজীবের বিদ্রোহী পুত্র আক্‌বরকে আশ্রয় দান করিয়া সম্রাটের বিশেষ বিরাগভাজন হন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব স্বয়ং সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর শম্ভূজী মুঘল সৈন্য কর্তৃক ধৃত হন। ঔরংজীবের আদেশে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তাঁহার নাবালক পুত্র সাহূ ঔরংজীব কর্তৃক বন্দিভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মৃত্যু ১৬৮৯

শিবাজীর বংশধরগণ :—

(১) প্রথম শিবাজী
(মৃত্যু ১৬-০)

(২) প্রথম শম্ভূজী (১৬৮০-৮৯)
- (৫) প্রথম সাহূ বা দ্বিতীয় শিবাজী (১৭০৮-৪৯)

তারাবাঈ = (৩) রাজারাম = রাজস্ বাঈ
(১৬৮৯-১৭০০)
- তারাবাঈ → (৪) তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২)
  - (৬) রামরাজা (১৭৪৯-৭৭) (প্রথম সাহূর পোষ্যপুত্র)
    - (৭) দ্বিতীয় সাহূ (১৭৭৭-১৮১০)
      - (৮) প্রতাপসিংহ (১৮১০-৩৯)
      - (৯) শাহ্‌জী (১৮৩৯-৪৮)
- রাজস্ বাঈ → দ্বিতীয় শম্ভূজী [কোহ্লাপুর] (১৭১৪-৬০)

প্রথম সাহূর মৃত্যুর পর শিবাজীর বংশধরগণ প্রকৃতপক্ষে পেশবাদিগের হস্তে বন্দী ছিলেন। তৃতীয় মরাঠা যুদ্ধের পর ইংরেজগণ সাতারার সিংহাসনে শিবাজীর বংশ পুনঃস্থাপিত করে; প্রতাপসিংহ সাতারার রাজা হন। লর্ড ডাল্‌হৌসীর সময় উত্তরাধিকারীর অভাবে সাতারা রাজ্য ইংরেজগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। শিবাজীর বংশধরগণ অদ্যাপি কোহ্লা-পুরে রাজত্ব করিতেছেন।

রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০)—অতঃপর শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম মরাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে **সান্তাজী ঘোড়্‌পাড়ে, ধনাজী যাদব** প্রভৃতি মরাঠা নায়কগণ নানাপ্রকারে ঔরংজীবকে বাতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। ঔরংজীব বহু যুদ্ধ করিয়াও কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিলেন না। মরাঠা অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বেরার, মালব এবং গুজরাত লুণ্ঠিত হইল (১৬৯৯-১৭০৬)। অবশেষে ঔরংজীব ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৭০৭)।

মারাঠাদিগের সাফল্য

তারাবাঈ—১৭০৭ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার তেজস্বিনী পত্নী তারাবাঈ স্বীয় পুত্র **তৃতীয় শিবাজীকে** সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহু (১৭০৮-৪৯)—ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্রাট বহাদুর শাহ্‌ বন্দী সাহুকে মুক্তিপ্রদান করিলে, তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তারাবাঈ তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মরাঠাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাহু জয়লাভ করিয়া সাতরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারাবাঈর বংশধরগণ (তৃতীয় শিবাজী ও রামরাজা) এবং সপত্নী-পুত্র দ্বিতীয় শম্ভূজী কোহ্লাপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে অপুত্রক সাহু তারাবাঈর পৌত্র রামরাজাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

গৃহবিবাদ

সাহু প্রায় ৪১ বৎসরকাল মরাঠা রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পেশবাগণের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল বটে; *কিন্তু নিজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সচেতন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মরাঠা রাজ্যে শিবাজীর বংশধরগণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হয়।

Model Questions

1. Sketch the career of Akbar as (a) a conqueror, and (b) an administrator.

---

* ২৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Describe the extent of Akbar's empire and illustrate your answer by a sketch map.

3. Give an estimate of Akbar's character and his policy towards the Hindus.

4. "Akbar was the real founder of the Mughal empire." Explain.

5. Sketch the leading features of Indian history during the reigns of Jahangir and Shahjahan.

6. "Shahjahan's reign is best known for its pomp and splendour".—Elucidate.

7. Estimate the character of Aurangzeb as a man, a ruler, and a conqueror.

8. Give an account of Aurangzeb's policy towards the Rajputs and the Marathas. What were the consequences of his struggle with these powers?

9. Compare the character of Akbar with that of Aurangzeb. How far Aurangzeb was responsible for the downfall of the Mughal empire?

10. Sketch the career of Sivaji with reference to his struggle with the Musalmans.

11. Give an account of Sivaji's civil and military administration.

অষ্টাদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঔরংজীবের উত্তরাধিকারিগণ

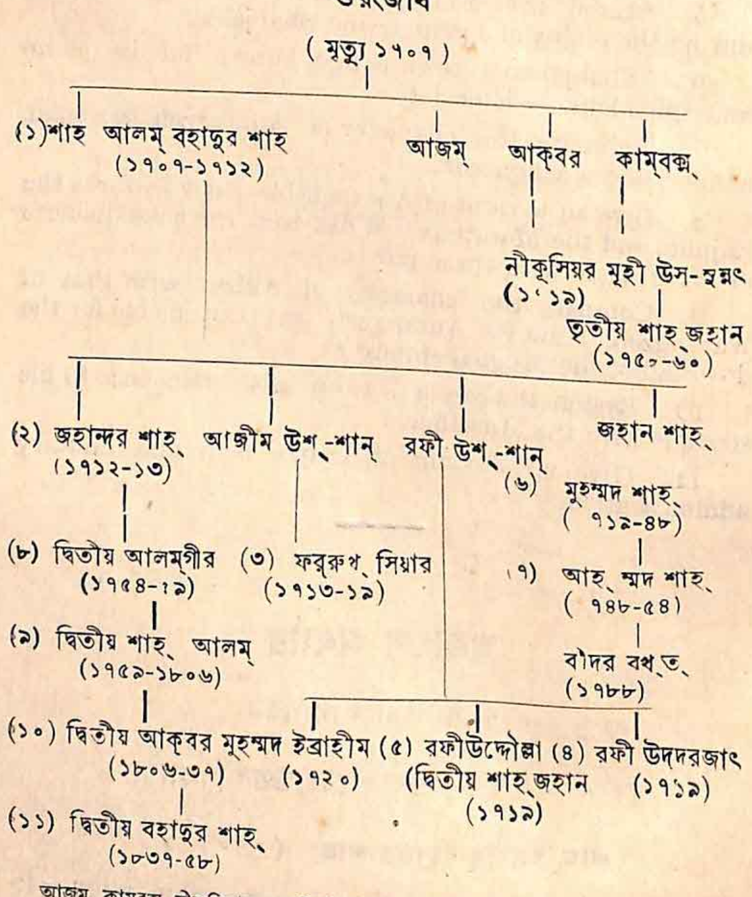
শাহ্ আলম্ বহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১২)

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র—শাহ্ আলম্, আজম্ এবং কামবক্স্ সিংহাসনের জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। আজম্ ও কাম্‌বক্স্‌কে পরাজিত ও নিহত করিয়া শাহ্ আলম্ সিংহাসন অধিকার করেন এবং 'বহাদুর শাহ' নাম গ্রহণ করেন।

রাজপুতগণের সহিত সন্ধি

ঔরংজীব মারবাড়ের রাঠোড়গণের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন (১৬৭৯), তাঁহার মৃত্যুকালেও উহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মারবাড়, মেবাড় ও অম্বরের রাজাগণ সম্মিলিত হইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের

ঔরংজীবের উত্তরাধিকারিগণের বংশলতা—



আজম্, কাম্‌বক্স, নীকূসিয়ার, আজীম্ উশ্ শান্, তৃতীয় শাহ্ জহান, মুহম্মদ ইব্রাহীম, বীদর বখ্‌ত্—ইঁহারা 'সম্রাট্' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসন করেন নাই। আক্‌বর পিতার জীবিতকালে 'সম্রাট্' উপাধি ধারণ করেন ; কিন্তু ঔরংজীবের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (২৩৪ পৃষ্ঠা)। মূহী উস্-সুন্নৎ, রফী-উশ্-শান্, জহান্ শাহ্—ইঁহারা কখনও 'সম্রাট্' উপাধি ধারণ বা রাজ্যশাসন করেন নাই।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বহাদুর শাহ্‌ তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া দীর্ঘকাল পরে রাজপুতানায় শান্তি স্থাপন করিলেন (১৭১০)।

শিখদিগের সহিত বহাদুর শাহের **সংঘর্ষ** উপস্থিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অন্তর্গত সর্‌হিন্দের মুঘল শাসনকর্ত্তা শিখগুরু গোবিন্দসিংহের শিশু পুত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শিখ নেতা **বন্দা** সর্‌হিন্দ লুণ্ঠন করেন। বহাদুর শাহ শিখগণকে পরাজিত করিলেন ; কিন্তু বন্দাকে ধরিতে পারিলেন না। শিখ সংঘর্ষ

জহান্দর শাহ্‌ (১৭১২-১৩)

বহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে পারাজিত করিয়া জহান্দর শাহ্‌ রাজ্য লাভ করেন। তিনি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। প্রায় এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌রুখ্‌ সিয়র কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

ফর্‌রুখ্‌সিয়র (১৭১৩-১৯)

জহান্দর শাহের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌রুখ্‌সিয়র, **সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ** এবং **সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ** নামক দুইজন পরাক্রান্ত ওম্‌রাহের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। নূতন সম্রাটও জহান্দর শাহের ন্যায় দুশ্চরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন ; সুতরাং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই তাঁহার নামে সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ওম্‌রাহগণ তিন দলে বিভক্ত ছিলেন—হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ ভারতবর্ষে যাঁহাদের জন্ম), ইরাণী (পারস্য ও খোরাসান দেশ হইতে আগত) এবং তুরাণী (মধ্য এশিয়া হইতে আগত)। প্রত্যেক দলই সম্রাটের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

ফর্‌রুখ্‌সিয়রের রাজত্বকালে মারবাড়রাজ **অজিতসিংহ** বিদ্রোহী হন ; কিন্তু পরে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সম্রাটের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। শিখগণের নায়ক **বন্দা** ধৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন (১৭১৬)। আগ্রার পশ্চিমে ভরতপুরের জাঠ নায়ক **চূড়ামণ** বিদ্রোহী হইয়া পরে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর রাজ্যভোগ করিবার পর ফর্‌রুখ্‌সিয়র স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া ক্রমান্বয়ে **রফী উদ্‌দরজাৎ** পরবর্ত্তী রাজগণ **ও রফী উদ্দৌলা** (বা **দ্বিতীয় শাহ্‌জহান**) নামক বহাদুর শাহের দুইটি পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই সময় **নাকূসিয়র** নামক ঔরংজীবের এক পৌত্র সিংহাসন দাবি করায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে পরাজিত করেন। রফী উদ্দৌলা অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় **মুহম্মদ শাহ্‌** নামক বহাদুর শাহের অপর এক পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

মুহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-৪৮)

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন—জহান্দর শাহের রাজ্যচ্যুতি (১৭১৩) হইতে ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অন্যান্য বহু ওম্‌রাহ্‌ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। মুহম্মদ শাহ্‌ এই সকল ওমরাহের সাহায্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন। সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হন। সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ তখন প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া **মুহম্মদ ইব্রাহীম** নামে বহাদুর শাহের এক পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরাজিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে কারাগারে তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীনতা—সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হইল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধৃত হইল না। বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইতে লাগিল। ফলে ঔরংজীবের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী **চীন্‌কিলীচ্‌ খাঁ** নিজাম উল্‌ মুলক্‌ **নিজাম্‌ উলমুলক্‌** দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তথায় কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ত্তমান হায়দরাবাদের নিজাম রাজ্যের উৎপত্তি হয়। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা **সাদৎ খাঁ** এবং বাংলার নবাবগণ নামে মাত্র সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার

করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। **রোহিলা** আফ্‌গানগণ আলি মুহম্মদ খাঁ নামক সুদক্ষ নেতার অধীনে বর্ত্তমান রোহিল্‌খণ্ড নামে পরিচিত প্রদেশ অধিকার করিল। শিখ ও জাঠগণের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজপুতেরা কার্য্যতঃ স্বাধীন হইল। মরাঠাগণ গুজরাতে ও মালবে প্রভুত্ব স্থাপন করিল। পেশবা প্রথম বাজীরাও সসৈন্যে দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন (১৭৩৭)।

অযোধ্যা বাংলা

রোহিল্‌খণ্ড

মারাঠা শক্তিবৃদ্ধি

নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯)—মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তিনি বিনা



নাদির শাহ (প্রাচীন চিত্র)

বাধায় গজ্‌নী, কাবুল এবং লাহোর অধিকার করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। তখন সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ ও তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহাকে বাধাপ্রদানের আয়োজন করেন। কিন্তু **কর্ণালের যুদ্ধে** নাদির শাহের

কর্ণালের যুদ্ধ

জয় হইল (১৭৩৯)। তখন নিরুপায় হইয়া মুহম্মদ শাহ্ তাঁহার সহিত দিল্লী অধীকার সন্ধি স্থাপন করিলেন। নাদির শাহ্ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন পরে দিল্লীতে নাদির শাহের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। এবং দিল্লীর নাগরিকগণ প্রায় নয়শত পারসিক সৈন্যকে হত্যা করে। তখন নাদির শাহ্ স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তাহারা লক্ষাধিক ভারতীয়কে হত্যা করিল। দিল্লী শহর লুণ্ঠিত হইল। অবশেষে হত্যা ও লুণ্ঠন মুহম্মদ শাহের অনুনয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্থগিত হয়। নাদির শাহ্ নগদ পনর কোটী টাকা আদায় করিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা মূল্যের মণিমাণিক্য ও বস্ত্রাদি তাঁহার হস্তগত হইল। শাহ্জহানের প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিনূর মণি তিনি আত্মসাৎ করিলেন। মুহম্মদ শাহ্ কাবুল এবং সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী কয়েকটি জেলা নাদির শাহ্কে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কার্য্যসিদ্ধির পর নাদির ভারত ত্যাগ শাহ্ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের মহিমা ও ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইল।

আহ্মদ শাহ্ দুর্‌রানীর প্রথম আক্রমণ—নাদির শাহের মৃত্যুর পর (১৭৪৭) আফ্গানিস্থান তাঁহার আফ্গানজাতীয় সেনানায়ক আহমদ শাহ্ দুর্‌রানীর হস্তগত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করেন; কিন্তু মুঘল সম্রাটের সৈন্যদল তাঁহাকে পরাজিত করে।

আহ্মদ শাহ্ (১৬৪৭-৫৪)

মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহ্মদ শাহ্ দিল্লীর সম্রাট্ হন। **আহ্মদ শাহ্ দুর্‌রানীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণ** (১৭৪৯, ১৭৫১-৫২) তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। ইহার ফলে মুঘল সম্রাট পঞ্জাব প্রদেশ ও মূলতান আহ্মদ শাহ্ দুর্‌রানীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

আহ্মদ শাহের উত্তরাধিকারিগণ (১৭৫৪-১৮৫৮)

সম্রাট্ আহ্মদ শাহের পর চারিজন মুঘল সম্রাট্—**দ্বিতীয় আলমগীর** (১৭৫৪-৫৯), **দ্বিতীয় শাহ্ আলম্** (১৭৫৯-১৮০৬), **দ্বিতীয় আকবর**

(১৮০৬-৩৭) এবং **দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্** (১৮৩৭-৫৮)—সিংহাসন অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না।

দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা **আহ্মদ শাহ্ দুর্‌রানীর চতুর্থ আক্রমণ** (১৭৫৬-৫৭)। এবার তিনি দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করেন নাই। তিনি অযোধ্যার নবাব শুজা উদ্দৌলার সাহায্যে রাজকীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের ভার) প্রদান করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি মরাঠাদিগের আশ্রয়ে দিল্লীতে বাস করিতে থাকেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ইংরেজগণের হস্তগত হয়। অতঃপর মুঘল সম্রাটেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন। **দ্বিতীয় শাহ্ আলম্**

দ্বিতীয় শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্র (দ্বিতীয় আক্‌বর এবং দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্) নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর শেষ সম্রাট্ দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আক্‌বর যে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাই বোধ হয় উহার পতনের প্রধান কারণ। ঔরংজীবের সময়ে এই সাম্রাজ্য পারস্যের সীমা হইতে আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত, এবং কাশ্মীর হইতে মহিসূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সে যুগে যাতায়াত এবং সংবাদ প্রেরণের নানাবিধ অসুবিধা ছিল। একটি কেন্দ্র হইতে এক ব্যক্তির পক্ষে এতবড় সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সম্ভব ছিল না। সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তে **সাম্রাজ্যের বিশালতা**

বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাহার সংবাদ রাজধানীতে পৌছিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। আবার রাজধানী হইতে প্রেরিত সৈন্যদলের বিদ্রোহ-স্থলে উপস্থিত হইতে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিত। ঔরংজীব যতদিন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, ততদিন তিনি উত্তর-ভারতের শাসন-কার্য্যের যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। এজন্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর-ভারতে নানাবিধি অশান্তি ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহ দমনে অসুবিধা

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, মুঘল সম্রাট্-গণের সময়ে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের বিকাশ হয় নাই। মুঘল সাম্রাজ্য সৈন্যবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্মিলিত ভারতীয় জাতির প্রীতির উপর ইহার ভিত্তি স্থাপন হয় নাই। আকবরের উত্তরাধিকারিগণ যদি তাঁহার উদার নীতি অনুসরণ করিতেন, তবে হয়ত ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিগণ পারস্পরিক পার্থক্য ও ঈর্ষ্যা ভুলিয়া এক শক্তিমান্ জাতিতে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু শাহ্‌জহান ও ঔরংজীবের ধর্ম্মনীতি এই পরিণতির পথে অন্তরায় হইল।

অনুদার ধর্ম্মনীতি

হিন্দু শক্তির পুনরুত্থান মুঘল সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। ঔরংজীবের ধর্ম্মনীতির ফলে রাজপুত, জাঠ ও শিখগণ মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুরূপে পরিণত হয়। অবশ্য মরাঠা জাতির অভ্যুত্থানের জন্য তাঁহার অনুদারতা বিশেষ দায়ী ছিল বলিয়া মনে হয় না। বহুদিন মুসলমানগণের অধীনে থাকিয়া এবং নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া হিন্দু জাতির পক্ষে পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করাই স্বাভাবিক ছিল।

হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থান

ঔরংজীবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নীতি যে তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আংশিকরূপে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার নীতির ফলে কেবল যে হিন্দু জাতির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে তাঁহার বহু সৈন্য ক্ষয় এবং অর্থ নষ্ট হয়।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে উত্তর ভারতের শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্য কেবল ঔরংজীবের দেহের সমাধিস্থল নহে, উহা তাঁহার কীর্ত্তিরও সমাধিক্ষেত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহ

ঔরংজীবের বংশধরগণের দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় এত শীঘ্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল। একমাত্র বহাদুর শাহ্ ব্যতীত তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। পরাক্রান্ত ওম্‌রাহ-দিগকে দমন করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রিগণের হস্তে ক্রীড়নক-মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ওম্‌রাহ্‌গণ রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র ও আত্মকলহে লিপ্ত হন। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা কেবলমাত্র স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেন। ফলে শাসন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল; সামরিক শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। নাদির শাহ্ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন পারাক্রান্ত মুঘল সম্রাট্‌গণের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইল। আত্মকলহ ও দুর্ব্বলতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মরাঠাশক্তি বিস্তার

প্রথম বাজী রাও	...	...	১৭২০-৪০
বালাজী বাজী রাও	...	...	১৭৪০-৬১
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ	...	...	১৭৬১

পেশবা বংশ

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪-২০)—সাহু যখন রাজ্যলাভের জন্য তারাবাঈর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কণ দেশের চিৎপাবন বংশীয় এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সাহু তাঁহাকে **পেশবা** বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ধীরে ধীরে প্রতিভাবলে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি সাহুর অনুগ্রহভাজন হন। ক্রমশঃ পেশবারাই মরাঠা রাজ্যের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন; শিবাজীর বংশধরগণ তাঁহাদের হস্তে বন্দিভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

বালাজী ও তাঁহার পুত্র বাজী রাওর কৃতিত্বে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

যাহা হউক, বালাজীর চেষ্টায় সাহু সম্রাট্ ফর্‌রুখ্ সিয়রের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার (খান্দেশ, বেরার, ঔরঙ্গাবাদ, বীদর, হায়দারাবাদ ও বিজাপুর) চৌথ ও সরদেশ্‌মুখী আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং 'স্বরাজ্য' অর্থাৎ শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশসমূহের জন্য সম্রাট্‌কে কর দিতে স্বীকার করেন। সাহু মৌখিকভাবে মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন; বালাজীও অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বৃথা যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং এই সময়ে মুঘলদিগের সহিত মরাঠাগণের সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা কমই ছিল।

মুঘলের বশ্যতা

শিবাজীর মৃত্যুর পর মরাঠা রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বশতঃ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে জায়গীর দানের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। জায়গীরদারগণ ক্রমশঃ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহারা রাজার সাহায্যার্থ সৈন্যপোষণ করিবেন এবং রাজার প্রাপ্য চৌথ আদায় করিয়া

মরাঠা প্রভাব বিস্তার

পেশবাগণের বংশলতা :—

(১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪-২০)
- (২) প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০)
  - (৩) বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১)
    - বিশ্বাস রাও (পানিপথে নিহত, ১৭৬১)
    - (৪) প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২)
    - (৫) নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)
      - (৭) দ্বিতীয় মাধব রাও (১৭৭৪-৯৬)
  - (৬) রঘুনাথ রাও (১৭৭৩-৭৪)
    - (৮) দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮)
      - নানাসাহেব (পোষ্যপুত্র) (সিপাহী বিদ্রোহের নেতা)
- চিমন্‌জী আপ্পা
  - সদাশিব রাও ভাউ (পানিপথে নিহত, ১৭৬১)

দিবেন, এই শর্ত্তে বালাজী বিভিন্ন প্রদেশ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্ররূপে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ফলে মরাঠা সর্দ্দারগণ নূতন উৎসাহে চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। মরাঠাদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বালাজী যে কেবল মাত্র পেশবা বংশের স্থাপয়িতা, তাহা নহে ; তাঁহার সময়েই মরাঠাদিগের ভারতব্যাপী প্রভূত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল।

প্রথম বাজী রাও (৭২০-৪০)—বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশবার পদ অধিকার করেন। তিনি সাহসী যোদ্ধা এবং কূটবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুঘল রাজত্ব ধ্বংস করিয়া মরাঠা জাতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য **("হিন্দু-পদ-পাদ্‌শাহী")** স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহু উত্তর ভারত বিজয়ের সঙ্কল্প সমর্থন করিলেন। মরাঠা জাতিও নববলে বলীয়ান্ হইল।

হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা

বাজী রাও প্রথমতঃ স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে মুঘলদিগকে পরাজিত করিয়া **মালব** অধিকার করেন। **গুজরাত** প্রদেশে মুসলমানগণের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হওয়ায় মরাঠারা সহজেই তথায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্ত্তা নিজাম মরাঠাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহাকে পরাজিত করা হইল। বুন্দেলারাজ ছত্রসালকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া, মরাঠাগণ পুরস্কার স্বরূপ তদীয় রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজী রাও সসৈন্যে দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইয়া মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করিলেন ; কিন্তু তিনি রাজধানী অধিকার করিলেন না। মরাঠাদিগের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য নিজামকে অনুরোধ করিলেন। নিজামও দাক্ষিণাত্যে স্বীয় অধিকার নিরাপদ রাখিবার জন্য পেশবাকে দমন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ফলে **নিজামের সহিত মরাঠাগণের যুদ্ধ** হইল। নিজাম পরাজিত হইয়া মালবে মরাঠা অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৩৮)। অতঃপর মরাঠাগণ সাল্‌সেটি ও বেসিন হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করে

মালব ও গুজরাত

নিজামের পরাজয়

(১৭৩৯)। এইরূপে মরাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজী রাও ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।



প্রথম বাজী রাও (প্রাচীন চিত্র হইতে)

পাঁচটি মরাঠা সামন্ত রাজ্য—মরাঠা জাতির ক্ষমতা চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিতেছিল বটে; কিন্তু মরাঠা রাজ্যে একতা ছিল না। মরাঠা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এক একজন সর্দ্দার ক্রমশঃ স্ব স্ব স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন। এইরূপে বেরারে **ভোঁস্‌লে বংশ** প্রতিষ্ঠিত হয়। বরোদার **গায়কবাড় বংশ** গুজরাতে আধিপত্য বিস্তার করে। মালব প্রদেশ রণজী সিন্ধিয়া এবং মল্‌হর রাও হোল্‌কর নামক দুইজন প্রসিদ্ধ সেনাপতির কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তাঁহারা যথাক্রমে গোয়ালিয়-

বেরার

বরোদা

রের **সিন্ধিয়া বংশ** এবং ইন্দোরের **হোল্‌কর বংশ** স্থাপন করেন। মালবের অন্তর্গত ধার নগরে **পবার বংশ** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল দলপতিগণ একতাবদ্ধভাবে কার্য্য করিতেন না। অনেক সময় তাঁহারা পেশবার হুকুম অমান্য করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতেন। পেশবাগণও শিবাজীর বংশধরদিগকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। ইহার ফলে মরাঠা রাজ্যের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

গোয়ালিয়র ও ইন্দোর

বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১)—প্রথম বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী রাও পেশবার পদ অধিকার করেন। এই সময় হইতে পেশবার পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ হইতে থাকে। রাজা সাহু মৃত্যুর (১৭৪৯) পূর্ব্বে পেশবার হস্তে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী **রামরাজা** পেশবার হস্তে বন্দী ছিলেন। বালাজী পুণা হইতে মরাঠা রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তারাবাঈ তাঁহার ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বালাজী তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্বীয় অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বালাজী সুশাসক ছিলেন।

বালাজীর সময়ে নানাদিকে মরাঠা জাতির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বাজী রাও মুসলমান প্রভুত্বের ধ্বংস সাধন করিবার জন্য মরাঠাদিগের নেতৃত্বে সমগ্র হিন্দু জাতিকে সম্মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বালাজী এই মহান্ আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া অর্থসংগ্রহে লিপ্ত হন। তাঁহার সৈন্যদল সমগ্র ভারত লুণ্ঠন করিত এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলকেই অর্থলোভে নির্য্যাতিত করিত। তাহাদের অত্যাচারে রাজপুত ও জাঠগণ মরাঠা জাতির প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল। ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হইল না। দ্বিতীয়তঃ, বালাজী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মরাঠা ব্যতীত অন্যান্য নানা জাতি হইতে সেনাসংগ্রহ করেন এবং মরাঠা সৈন্যের জাতীয় গৌরববোধ বিনষ্ট করেন। তাঁহার সময়েই মরাঠা সেনাদল পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত হইতে আরম্ভ করে।

মরাঠাদিগের অত্যাচার

বালাজীর সময়ে মরাঠা সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে মরাঠাগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে

উদ্গীরের যুদ্ধ

উদ্গীরের যুদ্ধে নিজামের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া মরাঠারা কয়েকটি সমৃদ্ধ জেলা এবং অসীরগড় প্রভৃতি কতিপয় বিখ্যাত দুর্গ লাভ করে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার ভ্রাতা রঘুনাথ রাওর নেতৃত্বে মরাঠাগণ পঞ্জাব অধিকার করে। ইতিপূর্ব্বে **আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানী** মুঘল সম্রাট্‌ আহ্‌মদ শাহের নিকট হইতে পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য পঞ্চমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বাধাপ্রদান করিবার জন্য সদাশিব রাও ভাউ নামক সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট্‌ সৈন্যদল উত্তর-ভারতে প্রেরিত হইল। অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা, রোহিলানায়ক নজীব খাঁ প্রভৃতি উত্তর-ভারতের মুসলমান অধিনায়কগণ সকলেই দুর্‌রানীর পক্ষ সমর্থন করিলেন; কিন্তু মরাঠাগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত জাঠ ও রাজপুতগণ নিরপেক্ষ রহিল—হিন্দুর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** মরাঠাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। সদাশিব রাও প্রভৃতি কয়েকজন মরাঠা সেনাপতি এবং পেশবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাইয়া বালাজী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল—মরাঠাদিগের পরাজয় নানাদিক হইতে ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মরাঠাগণের শক্তি ধ্বংস হয় এবং তাহাদের সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই মরাঠারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া উত্তর-ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল; সুতরাং পানিপথের যুদ্ধ তাহাদের কেবলমাত্র সাময়িক ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক, পানিপথের যুদ্ধের ফলেই ইংরাজগণ মরাঠা শক্তির সম্মুখীন না হইয়া বাংলায় ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং হায়দর আলি মহিসুরে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মরাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া আহ্‌মদ শাহের কোন স্থায়ী লাভ হয় নাই। কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই পঞ্জাবে শিখগণ স্বাধীন হইয়াছিল।

মরাঠাগণের পরাজয়ের ফল

প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২)—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠাগণের ক্ষমতা যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নাই, পেশবা প্রথম মাধব রাওর জীবনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বালাজী বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশবর্ষবয়স্ক পুত্র মাধব রাও পেশবার পদ অধিকার করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার খুল্লতাত (পেশবা বালাজী বাজী রাওর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) **রঘুনাথ রাও** রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মরাঠাগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া হায়দরাবাদের অধিপতি নিজাম মরাঠা রাজ্য আক্রমণ করেন ; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ইতিমধ্যে হায়দর আলি মহিসূরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মরাঠাগণের সহিত কয়েক বার তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রত্যেকবারই তিনি পরাজিত হইয়া কর প্রদান করিতে এবং রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে মাধব রাও স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে মরাঠা সৈন্য মালব, রাজপুতানা এবং রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করে। মুঘল সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম এতদিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন ; তিনি মরাঠাগণের সাহায্যে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এইরূপে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে মরাঠা প্রভাব পুনরুদ্ধার করিয়া মাধব রাও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি শাসনপদ্ধতির উন্নতি এবং প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত **রামশাস্ত্রী** তাঁহার সময়ে মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক ছিলেন। মাধব রাওর অকাল মৃত্যুতে মরাঠা জাতির যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আর পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

নিজাম ও হায়দর আলির পরাজয়

দিল্লীতে মরাঠা অধিকার

নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)—প্রথম মাধব রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবার পদ লাভ করেন। মধব রাওর মৃত্যুর পূর্ব্বেই রঘুনাথ রাও স্বয়ং পেশবা পদ অধিকরের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নিজামের সাহায্য গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নারায়ণ রাও মাত্র নয় মাস সাম্রাজ্য শাসন করিবার পর রঘুনাথের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। অতঃপর রঘুনাথ স্বয়ং পেশবা হন। তিনি মরাঠা

রঘুনাথ রাও

সাম্রাজ্যে যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই মরাঠা জাতির পতন আসন্ন হইয়াছিল।

মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোয়ালিয়রের মরাঠা অধিপতি মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পেশবা প্রথম মাধব রাওর রাজত্ব কালে তিনি বীরত্ব ও বুদ্ধি বলে খ্যাতিলাভ করেন। যে মরাঠা বাহিনী ১৭৬৯-৭২ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে



মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া

উত্তর-ভারতে মরাঠা প্রভাব

মরাঠা প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তিনি তাহার অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলাম মরাঠাগণের আশ্রয়ে দিল্লীতে বাস করিতে স্বীকৃত হন। মহাদ্‌জীর মৃত্যু পর্য্যন্ত শাহ্ আলম তাঁহার আশ্রিত ছিলেন। সম্রাটের নামমাহাত্ম্যে উত্তরভারতে মহাদ্‌জীর ক্ষমতা-বিস্তার সহজসাধ্য হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বহু ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। মহাদ্‌জীর ইউরোপীয়

কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ইটালীর স্যাভয়প্রদেশবাসী **ডি বয়েন** (de Boigne) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই সেনাপতি মহাদ্‌জীর প্রতিদ্বন্দ্বী হোল্‌করের ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরজিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মহাদ্‌জীর মৃত্যু হয়। তাঁহার দক্ষতার ফলেই উত্তরভারতে মরাঠা প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর মরাঠা সাম্রাজ্যে আর তেমন সুদক্ষ নেতার আবির্ভাব হয় নাই।

অহল্যা বাঈ—মরাঠা জাতির ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈর নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইন্দোরের হোল্‌কর বংশের স্থাপয়িতা মল্‌হর রাও হোল্‌করের পুত্রবধূ ছিলেন। অল্প বয়েসেই স্বামী ও পুত্রকে হারাইয়া তিনি শ্বশুরের রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। প্রায় ২৮ বৎসর কাল (১৭৬৭-৯৫) তিনি মাতৃস্নেহে হোল্‌কার রাজ্যের প্রজাগণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বহু হিন্দু তীর্থে তিনি মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়

আদি গ্রন্থ সঙ্কলন	...	...	১৬০৪
অর্জ্জুনের মৃত্যু	...	...	১৬০৬
তেগ বাহাদুরের মৃত্যু	...	...	১৬৭৫
গুরু গোবিন্দ	...	...	১৬৭০-১৭০৮

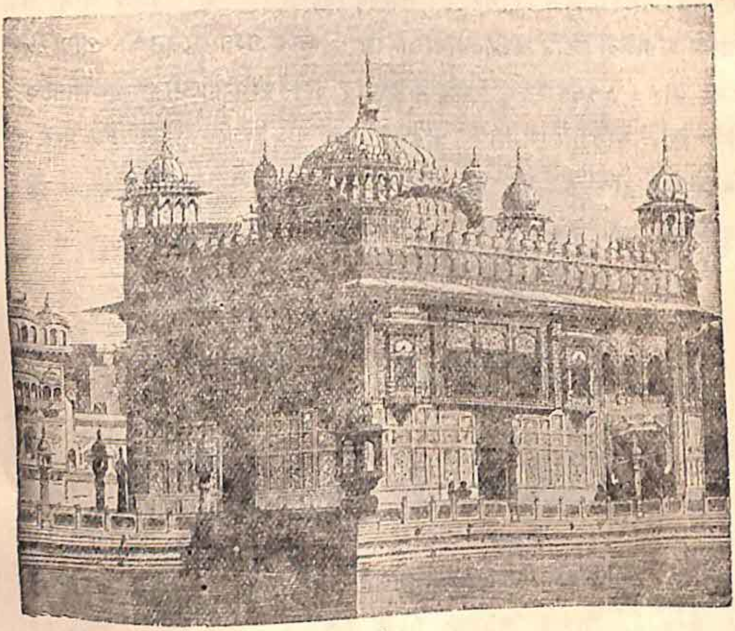
১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গুরু **নানক** পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তিন জন গুরু **অঙ্গদ** (১৫৩৮-৫২), **অমরদাস** (১৫৫২-৭৪) ও **রামদাস** (১৫৭৪ ৮১) শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্ম-প্রচার ও শিষ্যসংগ্রহ করিতেন। কথিত আছে, অঙ্গদ গুরুমুখি বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অমরদাসের সময়ে শিখগণ বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্বন্ধে হিন্দু আচার পরিত্যাগ করে। এইরূপে হিন্দু সমাজের সহিত শিখদিগের বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। রামদাসের সময় শিখগণের প্রধান কেন্দ্র

শিখ সাম্রাজ্যের সূচনা

অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আকবর শিকদিগকে অমৃতসর শহরের জন্য জমি দান করিয়াছিলেন (১৫৭৯)।

রামদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **অর্জ্জুন** (১৫৮১-১৬০৬)গুরু হন। এতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুর মনোনীত ব্যক্তিই গুরু-পদে অভিষিক্ত হইতেন ; কিন্তু এই সময় হইতে গুরুর পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ণ হইতে থাকে। অর্জ্জুনের সময় অমৃতসরের বিখ্যাত মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। অর্জ্জুন **আদিগ্রন্থ** নামে পরিচিত শিখদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন করেন (১৬০৪)। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ গুরুমুখি (অর্থাৎ পঞ্জাবি) ভাষায় লিখিত ; কিন্তু ইহার কিয়দংশ সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত। ইহাতে শিখগুরুগণ এবং

গুরু অর্জ্জুন



অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির

অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত বা সাধুর রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণ শিষ্যদিগের সেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন ; কিন্তু অর্জ্জুন রীতিমত কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা গুরুর প্রতিনিধিস্বরূপ কর আদায় করিতেন, তাঁহাদিগকে **'মসন্দ'** বলা হইত।

এই সময় হইতেই শিখগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুস্রুর সহায়তা করিবার অপরাধে গুরু অর্জ্জুন মুঘলগণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

অর্জ্জুনের পুত্র ষষ্ঠ গুরু **হরগোবিন্দ** (১৬০৬-৪৫) যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। সম্রাট্ জহাঙ্গীর তাঁহাকে বার বৎসর গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে তাঁহার সহিত মুঘলগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। হরগোবিন্দের চেষ্টায় শিখগণ ক্রমশঃ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া যোদ্ধৃসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। হরগোবিন্দ

হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র **হররায়** (১৬৪৫-৬১) গুরুর পদ অধিকার করেন। শাহ্‌জহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি দারার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় নাবালক পুত্র **হরকিষণ** (১৬৬১-৬৪) গদি অধিকার করেন। অতঃপর হরগোবিন্দের অন্যতম পুত্র **তেগ বহাদুর** (১৬৬৪-৭৫) নবম গুরু হইলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি ঔরংজীবের আদেশে নিহত হন। তিনি বিহার, বাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তেগ বহাদুর

তেগ বহাদুরের পুত্র দশম ও শেষ গুরু **গোবিন্দ** (১৬৭৫-১৭০৮) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আদেশ করেন যে, শিখগণ তামাক খাইতে পারিবে না, দীর্ঘ কেশ রাখিবে, খাটো পায়জামা পরিবে এবং সর্ব্বদা লৌহবলয়, ছুরিকা ও চিরুণী ধারণ করিবে। অদ্যপি বহু শিখ এইসকল নিয়ম পালন করেন। ধর্ম্মবিস্তার অপেক্ষা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি গুরু গোবিন্দের অধিক লক্ষ্য ছিল। জাতীয় একতা বৃদ্ধির জন্য তিনি জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন। গুরু গোবিন্দ তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশিগণের সহিত বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রেরণায় শিখগণ সম্মিলিত ও যুদ্ধপ্রিয় এক দুর্দ্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হইয়া **খাল্‌সা** * গুরু গোবিন্দ

* খাল্‌সা (বা খালিসা) শব্দটি আরবি ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ—পবিত্র, স্বাধীন, মুক্ত ইত্যাদি। খাল্‌সা অর্থে রাজা বা জমিদারের খাস মহলের অন্তর্গত জমিও বুঝায়। সুতরাং এই নামের দ্বারা পবিত্র বা মুক্ত (শিখ) সম্প্রদায় না বুঝাইয়া গুরু গোবিন্দের রাজ্যও বুঝাইতে পারে।

নামে পরিচিত হয়। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর গুরু গোবিন্দ বহাদুর শাহ্‌কে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। তিনি বহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে এক পাঠান আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শিখজাতি আর কোন গুরুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নাই; আদি গ্রন্থই তাহাদের গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে। গুরু গোবিন্দকে বর্ত্তমান শিখ সম্প্রদায়ের স্রষ্টারূপে গণ্য করিলে অন্যায় হইবে না।

বন্দা

গুরুগোবিন্দের মৃত্যুর পর **বন্দা** নামক এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি শিখগণের নেতৃত্ব লাভ করেন (১৭০৮-১৬)। তিনি বহাদুর শাহ্‌ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ফরুরুখ্‌ সিয়রের সময়ে তিনি ধৃত ও নিহত হন।

বন্দার মৃত্যুতে শিখ জাতি ভগ্নোৎসাহ হইল না; তাহাদের সামরিক শক্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল না। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশ অধিকার করিতে লাগিল। সম্রাট্‌ মুহম্মদ শাহের সময় **জাকারিয়া খাঁ** নামক একজন মুঘল শাসনকর্ত্তা (১৭২৬-৪৫) শিখদিগকে দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

এতদিন পর্য্যন্ত শিখেরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; কিন্তু অতঃপর **আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানী** ও তাঁহার প্রতিনিধিগণ তাহাদের প্রধান শত্রুরূপে পরিণত হইলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসরের মধ্যে আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানী নয় বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্জাবই তাঁহার প্রধান আক্রমণক্ষেত্র ছিল। মুঘল সম্রাট্‌ আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৭৪৮-৫৪) পঞ্জাব প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন: কিন্তু শিখগণ আফ্‌গানদিগের অধীনতা স্বীকার না করিয়া নানাপ্রকারে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) জয়লাভের পর আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানী কয়েকবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। দুর্দ্ধর্ষ শিখদলপতিগণ

শিখগণ কর্ত্তৃক পাঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা

আহ্‌মদ শাহ্‌ হুর্‌রানীর চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন এবং পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে অধিকার বিস্তার করিলেন। আহ্‌মদ শাহ্‌ হুর্‌রানীর উত্তরাধিকারিগণ বারবার পঞ্জাব অধিকারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিখেরা তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান না করিলে খুব সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহাদের অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত; সুতরাং শিখগণকে আফ্‌গান আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতার রক্ষকরূপে গণ্য করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখগণের রাজনৈতিক একতা ছিল না। তাহারা দ্বাদশটি **মিস্‌ল্‌** বা দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মিস্‌ল্‌ একজন সর্দ্দারের অধীন ছিল। প্রতি বৎসরে দুইবার সকল মিস্‌লের সর্দ্দারগণ **সরবৎ খাল্‌সা** নামক সভায় একত্রিত হইয়া একজন নেতা নির্ব্বাচন করিতেন। এই নেতার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। রণজিত সিংহের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে শিখগণ পুনরায় সম্মিলিত হয়।

দ্বাদশ মিস্‌ল্‌ ও সরবৎ খালসা

জাঠ জাতির অভ্যুদয়—পঞ্জাব, রাজপুতানার উত্তরাংশ এবং যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ জাঠ জাতির বাসভূমি। বহু জাঠ ইস্‌লাম ও শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঔরংজীবের সময় হইতেই জাঠগণ ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাঠ-নায়ক বদনসিংহ ভারতপুরে একটি রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র **সুরজমল** (১৭৫৬-৬৩) সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভরতপুর রাজ্যকে উত্তর-ভারতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। অনরবত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয় কোটি টাকা এবং চল্লিশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ এবং মরাঠাদিগের আক্রমণ জাঠ রাজ্যের শক্তিক্ষয় করিতে থাকে।

ভরতপুরের জাঠরাজ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মুর্শীদাবাদের নবাবগণের বিবরণ

আক্‌বরের বাংলা বিজয়	...	১৫৭৬
মুর্শীদকুলী খাঁর মৃত্যু	...	১৭২৭
শুজা-উদ্দীন	...	১৭২৭-৩৯
সরফ্‌রাজ খাঁ	...	১৭৩৯-৪০
আলীবর্দ্দী খাঁ	...	১৭৪০-৫৬
সিরাজ-উদ্দৌলা	...	১৭৫৬-৫৭

মুঘল আমলে বাংলাদেশ—১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বিহারও বাংলার শেষ আফ্‌গান সুল্‌তান দাউদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আক্‌বর বাংলাদেশ অধিকার করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য যে পনরটি সুবায় বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্যে বাংলা দেশ একটি। বাংলাদেশ শাসন করিবার জন্য সম্রাট্‌গণ একজন শাসনকর্ত্তা (সিপাহ্‌, সালার, নাজিম বা সুবাদার) নিযুক্ত করিতেন। আক্‌বরের সময়ে **মানসিংহ ও তোড়লমল** কয়েক বৎসর বাংলা শাসন করেন। তখন **রাজমহল** বাংলার রাজধানী ছিল। জহাঙ্গীরের সময়ে **ইস্‌লাম খাঁ** বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি **ঢাকা** শহরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম হয় জহাঙ্গীরনগর। শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে তঁহার দ্বিতীয় পুত্র **সুজা** বহুদিন বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঔরংজীবের সময়ে **শায়েস্তা খাঁ** কয়েক বৎসর বাংলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শাসনকালে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত।

সুবা বাংলার শাসনকর্ত্তৃগণ

মুঘল আমলে বাংলার শাসনকর্ত্তৃগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেন না বটে; কিন্তু দেশে সময় সময় নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইত। আক্‌বর ও জহাঙ্গীরের সময়ে আফ্‌গান নায়কগণ স্বাধীন হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মুঘলদিগের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র ও যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদারগণও সময় সময় দিল্লীর বাদ্‌শাহের হুকুম মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিতেন। পর্ত্তুগীজ বণিক্ ও জলদস্যুগণ নানারকমে লোকের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সম্রাট্ শাহ্‌জহানের

সময়ে মুঘলেরা হুগলী অধিকার করিয়াছিল। আরাকানের দুর্দ্দান্ত মগ জলদস্যুগণ বারবার বাংলাদেশ লুণ্ঠন করিত।

এই সমস্ত অশান্তি সত্ত্বেও দেশের অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। সাধারণ লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। তাঁতী, কামার প্রভৃতি শিল্পী-দিগের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। বার্নিয়ার ও অন্যান্য বৈদেশিক পর্য্যটকগণ বাংলার সমৃদ্ধির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', কাশীরাম-দাসের 'মহাভারত' রামপ্রসাদ সেনের 'কাব্য ও গান', ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল', প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুঘল আমলে লিখিত হইয়াছিল। দেশের অবস্থা

মুর্শীদ কুলী খাঁ—১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব দাক্ষিণাত্য প্রবেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়া পারস্য দেশ হইতে আগত মুর্শীদ্ কুলী খাঁ নামক একজন



মুর্শীদকুলী খাঁ

সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং রাজস্ব বিভাগের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তোড়লমলের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসরণ করিয়া মুর্শীদ কুলী খাঁ জমি জরিপ ও জমা ধার্য্য করেন।

ঔরংজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর মুর্শীদ্ কুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ঔরংজীবের মৃত্যুকালে (১৭০৭) তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ঢাকা হইতে বাংলার রাজধানী পশ্চিম-বঙ্গে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার নাম অনুসারে নূতন রাজধানী **মুর্শীদাবাদ** নামে পরিচিত হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফর্রুখ্‌সিয়র্ তাঁহাকে বাংলার শাসনকর্ত্তা (সুবাদার) নিযুক্ত করেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার শাসনভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে বাংলা দেশ শাসন করেন। তিনি প্রজাহিতৈষী এবং ন্যায়বিচারক ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে বাংলায় শান্তি স্থাপিত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজধানী মুর্শীদাবাদ

শুজা উদ্দীন বা শুজা উদ্দৌলা (১৭২৭-৩৯)—মুর্শীদ্ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাহার জামাতা শুজা উদ্দৌলা বাংলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হন। কয়েক বৎসর পর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ তাঁহাকে বিহারের শাসনভার প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে শুজাউদ্দৌলা নামে মাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন; কার্য্যতঃ তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। তিনি দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

সর্‌ফরাজ খাঁ বা আলা উদ্দৌলা (১৭৩৯-৪০)—শুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সর্‌ফরাজ খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেন। তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। হাজী আহ্‌মদ এবং আলিবর্দ্দী খাঁ নামক দুই ভ্রাতা বহুদিন যাবৎ সুখ্যাতির সহিত নবাবের দরবারে কার্য্য করিতেছিলেন। সর্‌ফরাজ খাঁ ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। ইহা জানিতে পারিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। **ঘেরিয়ার যুদ্ধে** সর্‌ফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন।

ঘেরিয়ার যুদ্ধ

আলিবর্দ্দী খাঁ (১৭২০-৫৬)—ঘেরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আলিবর্দ্দী খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করিলেন। তিনি প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিলেন এবং দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সময়ে বাংলায় মুঘল সম্রাটের আধিপত্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা মরাঠাদিগের আক্রমণ **বা বর্গীর হাঙ্গামা**।* অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মরাঠাদিগের শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহারা উত্তর-ভারতের নানা প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের অধিপতি **রঘুজী ভোঁসলে** বাংলাদেশ হইতে চৌথ আদায়ের জন্য **ভাস্কর রাম কোল্‌হৎকর** নামক এক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মরাঠারা পশ্চিম-বাংলার কিয়দংশ অধিকার করিয়া জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করে; কিন্তু অবশেষে আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। এই সময়েই কলিকাতার পার্শ্বে বিখ্যাত 'মরাঠা খাল' (Maratha Ditch) খনিত হয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোস্‌লে এবং পেশবা **বালাজী বাজীরাও** বাংলায় উপস্থিত হন। আলিবর্দ্দী খাঁ পেশবাকে বিহারের চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার সাহায্যে রঘুজীকে বিতাড়িত করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন; কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রঘুজীর সৈন্যদল উড়িষ্যা অধিকার করিয়া আবার বাংলায় উপস্থিত হয়; কিন্তু এবার আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ রঘুজী ভোঁসলের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। নবাব বাংলার চৌথ বাবদ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা এবং কটক প্রদেশ (অর্থাৎ উড়িষ্যার পশ্চিমাঞ্চল) রঘুজীকে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উড়িষ্যার পূর্ব্বাংশ (অর্থাৎ মেদিনীপুর অঞ্চল এবং হুগলীর কিয়ংদশ) আলিবর্দ্দীর অধিকারভুক্ত রহিল।

বর্গীর হাঙ্গামা

মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ্‌-উদ্দৌলা বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেন।

* যে সকল মরাঠা সৈন্য সরকারি তহবিল হইতে নিয়মিতভাবে বেতন ও সাজসজ্জা পাইত তাহাদিগকে 'বার্গীর' বলা হইত। 'বার্গীর শব্দ বাংলাভাষায় 'বর্গী'তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ইউরোপীয়গণের ভারতে আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার

ভাস্কো ডা গামার আগমন	...	১৪৯৮
আল্‌বুকার্ক্	...	১৫০৯-১৫
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন	...	১৬০০
ফরাসি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন	...	১৬৬৪
কলিকাতা নগরী স্থাপন	...	১৬৯০

পর্ত্তুগীজগণ—অতি প্রাচীন কাল হইতে পাশ্চাত্য দেশের বণিক্‌গণ বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে যাতায়াত করিত। কালক্রমে এই লাভজনক ব্যবসায় আরব বণিক্‌দিগের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। আরবেরা ইটালির অন্তর্গত ভেনিস (Venice) ও জেনোয়ার (Genoa) বাজারে অতিশয় উচ্চ মূল্যে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় হইত। ইহার ফলে পশ্চিম ইউরোপের জাতিসমূহ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে পর্ত্তুগীজগণের

ভাস্কো ডা গামা

চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে **ভাস্কো ডা গামা** নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-উপকূলস্থিত কালিকটে উপস্থিত হন। ক্রমে পর্ত্তুগীজগণ সিংহলের নানাস্থানে, বাংলার অন্তর্গত হুগলীতে এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত সাল্‌সেটি, বেসিন, গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতীয় রাজ্যসমূহের প্রবল নৌশক্তির অভাব ছিল। কাজেই **আলবুকার্ক্** (১৫০৯-১৫) প্রভৃতি পরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তার নায়কতায় পর্ত্তুগীজদিগের পশ্চিম-উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তারে কোনই বাধা ঘটিল না। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত পরধর্ম্মদ্বেষী ছিল; জল পথে তাহাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। এই



ভাস্কো ডা গামা

জন্য ক্রমে দেশীয় রাজগণের সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। ফলে মুঘলেরা হুগলী (১৬৩২) এবং মরাঠাগণ সাল্‌সেট ও বেসিন (১৭৩৯) অধিকার করিয়া লইল। এই সকল কারণে, এবং পর্ত্তুগীজগণের অনুকরণে অন্যান্য যে সকল ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছিল তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলে, ধীরে ধীরে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রতিপত্তি হ্রাস

অন্যান্য জাতি—ভারতে পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্যের উন্নতিতে পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য জাতিসমূহ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে। নানা দেশের বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করিতে লাগিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একদল বণিক **'লণ্ডন ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি'** নামক একটি সমিতি গঠন করিয়া পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারের জন্য রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে এক সনন্দ লাভ করে। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা (অর্থাৎ হল্যাণ্ড্ বাসিগণ) 'ইউনাই-টেড্ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে এক বণিক্‌সমিতি গঠন করিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে দিনেমার (অর্থাৎ ডেন্‌মার্ক্ বাসী) বণিক্‌গণের গঠিত একটি কোম্পানিও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যোগী হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফরাসি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ফ্লাণ্ডার্সের বণিকগণ পূর্ব্বদেশে বাণিজ্যের জন্য 'অস্টেণ্ড কোম্পানি' নামক সমিতি গঠন করে এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের 'ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়। ইংরেজদিগের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বণিক সমিতি

এই সকল বণিক-সমিতির মধ্যে ইংরেজ, ফরাসি এবং ওলন্দাজ সমিতি-গুলি সমধিক প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব দেশের বাণিজ্য লইয়া এই তিন জাতির বণিক্‌গণের মধ্যে প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিংহল ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যবিস্তারের দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান করে। সুতরাং ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উন্নতি এবং রাজনৈতিক প্রভুত্বের জন্য কেবল ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। দিনেমারগণ বাংলাদেশের শ্রীরামপুরে একটি কুঠি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা কখনও এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন নাই।

ভারতে ইংরেজ—১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিদ্বন্দ্বী পর্ত্তুগীজগণকে পরাভূত করিয়া, গুজরাতের মুঘল শাসনকর্ত্তার ফর্‌মান বা আদেশপত্রের বলে ইংরাজ ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুরতে একটি কুঠি স্থাপন করেন করে। কয়েক বৎসর পরে ইংরাজেরা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে **মাদ্রাজ** ইজারা গ্রহণ করে (১৬৩৯) এবং ঐ স্থানে 'ফোর্ট্‌ জর্জ্জ' নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌ বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে **বোম্বাই** দ্বীপ ইজারা দেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চার্ল্‌স পর্ত্তুগালের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ ঐ দ্বীপটি লাভ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে **জব চার্নক** নামক ইংরেজ কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী বাংলাদেশে ভাগীরথী নদীর তীরস্থিত জলাভূমির মধ্যে সুতানুটি ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া **কলিকাতা** নগরীর পত্তন করেন। এই স্থানে তদানীন্তন ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে **ফোর্ট উইলিয়ম** নামে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইল।

কলিকাতা

ভারতীয় বাণিজ্যে ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রমোন্নতি দেখিয়া অন্যান্য বহু ইংরেজ বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতে উৎসুক হয়। ফলে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে '**ইংলিশ ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি**' নামে পরিচিত অপর একটি ইংরেজ বণিক্‌-সমিতি রাজ-সনন্দ লাভ করিয়া ভারতে আগমন করে। শীঘ্রই লণ্ডন ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত এই নূতন কোম্পানির বিবাদ আরম্ভ হইল ; কিন্তু ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এই দুই বিবদমান কোম্পানি সম্মিলিত হইয়া 'ইউনাইটেড্‌ ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে পরিচিত হয়।

ইউনাইটেড ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ভারতে ফরাসি—ভাস্কো ডা গামার অভিযানের কিছুদিন পর হইতেই ফরাসিগণ বাণিজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কয়েকটি ফরাসি বণিক্‌-সমিতি বাণিজ্যের জন্য ভারতে আগমনের চেষ্টা

করিয়াও সফলকাম হয় নাই। অবশেষে চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে বিখ্যাত মন্ত্রী কোল্‌বার্টের (Colbert) উৎসাহে ফরাসি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয় (১৬৬৪)। এই কোম্পানি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরতে এবং পর বৎসর মসুলিপটমে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে মাদ্রাজের ৮৫ মাইল দক্ষিণে একখানি গ্রাম ইজারা লইয়া ফরাসি বণিক্‌গণ মার্টিন নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে **পণ্ডিচেরি নগরের পত্তন** করিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাবের নিকট হইতে চন্দননগর লাভ করিয়া কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা এই স্থানে একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন (১৬৯০-৯২)। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফরাসি কোম্পানির অবস্থা ভাল ছিল না। পণ্ডিচেরি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে ; কিন্তু সুরত ও মসুলিপটমের কুঠি পরিত্যক্ত হয়। ওলন্দাজ বণিক্‌গণের প্রতিযোগিতায় এবং জন্ ল (John Law) নামক ফ্রান্সের জনৈক মন্ত্রীর ভ্রান্ত নীতির ফলে কোম্পানির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। অবশেষে, ১৭২০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি পুনর্গঠিত হয় এবং 'পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিরস্থায়ী কোম্পানি' (Perpetual Company of the Indies) নাম ধারণ করে। ইহার পর পুনরায় কোম্পানির উন্নতি হইতে থাকে। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ভারত মহাসাগরের মরিশিয়স্, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মালাবার উপকূলের মাহে এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কোরোমণ্ডল উপকূলের করিকল ফরাসিগণের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—মহিষূরের অভ্যুত্থান

মরাঠাগণের সহিত হায়দরের যুদ্ধ	...	১৭৬৪-৬৬, ১৭৭০-৭২
ইংরেজদিগের সহিত হায়দরের যুদ্ধ	...	১৭৬৭-৬৯, ১৭৮০-৮২

হায়দর আলীর প্রথম জীবন—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে মহিষূর রাজ্যে একজন অসমসাহসী মুসলমান বীর পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম হায়দর আলি। হায়দরের জীবন-কাহিনী উপকথার ন্যায় অদ্ভুত তিনি

একজন সাধারণ সৈনিকের পুত্র ছিলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে হায়দর মহিষুরের হিন্দু রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। এই সময় মহিষূর রাজ্যের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর মহিষূরের রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালক্রমে

মহিষুরের হিন্দু রাজার চাকরী



হায়দর আলি (প্রাচীন চিত্র হইতে)

তাঁহারা 'দলবই, (দলপতি) উপাধিধারী প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। হায়দরের সময় যিনি দলবই ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল **নন্দরাজ**। যাহা হউক, অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতাগুণে শীঘ্রই হায়দরের পদোন্নতি হইল। তিনি দিণ্ডিগলের ফৌজদার (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত হইলেন (১৭৫৫), এবং কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালোর অঞ্চলে একটি জায়গীর লাভ করিলেন।

পদোন্নতি

মহিষূরে হায়দরের প্রাধান্য লাভ—হায়দরের দক্ষতায় প্রীত হইয়া মহিষূরের রাজা তাঁহার সাহায্যে ক্ষমতাশালী দলবই নন্দরাজকে দমন করিতে চাহিলেন। তিনিও নন্দরাজের পূর্ব্ব অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ফলে দলবইর পতন হইল। কিন্তু

হায়দর রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিয়া নিজেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন খণ্ডে রাও নামক একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সাহায্যে হায়দরকে দমন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু হায়দর কৌশলে খণ্ডে রাওকে বন্দী করিয়া মহিষূর রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন (১৭৬১)। সাফল্য লাভ

হায়দরের রাজ্য বিস্তার—অতঃপর হায়দর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সমৃদ্ধ **বেদনুর** জনপদ অধিকার করেন। হায়দরাবাদের নিজাম এবং মরাঠাগণের রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি স্থানও তাঁহার হস্তগত হইল। উত্তরে প্রায় কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত তিনি আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

মরাঠাগণের সহিত হায়দরের প্রথম যুদ্ধ—মহীষূরে এই শক্তিশালী নব রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে মরাঠাগণ চিন্তিত হইয়া উঠিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর তাহারা সাময়িকভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তরুণ পেশবা প্রথম মাধাব রাওর নায়কতায় শীঘ্রই তাহারা পুনরায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। ১৭৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধব রাওর নেতৃত্ব এক মরাঠা বাহিনী হায়দরকে পরাজিত করে। হায়দর কয়েকটি স্থানের উপর দাবি পরিত্যাগ করিয়া এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা বিনষ্ট হইল না: তিনি কিছুদিন পরেই মালাবার অধিকার করিলেন। মরাঠাগণ উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। হায়দরের পরাজয়

ইংরেজগণের সহিত হায়দরের প্রথম যুদ্ধ (প্রথম মহিষূর যুদ্ধ প্রথম ইঙ্গ-মহিষূর যুদ্ধ)—১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে হায়দরের সহিত মাদ্রাজের ইংরেজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে হায়দর পরাজিত হইলেন; কিন্তু ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বিপুল সৈন্যদল লইয়া তিনি অতর্কিত ভাবে মাদ্রাজের নিকট উপস্থিত হন। মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভীত হইয়া হায়দরের ইচ্ছামত শর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। **মাদ্রাজের সন্ধি** অনুসারে স্থির হইল যে পরস্পরের বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করা হইবে, উভয় পক্ষের বন্দী বিনিময় করা হইবে এবং কোন এক পক্ষ শত্রু কর্ত্তৃক মাদ্রাজের সন্ধি

আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষকে তাহার সাহায্য করিতে হইবে। হায়দর আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ এই সন্ধি অনুসারে মরাঠাদিগের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু তাঁহার এই আশা ফলবতী হয় নাই। কিছুদিন পরে যখন মরাঠাগণ পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন বিপন্ন হায়দর ইংরেজগণের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। এই বিশ্বাসভঙ্গের কথা হায়দর কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

মরাঠাগণের সহিত হায়দরের দ্বিতীয় যুদ্ধ—মাদ্রাজের সন্ধির অব্যবহিত পরে হায়দর ইংরেজদিগের বন্ধুতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মরাঠাগণের সহিত পুনরায় কলহ আরম্ভ করেন। ১৭৭০-৭২ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিল। অবশেষে হায়দর নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা দিয়া এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধিস্থাপন করেন।*

হায়দরের পরাজয়

---

* হায়দরের শেষজীবন—বিংশ অধ্যায় (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) দ্রষ্টব্য।

Model Questions

1. Describe briefly the history of the Mughal empire from A.D. 1707 to 1739.
2. What were the causes that led to the downfall of Mughal empire ?
3. Give a comparative account of the results of the invasions of Nadir Shah and Timur.
4. Sketch briefly the history of the Marathas from the death of Sivaji to the Third Battle of Panipat.
5. Give an account of the progress of Maratha power under the first three Peshwas. What were the causes leading to thg decline of Maratha power ?
6. "The year 1761 is a turning-point in the history of India"—Elucidate.

7. Write notes on—Sir Thoms Roe, Bernier, Ahmad Shah Durrani, Mahadji Sindhia, Vasco da Gama, Guru Govind.

8. Trace the history of Bengal from its annexation to the Mughal empire down to the death of Alivardi Khan.

9. Sketch the career of Haidar Ali with reference to his struggles with the Marathas and the English.

ঊনবিংশ অধ্যায়

মুঘল যুগে দেশের অবস্থা

শাসন প্রণালী—প্রাচীন যুগের হিন্দুরাজগণ এবং তুর্কি ও আফ্‌গান জাতীয় সুল্‌তানদিগের ন্যায় মুঘল সম্রাটেরাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ অথবা কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ ক্রমশঃ দেশের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার অর্জ্জন করিতেছিলেন এবং পার্লামেণ্ট্ (Parliament) মহাসভার ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল; কিন্তু মুঘল সম্রাট্‌দিগের সময়ে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীতে এইরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যদক্ষতার উপর রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিত। ঔরংজীব ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুঘল সম্রাট্‌গণ প্রজাপীড়ক ছিলেন না। দেশে প্রায়ই শান্তি বিরাজ করিত। মোটের উপর প্রজারা সুখেই বাস করিত; তবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের অত্যাচারে সময় সময় তাহাদিগকে উৎপীড়িত হইতে হইত। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিবৃন্দও স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের দুর্ব্বলতাবশতঃ দেশের অনেক স্থানে

স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-ব্যবস্থা

দেশের অবস্থা

অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ও মরাঠা সৈন্যদল বহু স্থান লুণ্ঠন ও ও বহু লোককে হত্যা করিয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ফল মাত্র।

হিন্দু মুসলমানের মিলন—শের শাহ্ এবং আকবরের উদার নীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছিল। হিন্দুগণ ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া সম্রাটের দরবারে উচ্চ পদ অধিকার করিত। গ্রন্থরচনাতেও তাহারা যশঃ লাভ করিতেছিল। আবার মুসলমানেরাও হিন্দুর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে হিন্দি ভাষায় কাব্য রচনা করিতে ছিল। মুসলমান সম্রাট্ ও ওম্রাহগণ বহু হিন্দু প্রথা পালন করিতেন। উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের ভাবধারা ক্রমশ: বিস্তার লাভ করিতেছিল। মধ্যএশিয়া, পারস্য ও আরব দেশ হইতে নবাগত মুসলমানগণ এই মিলন-পথের কণ্টক স্বরূপ ছিল। অবশেষে ঔরংজীবের অনুদার নীতির ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব পুনরায় জাগ্রত হয়।

শিল্পের উন্নতি—মুঘল সম্রাট্গণের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুঘল যুগে প্রচলিত স্থাপত্য-রীতি **হিন্দু-পারসিক রীতি** (Indo-Persian style) নামে পরিচিত। দিল্লীতে হুমায়ুনের কবর এই রীতিতে নির্ম্মিত হর্ম্ম্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আক্‌বর স্বয়ং ফতেপুর সীক্রীতে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জহাঙ্গীরের সময়ে নূর্জহানের পিতা ইতিমদ্-উদ্দৌলার কবরের উপর অতি আশ্চর্য্য এক সমাধিভবন নির্ম্মিত হয়। তাজ্‌মহল, দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই খাস, মোতী মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শাহ্‌জহান চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মুঘল যুগের শিল্পোন্নতির ইতিহাসের সহিত পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের শিল্পের ইতিহাস স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যায়।

স্থাপত্য

মুঘল যুগে **চিত্র-শিল্পের উন্নতি** হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পিগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। আক্‌বর ও জহাঙ্গীরের সময় সম্রাটের দরবারে চিত্র-শিল্পিগণের আদর ছিল; কিন্তু শাহ্‌জহান স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। মুঘল যুগের

চিত্র-শিল্প

চিত্র-শিল্পিগণের মধ্যে আব্দুস্ সামাদ, মীর সৈয়দ আলি, আবুল হসন, বিষণ দাস, কেশব, মাধব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত রাজারাও চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট সমাদর করিতেন; তাঁহারা বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাহিত্যের উন্নতি—মুঘল যুগে সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সম্রাট্ পরিবারের অনেকেই সাহিত্যিক ছিলেন। **বাবুর ও জহাঙ্গীর** স্ব স্ব জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার ভগ্নী **গুলবদন বেগম** একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঔরংজীবের কন্যা **জেব্উন্নিসা** সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। **আবুল ফজল, ফৈজী, বদায়ুনী, নিজাম্ উদ্দীন,** প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণ আক্‌বরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আক্‌বরের পুস্তকাগারে প্রায় ২০,০০০ মূল্যবান্ গ্রন্থ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই দক্ষিণাত্যবাসী **ফিরিশ্‌তা** নামক ঐতিহাসিক তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা নামক ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। শাহ্‌জহানের উৎসাহে ফারসি ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। ঔরংজীব ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার সময়ে **খাফী খাঁ** নামে পরিচিত মুহম্মদ হাশিম মুঘল যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম সাহিত্য

মুঘল যুগে প্রাদেশিক ভাষাসমূহেরও উন্নতি হয়। রাজপুত ও মরাঠা লেখকগণ এই যুগে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। **তুলসীদাস, সুরদাস, ভূষণ** প্রভৃতি কবিগণ হিন্দি ভাষার, **কাশীরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, মুকুন্দরাম** প্রভৃতি কবিগণ বাংলা ভাষার, এবং **রামদাস, তুকারাম** প্রভৃতি সাধুগণ মরাঠি ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করেন। সাহিত্য প্রাদেশিক

বৈদেশিকগণের বিবরণ—মুঘল যুগে বহু বৈদেশিক পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।

আকবরের রাজত্বের শেষভাগে ইংরেজ পর্যটক **রাল্‌ফ্ ফিচ্** (Ralph Fitch) ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেই সময়ে আগ্রা এবং ফতেপুর সীক্রী উভয় নগরই লণ্ডন অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর ছিল। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাক্‌লা নামক শহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উক্ত শহরের গৃহগুলি উচ্চ এবং সুন্দর ছিল। সুবর্ণগ্রামে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

রাল্‌ফ ফিচ্

জহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে **উইলিয়ম হকিন্স** (William Hawkins) সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি মুঘল সম্রাটের বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের দূত **সার টমাস রো** (Sir Thomas Roe) মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। তিনি চার বৎসর কাল (১৬১৫-১৯) ভারতবর্ষে বাস করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। সম্রাট্ স্বয়ং মদ্যপায়ী হইলেও সরলচিত্ত ও নিরহঙ্কার ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ প্রজাপীড়ক ছিলেন; তাঁহারা স্বেচ্ছামত প্রজাদিগের ধনপ্রাণ হরণ করিতেন। ইংরেজ বণিক্‌দিগের নিকট হইতে অযথা শুল্ক আদায় করা হইত এবং অনেক সময় বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বন্দী করা হইত। শাসনকার্য্যের জন্য কোন লিখিত আইন ছিল না। সম্রাট্ স্বয়ং প্রতি সপ্তাহে অপরাধীদিগের বিচার করিতেন। ওম্‌রাহগণ সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেন। সম্রাটের রাজ্য বিস্তৃত এবং সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। শিল্প ও কারুকার্য্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

সার টমাস্ রো

জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে **ফ্রান্সিস্কো পেল্‌সের্ট** (Francisco Pelsaert) নামক একজন ওলন্দাজ (Dutch) বণিকের বিবরণ বিশেষ তথ্যপূর্ণ। তিনি জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শাসনকর্ত্তা ও রাজস্ব আদায়কারীদিগের অত্যাচারে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হইত। বাংলা দেশ রেশম ও তুলার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মজুরগণ ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও

ফ্রান্সিস্‌কো পেল্‌সের্ট

সামান্যমাত্র মজুরি পাইত। তাহাদিগকে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে হইত। দোকানদারগণ অনেক সময় ওমরাহদিগের নিকট অর্দ্ধমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। জনসাধারণের রক্ত শোষণ করিয়া অভিজাতবর্গ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। পেল্‌সের্ট বলিয়াছেন যে, সম্রাট্ জহাঙ্গীর হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনিও বাংলার কার্পাস-শিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন।

শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে **টেভার্নিয়ার** (Tavernier) নামক জনৈক ফরাসি ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মুঘল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তৎকালে বাংলাদেশে প্রচুর রেশম এবং রেশমজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইত। **টেভার্নিয়ার**

শাহ্‌জহানের রাজত্বের শেষভাগে **বার্নিয়ার** (Bernier) নামক অপর এক জন ফরাসি ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসরকাল (১৬৫৬-৬৮) এদেশে বাস করিয়া এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। বার্নিয়ার ঔরংজীবের বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিয়াছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতেন। সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে বহু অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজা ছিলেন। সম্রাটের বিরাট্ সৈন্যদলের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইত। জমিদারগণ কৃষকের উপর অত্যাচার করিতেন। কৃষকদিগের সুবিচার প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা ছিল না। বার্নিয়ারের মতে বাংলার অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক ভাল ছিল; বাংলার উৎপন্ন চাউল ও চিনি বহু দূরবর্ত্তী দেশের অভাব পূরণ করিত। জিনিষপত্রের মূল্য অত্যন্ত শস্তা ছিল। বাংলায় প্রচুর তূলা ও রেশম উৎপন্ন হইত। তখন বিদেশীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, 'বাংলা দেশে প্রবেশের একশত দ্বার আছে, কিন্তু বহির্গমনের একটীও দ্বার নাই'। তবে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে দক্ষিণ-বাংলায় অশান্তি বিরাজ করিত। **বার্নিয়ার**

মানুসি

ঔরংজীবের রাজত্বকালে **মানুসি** (Manuci) নামক একজন ইতালীয় পর্য্যটক বহু বৎসর ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিরাট্ গ্রন্থে এদেশের তৎকালীন অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি বহু অমূলক গুজবও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকেরা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল কুঠির কাগজপত্র এবং বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রেরিত চিঠি ও বিবরণীসমূহ আলোচনা করিলে তৎকালীন সামাজিক, আর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য অবগত হওয়া যায়। সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ এই তথ্য উদ্ঘাটনে মনোযোগী হইয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের লিখিত বিবরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুঘল যুগে ভারতবর্ষের ধনসম্পদ ও শস্যাদির অভাব না থাকিলেও জনসাধারণের অবস্থা ভাল ছিল না। কারণ সুশাসনের অভাবে এবং জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। কৃষকের সুখ-দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই বোধ হয় পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

Model Questions

1. What do you know about Sir Thomas Roe, Francisco Pelsaert and Bernier and about their accounts of India ?

2. Briefly describe the administration, art, architecture and literature of Mughal India.

বিংশ অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় (১৭৪৬-৯৮)

প্রথম পরিচ্ছেদ—ইংরেজ-ফরাসি সংঘর্ষ এবং দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-প্রভুত্বের সূচনা

পণ্ডিচেরিতে দুপ্লের শাসন	...	১৭৪২-৫২
কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ	...	১৭৪৬-৪৮
কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ	...	১৭৫১-৫৪
কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ	...	১৭৫৮-৬৩

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য—বিভিন্ন জাতীয় ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্য দ্বারা অর্থ লাভের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা তাহাদের কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তন করে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজ্যসমূহের অভ্যুদয় হয়। সর্ব্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে এবং অশান্তির উদ্ভব হয়। ইহার ফলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকগণ স্ব স্ব সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং রাজনৈতিক কলহে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন এই অবস্থার চরম পরিণতি। ইংরেজ ও ফরাসি বণিক

ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির তুলনা—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্য-লাভের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। এই সময় ইংরেজ কোম্পানি ফরাসি কোম্পানি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান্ ছিল, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ফরাসি বণিকগণকে সকল বিষয়েই রাজার মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া তাহারা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারিত না; কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির সহিত বিলাতের গভর্ন্মেণ্টের বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকায় ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে স্বেচ্ছামত কাজ ইংরেজ বণিকগণের সুবিধা

করিতে পারিত। এই সকল কারণে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে ফরাসিদিগের জয়লাভ সুকঠিন ছিল।

ডুপ্লে (Dupleix)—১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার সুশাসনে চন্দননগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং ফরাসিগণের বাণিজ্য প্রসারিত হয়। দশ বৎসর চন্দননগরের শাসনভার পরিচালনা করিবার পর তিনি পাণ্ডিচেরির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (১৭৪২)। তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং কুটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্ব্বলতা এবং সামরিক শক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ ; দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। সুযোগ বুঝিয়া ডুপ্লে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের পরিচালনায় সুশিক্ষিত ভারতীয় সেনাদল গঠন করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতীয় রাজগণের বিবাদে কোন একজনের পক্ষভুক্ত হইয়া ফরাসিদিগের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজগণের সহিত ফরাসিদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল।

ডুপ্লের উদ্দেশ্য

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ বা প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ (১৭৪৭-৪৮)—১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ এবং ফরাসি জাতির মধ্যে যুদ্ধ (War of the Austrian Succession) উপস্থিত হয় ; ফলে, ভারতবর্ষেও এই দুই জাতির বণিক্‌গণের মধ্যে বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিল। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইরেজগণ পণ্ডিচেরি আক্রমণ করিতে যায় ; কিন্তু ডুপ্লের অনুরোধে কর্ণাটক অর্থাৎ আধুনিক আর্কট অঞ্চলের নবাব আনোয়ার্ উদ্দীন তাঁহার এলাকায় যুদ্ধ করিতে দিলেন না। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসি নৌ-সেনাপতি **লা বুর্‌দনে** (Labourdonnais) ইংরেজদিগের অধীন মাদ্রাজ অধিকার করিলেন। লা বুর্‌দনে অর্থের বিনিময়ে ইংরেজদিগকে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু ডুপ্লে তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় ডুপ্লের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। কর্ণাটকের নবাব আশা করিয়াছিলেন যে, ফরাসিরাসিরা তাঁহারই হস্তে মাদ্রাজ প্রদান করিবে; কিন্তু তাহার

ফরাসি কর্তৃক মাদ্রাজ অধিকার

সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্রুদ্ধ নবাব ফরাসিগণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাদ্রাজের নিকটবর্তী **মৈলাপুর** নামক স্থানে নবাবের দশহাজার সৈন্য মাত্র পাঁচশত ফরাসি সেনার হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অতি অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য বিরাট্ দেশীয় সেনাদলকে যে পরাজিত করিতে সমর্থ, তাহা প্রমাণিত হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরি আক্রমণ করিতে গিয়া ইংরেজগণেরও শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই বৎসর ইউরোপে একস্-লা-শাপেলের (Aix-la-Chapelle) সন্ধি অনুসারে ইংরেজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, সেজন্য ভারতবর্ষেও এই দুই জাতির বিরোধ স্থগিত হইল। ইংরেজেরা মাদ্রাজ ফিরিয়া পাইল। এই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে ফরাসিগণের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। ডুপ্লে মহোৎসাহে ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর্কটের নবাবের পরাজয়

ফরাসি প্রভাব বৃদ্ধি

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ বা দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪) —কর্ণাটকের নবাবগণ নামে মাত্র দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের (অর্থাৎ হায়দরাবাদের অসফ্ জাহ্ নিজাম-উল্‌মুল্‌কের) অধীন ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভাবেই আর্কটে রাজত্ব করিতেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে **আনোয়ার্ উদ্দীন** নামক এক ব্যক্তি নিজাম কর্তৃক আর্কটের নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত হন। শীঘ্রই নাবালক নবাবকে হত্যা করিয়া আনোয়ার্ উদ্দীন সিংহাসন অধিকার করিয়া লন, কিন্তু এই সময়ে আর্কটের জনৈক পূর্ব্বতন নবাবের জামাতা হুসেন দোস্ত্ খাঁ বা **চান্দাসাহেব** সিংহাসন দাবি করিলেন। এদিকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে অসফ্ জাহ্ নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র **নাসির জং** এবং দৌহিত্র **মুজফ্ফর্ জং** হায়দরাবাদের সিংহাসন লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর্কট ও হায়দরাবাদে গৃহবিবাদ

আর্কট এবং হায়দরাবাদে এই গৃহবিবাদের সুযোগ পাইয়া ইংরেজ এবং ফরাসিগণ এক এক পক্ষ অবলম্বন করিল এবং স্ব স্ব রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরেজেরা নাসিরজঙের পক্ষ অবলম্বন করিল, এবং ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আনোয়ার্ উদ্দীন নিহত হইলে তৎপুত্র **মুহম্মদ আলিকে** আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিল। ফরাসিরা মুজফ্ফর্

ইংরেজ ও ফরাসির গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ

জং ও চান্দাসাহেবকে সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

এই যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসি পক্ষই জয়লাভ করে। মুহম্মদ আলি পলায়ন করিয়া ত্রিচিনোপলীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নাসির জং আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে, ফরাসি পক্ষীয় মুজফ্ফর্ জং হায়দরাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। এইরূপে হায়দরাবাদের রাজসভায় ফরাসিগণের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মুজফ্ফর্ জং ডুপ্লেকে একটি জায়গীর এবং নগদ ছুইলক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিলেন। ফরাসিগণ সমৃদ্ধ মসুলিপটম্ বন্দরের অধিকার লাভ করিল। কিয়ৎকাল পরে মুজফ্ফর জং নিহত হইলে, ফরাসি সেনাপতি **বুসি** (Busys) ফরাসিদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য **সলাবৎ জং** নামক নিজাম-উল্ মুল্‌কের অপর এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। এদিকে চান্দাসাহেব ইংরেজ পক্ষীয় মুহম্মদ আলিকে ত্রিচিনোপলীতে অবরোধ করেন। এইরূপে ফরাসিগণের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন ক্রমশঃ উচ্চ গগনে উঠিতেছিল, তখন **রবার্ট্ ক্লাইভ** নামক একজন তরুণ ইংরেজ বীরের পরাক্রমে উহা চিরদিনের জন্য অস্তাচল অভিমুখে ঢলিয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসি প্রভাব

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি সামান্য কেরাণির পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। শীঘ্রই তিনি মসি ছাড়িয়া অসি-জীবীর জীবন বরণ করিলেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন। ইংরেজের মিত্র মুহম্মদ আলি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চান্দাসাহেব কর্ত্তৃক ত্রিচিনোপলীতে অবরুদ্ধ হইলে, ক্লাইভ বুঝিলেন যে, চান্দাসাহেবকে ত্রিচিনোপলীতে আক্রমণ না করিয়া তাঁহার রাজধানী আর্কট অধিকার করিতে পারিলেই মুহম্মদ আলিকে মুক্ত করা সহজ হইবে। এই যুক্তি গ্রহণ করিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তিন শত ভারতীয় সিপাহী এবং ছুইশত ইংরেজ সৈন্যের নায়করূপে ক্লাইভকে আর্কট অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ক্লাইভ অনায়াসে আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৫১)। তখন চান্দাসাহেব তদীয় পুত্র রাজা সাহেবকে রাজধানী পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা সাহেবের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। অতঃপর

রবার্ট ক্লাইভ

ক্লাইভের আর্কট অধিকার

ক্লাইভ ত্রিচিনোপলী পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন এবং চান্দা সাহেব ও ফরাসিগণের মিলিত সেনাদল পরাজিত করিয়া মুহম্মদ আলিকে উদ্ধার করিলেন। এইবার মুহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ণাটকে ইংরেজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ভারত ইংরেজের যশে পূর্ণ হইল। ইউরোপের ইংরেজ এবং ফরাসি কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে এই দুই জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিলেন না। ফরাসি কর্তৃপক্ষের আদেশে ডুপ্লেকে ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা বিসর্জন দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রভাব

ডুপ্লের চরিত্র ও কৃতিত্ব—ফরাসি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ডুপ্লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই। সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য যে সকল গুণ আবশ্যক হয়, তাঁহার চরিত্রে তাহার অভাব ছিল না। ফরাসি কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহার নীতি সমর্থন করিতেন এবং অর্থ, সৈন্য ও নৌবল দ্বারা যথোচিত ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তবে হয়তো ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপন অসম্ভব হইত না। সেকালের অন্যান্য বৃটিশ ও ও ফরাসি কর্ম্মচারিগণের ন্যায় ডুপ্লে সময় সময় অন্যায় ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন বটে; কিন্তু উহার অধিকাংশই তিনি কোম্পানির স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ডুপ্লে দারিদ্র্যজনিত কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হন।

ডুপ্লের বিফলতার কারণ

কর্ণাটকের তৃতীয়-যুদ্ধ বা তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ (১৭৫৮-৬৩)—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years' War) আরম্ভ হইলে, ভারতে আবার ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। ফরাসি কর্তৃপক্ষ **লালি** (Lally) নামক এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্ত প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। পণ্ডিচেরির শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য না পাওয়ায় লালি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ফোর্ট্ সেণ্ট্ ডেভিড অধিকার করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজ ও তাঞ্জোর অভিযান ব্যর্থ হইল। এদিকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাংলাদেশের নবাব সিরাজ্ উদ্দৌলাকে

লালি

পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব-ভারতে ইংরেজ পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং বাংলার ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর আক্রমণ করেন। তখন নিরূপায় হইয়া লালি এমন একটি কাজ করিলেন, যাহার ফলে ভারতে ফরাসি-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইল। এই সময়ে ফরাসি সেনাপতি বুসি হায়দরাবাদের রাজসভায় ফরাসি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামের নিকট হইতে তিনি উত্তর-সরকার অর্থাৎ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মোহনার নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত প্রদেশের অধিকার লাভ করেন। লালি বুসিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন; বুসি লালির আদেশ অনুসারে হায়দরাবাদ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজামের রাজ্য হইতে ফরাসিগণের প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে ক্লাইভের প্রেরিত সেনানায়ক কর্ণেল ফোর্ড মসুলিপটম্ আক্রমণ করেন; তখন নিজাম পূর্ব্বে ফরাসিদিগকে যে সকল স্থানের অধিকার দিয়াছিলেন, পুনরায় তাহাই ইংরেজদিগকে প্রদান করিলেন। এদিকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে **বন্দিবাসের যুদ্ধে** ইংরেজ সেনাপতি **সার আয়ার কুট** লালিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। পর বৎসর সুদীর্ঘ নয় মাস অবরোধের পর ইংরেজগণ ফরাসিদিগের পণ্ডিচেরি নগর অধিকার করিল এবং লালি বন্দী হইলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে **প্যারিসের সন্ধি** (Treaty of Paris) অনুসারে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। ভারতে ফরাসিগণের অধিকৃত যে সকল স্থান ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইল। এইরূপে তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অবসানে ফরাসিগণের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। ইহার পর ফরাসিরা আর ভারতবর্ষে মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই।

বুসি

বন্দিবাশের যুদ্ধ

ফরাসির পরাজয়

ফরাসিগণের ব্যর্থতার কারন—প্রধানতঃ তিনটি কারণে দক্ষিণ-ভারতে ফরাসিগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই প্রথমতঃ, ইংরেজেরা ফরাসিদিগের অপেক্ষা নৌশক্তিতে অধিক বলবান্ ছিল। ইংরেজ ও ফরাসিগণের বাসভূমি এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ইহার মধ্যে সমুদ্রের বিরাট্ ব্যবধান। সুতরাং জলপথে ইংরেজ

নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠতা এবং ফরাসিবাহিনীর অযোগ্যতা ফরাসিদিগের পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসি সেনাপতিগণ স্বদেশ হইতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থসাহায্য পান নাই; পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ইংরেজগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ইংরেজেরা বাংলা হইতে প্রয়োজনমত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্থসম্পদে ইংরেজ পক্ষ ফরাসি পক্ষ অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ পক্ষে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ এবং রণদক্ষ সেনানায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল; ফরাসি সেনাপতিগণ রবার্ট ক্লাইভের ন্যায় সাহস, ধৈর্য্য ও রণকৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইংরেজ পক্ষের শ্রেষ্ঠতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বাংলায় ইংরেজ-আধিপত্য স্থাপন

সিরাজ্‌উদ্দৌলার সিংহাসন লাভ	...	১৭৫৬
পলাশীর যুদ্ধ	...	১৭৫৭
মীর কাসিমের সিংহাসন লাভ	...	১৭৬০
বক্সারের যুদ্ধ	...	১৭৬৪
কোম্পানির দেওয়ানি লাভ	...	১৭৬৫
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	...	১৭৬৯-৭০

নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার সহিত ইংরেজগণের সংঘর্ষ (১৭৫৬-৫৭)—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার তরুণবয়স্ক দৌহিত্র সিরাজ্‌উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ বণিকগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বাংলাদেশে ইংরেজদিগের কুঠি কলিকাতায়, ফরাসিগণের কুঠি চন্দননগরে এবং ওলন্দাজদিগের কুঠি চুঁচুড়ায় পরস্পরের খুব নিকটে অবস্থিত ছিল। নবাব আলিবর্দী এই ইউরোপীয় জাতিসমূহকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে দুর্গাদি নির্ম্মাণ এবং পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া শান্তভাবে বাণিজ্য করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরেজ ও ফরাসিগণ আপন আপন উপনিবেশে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিষেধ করিলে ফরাসিরা দুর্গ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিলেও, বাংলায় ইংরেজ

ইংরেজগণ তরুণ নবাবের আদেশে কর্ণপাত করিল না। তাহারা বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল সুবিধা পাইয়াছিল উহারও যথেষ্ট অপব্যবহার করিতে-ছিল। অবশেষে নবাবের বিরাগভাজন কর্ম্মচারী রাজা রাজবল্লভের


সিরাজ্‌উদ্দৌলা

নাবব কর্ত্তৃক কালিমবাজার অধিকার

পুত্র কৃষ্ণদাস পলায়ন করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লাভ করিলে, সিরাজ্‌উদ্দৌলার ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। ইংরেজ বণিকের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য নবাবের বিরাট্ সেনাদল কাসিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অধিকার করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইল। কলিকাতার কুঠির অধ্যক্ষ **ড্রেক** এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আত্ম-রক্ষার জন্য অধিকাংশ কর্ম্মচারীর সহিত

কলিকাতা অধিকার

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ফল্‌তা নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন কলিকাতা নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

কলিকাতা ও কাসিমবাজারের পতনসংবাদ মাদ্রাজে পৌছিলে, ইংরেজ সেনাপতি **ক্লাইভ** এবং **ওয়াট্‌সন** সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে

নবাবের পরাজয়

অগ্রসর হন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে **দমদমের যুদ্ধে** নবাব সিরাজ্-উদ্দৌলার সৈন্য পরাজিত হয়। তিনি ইংরেজগণের পূর্ব্বাধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের ও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকার করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করেন। এই বিপদের সময় ফরাসিরা নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তখন তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পরে ইংরেজ জয়লাভ করিলে তিনি ভীত হইয়া ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য হায়দরাবাদস্থিত ফরাসি সেনাপতি বুসির সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিরাজ্‌উদ্দৌলার ব্যবহারে আলিবর্দ্দীর ভগ্নীপতি ও সিরাজের সেনাপতি মীর জাফর এবং জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ইংরেজগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। মীর জাফর নবাবির বিনিময়ে ইংরেজগণকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। আমীনচাঁদ বা উমিচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক্ এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিতেন; তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ক্লাইভ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবার অঙ্গীকারে এক মিথ্যা চুক্তিপত্র করিলেন। ওয়াট্‌সন এইরূপ হীন কার্য্য অনুমোদন না করায় ক্লাইভ সেই চুক্তিপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র

অতঃপর সমরায়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নবাবের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবার মত সামরিক শক্তি ক্লাইভের ছিল না; কিন্তু তিনি জানিতেন যে, নবাবের কর্ম্মচারিগণই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার পরাজয়ের ব্যবস্থা করিবেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মুর্শীদাবাদের তেইশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে **পলাশী** গ্রামের আম্র-কাননে ক্লাইভের সৈন্যদলের সহিত নবাবের **যুদ্ধ** হইল। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। মীর জাফরকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সিরাজ্‌উদ্দৌলা পরে ধৃত হইয়া মীর জাফরের পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। নূতন নবাব কোম্পানিকে এবং ক্লাইভ প্রভৃতি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণকে বহু অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি মীর জাফরের নিকট হইতে **চব্বিশ পরগণার জমিদারি** লাভ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের ভারতবিজয়ের সূচনা হয়।

পলাশীর যুদ্ধ নবাবের পরাজয়

ইংরেজগণের জমিদারি লাভ

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বণিকের মান-দণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ড রূপে।"

নবাব মীর জাফর (১৭৫৭-৬০)—মীর জাফর ইংরেজগণের হস্তে পুত্তলিকাস্বরূপ বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিলেন ; বস্তুতঃ



মীর জাফর

ক্লাইভ্‌ই দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরেজেরা বলপূর্ব্বক নূতন নবাবের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় করিতে চেষ্টা করিল ; ফলে মীর জাফরের নিকট ক্রমেই ইংরেজের প্রভুত্ব অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ইংরেজদিগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি ওলন্দাজগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইংরেজদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। বাংলায় ইংরেজ-প্রভুত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে প্রস্থান করেন।

নবাব মীর কাসিম (১৭৬০-৬৪)—কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের শোষণে রাজকোষ শূন্য হইলে মীর জাফরের যখন আর অর্থ যোগাইবার সাধ্য রহিল না, তখন ইংরেজেরা মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে নবাবের মসনদে স্থাপন করিল। কোম্পানি নূতন নবাবের নিকট হইতে **বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি** লাভ করিল। মীর কাসিম তাঁহার শ্বশুরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান্ ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। ইংরেজের অধীন হইয়া নামে মাত্র নবাবিতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মুর্শীদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংরেজ-প্রভাবের বাহিরে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি **ইংরেজগণের সহিত বিরোধ** এড়াইতে পারিলেন না। এদেশে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কোম্পানির অনেক কর্ম্মচারী এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিও অবৈধভাবে কোম্পানির এই অধিকার ভোগ করিতে এবং নবাবের প্রাপ্য শুল্ক

ইংরেজের নূতন জমিদারি

ফাঁকি দিত। ইহাতে দেশীয় বণিকৃগণের বড়ই অসুবিধা হইত; কারণ তাহারা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ন্যায় অল্প মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে পারিত না। মীর কাসিম এই বিষয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কোনই ফল পাইলেন না। অতঃপর তিনি বিরক্ত হইয়া এদেশের সমস্ত পণ্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ভারতীয় বণিকেরাও কোম্পানির সমান সুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ইংরেজগণ এই ক্ষতি সহ্য করিল না। পাটনার ইংরেজ কুঠির দুর্ব্বিনীত অধ্যক্ষ এলিস্ অতর্কিতভাবে পাটনা অধিকার করিলেন। বাধ্য হইয়া মীর কাসিমকে যুদ্ধে অবতরণ করিতে হইল। **কাটোয়া** প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের **যুদ্ধে** নবাবের সৈন্যগণ ইংরেজদিগের হস্তে পরাজিত হইল। ক্রুদ্ধ নবাব অতঃপর প্রায় দুইশত ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন (১৭৬৩)। পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীর কাসিম অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন এবং মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব-উজীর শুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে **বক্সারের যুদ্ধে** মীর কাসিম ও নবাব-উজীরের সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং এলাহাবাদ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ বিজয়ী ইংরেজগণের পদানত হইল।

ইংরেজের সহিত নবাবের বিরোধ

কাটোয়ার যুদ্ধ

নবাবের পরাজয়

নবাবির পরিণাম—এদিকে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পুনরায় মীর জাফরকে নবাবি প্রদান করিলেন এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অপদার্থ পুত্র নজম্উদ্দৌলাকে বাংলার মসনদে স্থাপিত করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। এইরূপে চারিদিকে যখন বিশৃঙ্খলা এবং ঘুষের রাজত্ব চলিতেছিল, তখন কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ড হইতে পুনরায় ক্লাইভকে বাংলার কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৭৬৫)।

ক্লাইভের শাসনকাল এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫)—ক্লাইভ্ আসিয়াই অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে শুজাউদ্দৌলা কোরা এবং এলাহাবাদ জিলা দুইটি ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। দিল্লীর বাদ্শাহের

তখন কোন ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহার পদবীর যথেষ্ট মর্য্যাদা ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে ঐ দুইটি জিলা উপঢৌকন দিয়া এবং বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়া ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিলেন। উড়িষ্যা বলিতে তখন কেবল মেদিনীপুর জিলা এবং হুগলির কিয়দংশ বুঝাইত; কারণ কটক প্রদেশ (অর্থাৎ উড়িষ্যার পশ্চিমাঞ্চল) তখন মারাঠাগণের অধিকারে ছিল। উত্তর-সরকার (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরাংশ) প্রদেশের জন্যও সম্রাটের সনন্দ লওয়া হইল। ইংরেজগণ দেওয়ানি (অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার) প্রাপ্ত হইয়া বাংলার নবাবকে একটা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিল।

ইংরেজের দেওয়ানি লাভ

ক্লাইভের শাসন-সংস্কার—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার শাসন দ্বিধাবিভক্ত হইল। রাজস্ব বিভাগের ভার কোম্পানির উপর রহিল; কিন্তু নিজামৎ বিভাগের (অর্থাৎ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার) দায়িত্ব বৃত্তিভোগী নবাবের উপর ন্যস্ত রহিল। এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত শাসন ইতিহাসে **দ্বৈত শাসন** (Double Government) নামে পরিচিত। বাংলা ও বিহার 'নায়েব নাজিম' উপাধিধারী যে দুইজন কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইত, তাঁহাদের নিয়োগ ব্যাপারেও কোম্পানির সম্মতির প্রয়োজন হইত। সুতরাং এই সময় হইতে ইংরেজরাই দেশের প্রকৃত প্রভু হইয়া বসিল; কিন্তু দেশের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য নবাব দায়ী রহিলেন। যাঁহার হস্তে ক্ষমতা, তাঁহার দায়িত্ব রহিল না; যাঁহার দায়িত্ব, তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। ফলে বাংলার শাসনকার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল।

দ্বৈত শাসন

ক্লাইভ, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিষিদ্ধ করিলেন, এবং কেহ উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে কর্ম্মচারিদিগের লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন। সৈনিকগণকে সাধারণতঃ যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইত; কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর শান্তির সময়েও তাহারা অতিরিক্ত ভাতা ভোগ করিতে-

ক্লাইভের স্বদেশ গমন

ছিল। ক্লাইভ এই অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ্ পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব—ক্লাইভ্ অসাধারণ সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি এবং ধৈর্য্যও অসাধারণ ছিল। কিন্তু তিনি ধনলোভী এবং কার্য্যসিদ্ধির সম্পর্কে ন্যায়ান্যায়বোধবর্জ্জিত ছিলেন। যাহা হউক, তিনিই যে ভারতে বৃটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার বুদ্ধি ও পরাক্রমবলে কর্ণাটকে এবং বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর-সরকার বিজয়ও তাঁহার কৃতিত্বের ফল। ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার পূর্ব্বাংশ এবং উত্তর-সরকারের অধিকার লাভ করিয়া ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

বৃটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি স্থাপন

কুশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পর **ভেরেল্‌স্ট্** ও **কোর্টিয়ার** নামক কোম্পানির দুইজন কর্ম্মচারী ক্রমান্বয়ে বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইহাদের সময়ে উৎকোচ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। বাংলা ১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে) এদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; সহস্র সহস্র লোক অনাহারে ও রোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু অনশনক্লিষ্ট প্রজার দুঃখ উপেক্ষা করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ নির্ম্মমভাবে কর আদায় কবিতে লাগিলেন। দ্বৈত শাসনের কুফল, অর্থাৎ শাসন ও রাজস্ব বিভাগের ভার বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকার শোচনীয় পরিণাম, পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল। অতঃপর এই সকল অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির পরিচালকবর্গ ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌কে বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

দ্বৈত শাসনের কুফল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ওয়ারেন হেস্‌টিংস্ (১৭৭২-৮৫)

শাসন সংস্কার	...	১৭৭২-৭৪
সম্রাটের বৃত্তি রহিতকরণ এবং অযোধ্যার সহিত সন্ধি		১৭৭৩
রেগুলেটিং অ্যাক্ট	...	১৭৭৩
নন্দকুমারের ফাঁসি	...	১৭৭৫
প্রথম মরাঠা যুদ্ধ	...	১৭৭৫-৮২
দ্বিতীয় মহিশূর যুদ্ধ	...	১৭৮০-৮৪
পিটের ভারত আইন	...	১৭৮৪

শাসন সংস্কার (১৭৭২-৭৪)—ওয়ারেন হেস্‌টিংস্ অতিশয় দক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াই তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। বাংলার নায়েব নাজিম (নবাবের প্রতিনিধি) **মুহম্মদ রেজা খাঁ** এবং বিহারের নায়েব নাজিম **সিতাব রায়** পদচ্যুত হইলেন। **কালেক্টর** নামে পরিচিত বৃটিশ কর্ম্মচারিগণের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত হইল। হেস্‌টিংস্ কলিকাতায় একটি **রেভেনিউ বোর্ড** স্থাপন করিলেন। রাজকোষ মুর্শীদাবাদ হইতে নূতন রাজধানী কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

কালেক্টর

রেভেনিউ বোর্ড



ওয়ারেন হেস্‌টিংস্

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ভূস্বামিগণের সহিত **পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত** করা হইল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারের জন্য কলিকাতায় **সদর দেওয়ানি আদালত** এবং **সদর নিজামৎ আদালত** নামে দুইটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে গ্রন্থাদি অনুবাদেরও ব্যবস্থা করা হইল। বাংলার নবাবের বৃত্তির পরিমাণ কমাইয়া হেস্‌টিংস্ ব্যয় সঙ্কোচ করিলেন।

পাঁচশালা বন্দোবস্ত

আদালত

সম্রাট্ শাহ্ আলম—মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলম ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি দিল্লীতে না গিয়া অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ক্লাইভের সহিত চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তিনি বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি এবং কোরা ও এলাহাবাদ জিলাদ্বয়ের আয় ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষের রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পেশবা প্রথম মাধব রাওর সময়ে গোয়ালিয়রের অধিপতি মহাদজী সিন্ধিয়ার পরামর্শে তিনি মরাঠাগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং তাহাদের আশ্রয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। হেস্‌টিংস্ দেখিলেন যে, অতঃপর সম্রাট্‌কে বৃত্তি প্রদান করিলে উহা ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী মরাঠাদিগের হস্তগত হইবে। সুতরাং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের **বৃত্তি বন্ধ** করিয়া দিলেন এবং কোরা ও এলাহাবাদ জিলার অধিকার অযোধ্যার নবাব-উজীরকে প্রদান করিলেন। নবাব-উজীর উহার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন ; ইংরেজগণও প্রয়োজনের সময়ে তাঁহাকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এতদ্ব্যতীত নবাব-উজীর স্বরাজ্যে বৃটিশ সৈন্য রক্ষার জন্য ইংরেজদিগকে কিছু অর্থ দিতে স্বীকার করিলেন। এইরূপে হেস্‌টিংস্ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল করিয়া তুলেন।

সম্রাটের বৃত্তি বন্ধ

রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৪)—এই সময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য হেস্‌টিংস্ এমন একটি কাজ করিলেন, যাহার জন্য অনেকেই তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রোহিল্‌খণ্ডে আফ্‌গান-জাতীয় পরাক্রান্ত রোহিলা সর্দ্দারগণ রাজত্ব করিতেন। অনেক দিন হইতেই এই সমৃদ্ধ জনপদের উপর অযোধ্যার নবাব লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় ও তৎপ্রদত্ত অর্থের লোভে হেস্‌টিংস্ রোহিলাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রোহিলারা পরাজিত হইল এবং রোহিল্‌খণ্ড অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। রোহিলা নায়কেরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে অর্থের জন্য একটি স্বাধীন জাতির সর্ব্বনাশ করা হইল। হেস্‌টিংসের পক্ষে শুধু এই

রোহিলাদিগের পরাজয়

কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি রোহিলখণ্ড জয়ে অযোধ্যার নবাবের সাহায্য করিয়া একটি অনুগত মিত্রশক্তির বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং রোহিল্‌খণ্ড অধিকার দ্বারা উত্তর-ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বীমরাঠাগণ কর্তৃক শক্তি বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট্ (Regulating Act) বা নিয়ন্ত্রণ আইন (১৭৭৩)—ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল একটি বণিক্‌সমিতির হস্তগত হওয়ায়, এই সময়ে বিলাতের পার্লামেণ্ট সভা কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। একটি বণিক্-সমিতির হস্তে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকে, ইহা কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের প্রস্তাব অনুসারে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামক আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। ইহাতে স্থির হইল যে, অতঃপর কোম্পানির পরিচালকবর্গকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিগণের অবগতির জন্য পাঠাইতে হইবে। বাংলার গভর্ণর 'বাংলার **গভর্ণর জেনারেল**' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং চারিজন সভ্য লইয়া তাঁহার **কাউন্সিল** (শাসন-পরিষদ্) গঠিত হইল। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল অর্থনৈতিক এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের গভর্ণর ও কাউন্সিলের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিন জন সহকারী বিচারক লইয়া কলিকাতায় **সুপ্রীম কোর্ট** (সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়) নামক আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। রেগুলেটিং অ্যাক্টের একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের মতের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল কোন কাজ করিতে পারিতেন না; আবার বোম্বাই ও মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের সহিত এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত স-কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের সম্পর্কের বিষয়ও স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ হয় নাই। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে পাঁচ বৎসরের জন্য হেস্টিংস্ বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন এবং বার্‌ওয়েল, ক্লেভারিং, মন্‌সন ও ফান্সিস্ নামক চারিজন সভ্য লইয়া তাঁহার কাউন্সিল গঠিত হইল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল

সুপ্রীম কোর্ট

রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটি

সার এলিজা ইম্পে নামক হেস্‌টিংসের এক বাল্যবন্ধু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত বিরোধ—কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা গেল, একমাত্র বার্‌ওয়েল ব্যতীত অন্য কোন সভ্যই হেস্‌টিংসের কোন কার্য্য সমর্থন করিতে চাহেন না। সুতরাং হেস্‌টিংসের পক্ষে মাত্র দুই ভোট এবং তাঁহার বিরোধিগণের পক্ষে তিন ভোট হওয়ায়, গবর্নর জেনারেল পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মন্‌সনের মৃত্যু হইলে, গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার বিরোধিগণের বিতর্কে উভয়পক্ষে সমানসংখ্যক ভোট হইত; সুতরাং হেস্‌টিংস্ তাঁহার অতিরিক্ত ভোটের (casting vote) জোরে ইচ্ছামত শাসনকার্য্য পরিচালনার সুযোগ পাইলেন। ক্লেভারিঙের মৃত্যুর পর হেস্‌টিংস্‌কে আর অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

গভর্নর জেনারেলের অসুবিধা

নন্দকুমারের ফাঁসি (১৭৭৫)—কাউন্সিলে হেস্‌টিংসের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন ফ্রান্সিস্। তাঁহার প্ররোচনায় হেস্‌টিংসের শত্রুগণ নানারূপ অভিযোগ আনয়ন করিয়া হেস্‌টিংসকে অপসারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হেস্‌টিংসের বিরুদ্ধে মীর জাফরের পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ লইবার অভিযোগ আনয়ন করেন। হেস্‌টিংস্‌ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগ আনিলেন। এই উভয় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে নন্দকুমার অপরাধী স্থির হইলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের আইন অনুসারে জালিয়াতির অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি হইল। অনেকে মনে করেন যে, নন্দকুমারের এই শোচনীয় পরিণাম হেস্‌টিংসেরই চক্রান্তের ফল। এই অনুমান সত্য না হইতে পারে; কিন্তু হতভাগ্য নন্দকুমারের প্রতি সত্যই সুবিচার করা হয় নাই।

হেস্‌টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

নন্দকুমারের পরিণাম

সুপ্রীম কোর্টের সহিত বিরোধ—রেগুলেটিং অ্যাক্টে স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের সহিত সুপ্রীম কোর্টের সম্পর্ক পরিস্কাররূপে নির্দ্ধারিত

স্থপ্রীম কোর্টের সহিত বিরোধ

ছিল না। স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ গভর্নমেণ্টের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং মনে করিতেন যে, তাঁহাদের স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের পর্য্যন্ত বিচার করিবার অধিকার আছে। এই দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে হেস্‌টিংস্ স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কোম্পানির কর্ম্মচারিরূপে সদর দেওয়ানি আদালতের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা স্থপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

প্রথম মরাঠা যুদ্ধ বা প্রথম ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২)— ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা নারায়ণ রাও তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাওর ষড়্‌যন্ত্রে নিহত হন। রঘুনাথ স্বয়ং পেশবার পদ অধিকার করেন। কিন্তু মৃত পেশবার বিধবা পত্নীকে গর্ভবতী জানিয়া অনেক মারাঠা নায়ক নারায়ণ রাওর ভাবী সন্তানের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক রঘুনাথের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। **নানা ফড়্‌নবিস** নামক একজন কুটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রঘুনাথের বিপক্ষদলের নেতা ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বালাজী জনার্দ্দন, কিন্তু তিনি বংশানুক্রমে ফড়্‌নবিসের (অর্থাৎ হিসাব বিভাগের অধ্যক্ষের) কার্য্য করিতেন বলিয়া নানা ফড়্‌নবিস নামে স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। পেশবা মাধব রাওর সময়ে তিনি দক্ষতাপ্রভাবে ক্ষমতাশালী হন। নারায়ণ রাওর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইনি **দ্বিতীয় মাধব রাও** (১৭৭৪-৯৬) নামে পরিচিত। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ নিরুপায় হইয়া রাজ্যলাভের জন্য ইংরেজের সাহায্য গ্রহণের সঙ্কল্প করেন এবং সাহায্যের বিনিময়ে কোম্পানিকে সাল্‌সেটি ও বেসিন প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া বোম্বাইর গভর্নর ও কাউন্সিলের সহিত **স্থরতে** এক **সন্ধি** করেন। কিন্তু বাংলার গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল স্থরতের সন্ধি বাতিল করিয়া পর বৎসর **পুরন্দর** নামক স্থানে নূতন এক **সন্ধি** করিলেন। পুরন্দরের সন্ধি অনুসারে ইংরেজগণ নানা ফড়্‌নবিসের নিকট হইতে সাল্‌সেটি পাইয়া রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিতে স্বীকার করেন। বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা না মানিয়া রঘুনাথকে আশ্রয় দিলেন। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ

নানা ফড়্‌নবিস

স্থরত ও পুরন্দরের সন্ধি

বোম্বাই কর্তৃপক্ষের কার্য্যই সমর্থন করিলেন; সুতরাং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পক্ষের নায়ক **ওয়াড়গাঁও** নামক স্থানে অত্যন্ত অপমানজনক শর্ত্তে **সন্ধি** করিতে বাধ্য হইলেন। ওয়াড়গাঁওর সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, ইংরেজগণ রঘুনাথকে মারাঠাদিগের হস্তে অর্পণ করিবে এবং এবং বিজিত স্থান-সমূহের অধিকার পরিত্যাগ করিবে।

ওয়াড়গাঁওর সন্ধি



নানা ফড়্‌নবিস

হেস্‌টিংস এই সন্ধি অস্বীকার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। বাংলা হইতে একদল সৈন্য সুরটে প্রেরিত হইল। এই সময়ে বরোদার গায়কবাড়ের সহিত ইংরেজগণ মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরেজদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সিন্ধিয়ার রাজ্যান্তর্গত **সল্‌বই** নামক স্থানে **সন্ধি** হইল। সল্‌বইর সন্ধি অনুসারে ইংরেজগণ সাল্‌সেটি পাইল এবং রঘুনাথকে বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজেরা দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশবা বলিয়া স্বীকার করিল। এই সময়ে ইংরেজগণ মহিসূরের সহিত পুনরায় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল; এই জন্য দূরদর্শী নানা ফড়্‌নবিস শীঘ্র সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু মহাদজী সিন্ধিয়া উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের জন্য ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া সত্বর ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন।

সল্‌বইর সন্ধি

দ্বিতীয় মহিসূর যুদ্ধ বা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহিসূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪)— ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ফরাসিগণের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরেজেরা ভারতে ফরাসি উপনিবেশসমূহ অধিকার করে। এই সময়ে মালাবার উপকূলস্থিত ফরাসি শাসনাধীন মাহে বন্দর ইংরেজকর্তৃক

অধিকৃত হইয়াছিল। মাহে মহিসূরপতি হায়দর আলির রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া হায়দর ইংরেজগণের এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। হায়দর মরাঠাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরেজেরা তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। তিনি ইংরেজগণের এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ কখনও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। প্রতিশোধ লইবার জন্য মরাঠা ও ইংরেজগণের মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগে হায়দর নিজামের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে নিজাম নিবৃত্ত হইলেও, হায়দর একাকী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কঞ্জীবরমের নিকটে হায়দর ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল বেইলির সেনাদলকে ধ্বংস করেন; কিন্তু পর বৎসর সেনাপতি আয়ার কূট পোর্টো নোভো নামক স্থানে হায়দরকে পরাজিত করেন। অতঃপর হায়দর আলির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতেও সমরানল নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহার বীর পুত্র তীপূ মহিসূরের সুল্‌তানরূপে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে **মঙ্গলোরে** তীপূর সহিত ইংরেজগণের **সন্ধি** হয়। মঙ্গলোরের সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষ বিজিত স্থান এবং বন্দী বিনিময় করিল।

হায়দর আলির সহিত বিরোধ

হায়দরের পরাজয় ও মৃত্যু

মঙ্গলোরের সন্ধি

অর্থাভাব—এতদিন বাংলার ধনভাণ্ডার ইংরেজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের খরচ যোগাইতেছিল। কিন্তু অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ইংরেজের কোষ শূন্য হইয়া আসিল। স্বদেশ হইতে হেস্‌টিংসের অর্থ বা সৈন্য সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। অর্থাভাবে ন্যায়ান্যায়বোধবর্জ্জিত হইয়া হেস্‌টিংস এই সময়ে যে উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে জন্য সকলেই তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন।

বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি অত্যাচার (১৭৮১)—অযোধ্যার নবাব-উজীরের অধীন চৈৎসিংহ বারাণসীর জমিদার ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব-উজীর ইংরেজদিগকে বারাণসীর অধিকার প্রদান করিলে, রাজা চৈৎসিংহের সহিত ইংরেজগণের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে চৈৎসিংহ বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন। রাজা নিয়মিতভাবে এই কর দিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, হেস্‌টিংস

মাঝে মাঝে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করিলেও তিনি সে দাবি পূরণ করিতেন। হেস্‌টিংসের দাবি অনুসারে তিন বৎসরে (১৭৭৮-৮০) চৈৎসিংহ পনর লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণের জন্য চৈৎসিংহের প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। ঐ আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনের অজুহাতে হেস্‌টিংস্ চৈৎসিংহের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন এবং ঐ অর্থ আদায়ের জন্য সসৈন্যে স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। নিতান্ত অকারণে চৈৎসিংহকে বন্দী করা হইলে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া হেস্‌টিংসের সিপাহীদিগের প্রাণ সংহার করিল; হেস্‌টিংস্ প্রাণভয়ে চুণারে পলায়ন করিলেন। কিন্তু অতঃপর চৈৎসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা করদানে স্বীকৃত হওয়ায় চৈৎসিংহের জনৈক আত্মীয়কে বারাণসীর জমিদারি প্রদান করা হইল। এইরূপে কোম্পানির বার্ষিক সাড়ে সতর লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইহাতে হেস্‌টিংসের অর্থের প্রয়োজন মিটিল না।

হেস্‌টিংসের অন্যায় দাবি

চৈৎসিংহের পলায়ন

কোম্পানির আয়বৃদ্ধি

অযোধ্যার বেগমগণের উপর জুলুম (১৭৮২)—অযোধ্যায় বৃটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংরেজগণ যে অর্থ পাইত, নবাব-উজীর আসফ্‌উদ্দৌলার নিকট সে বাবদ বহু অর্থ বাকি পড়িয়াছিল। হেস্‌টিংস্ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব-উজীর বলিলেন যে, তাঁহার মাতা ও পিতামহীর সঞ্চিত অর্থ হস্তগত না হইলে তিনি ইংরেজদিগকে তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারিবেন না। বেগমেরা তখন ফৈজাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। হেস্‌টিংস্ নবাবকে বলপূর্ব্বক বেগমদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল ইংরেজ সৈন্য ফৈজাবাদে প্রেরণ করিলেন। বেগমগণকে নানারূপে বিপন্ন করিয়া এবং তাঁহাদের খোজা প্রহরীদিগের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়া ৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হেস্‌টিংসের পক্ষে অত্যন্ত হীন এবং কাপুরুষোচিত কার্য্য হইয়াছিল।

হেস্‌টিংস্ কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ

হেস্‌টিংসের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন (১৭৮৫)—এই সকল অনাচারের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছাইলে, হেস্‌টিংসের শত্রুগণ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর হেস্‌টিংস্ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। স্বদেশে উপস্থিত হইলে, পার্লামেণ্টে তাঁহার কু-শাসন সম্বন্ধে অভিযোগ (Impeachment) উপস্থিত হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল বিচার চলিবার পর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

হেস্‌টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হেস্‌টিংসের কৃতিত্ব—ভারতবর্ষের বিদেশীয় শাসকগণের মধ্যে হেস্‌টিংসের স্থান অতি উচ্চে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিপদে অবিচলিত এবং দূরদর্শী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শাসন-দক্ষ, উদার ও বিদ্যোৎসাহী রাজনীতিবিদ্ এদেশের ইংরেজ শাসকগণের মধ্যে বিরল। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি অত্যন্ত অন্যায় এবং সমর্থনের অযোগ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাকে অনেক বাধাবিঘ্ন এবং অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। ভারতে বৃটিশ অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে যখন মরাঠা, হায়দরাবাদ, মহিসুর্ প্রভৃতি শক্তিসমূহের চাপে উদীয়মান বৃটিশ-প্রভুত্ব অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছিল, তখন এই অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তিবলেই উহার আসন্ন বিনাশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। ক্লাইভের কৃতিত্বে ভারতে বৃটিশ শাসন-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়; হেস্‌টিংস্ উহাকে ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ হইতে রক্ষা করিয়া একটি দৃঢ়মূল পাদপে পরিণত করেন। পরবর্ত্তী কৃতী ইংরেজ শাসকগণের চেষ্টায় উহা একটি বনস্পতিতে পরিণত হইয়াছিল।

শাসনদক্ষতা

ভারতে বৃটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠা

★ **পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)**—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের চেষ্টায় পার্লামেণ্টে ভারতশাসন-সংক্রান্ত একটি আইন (Pitt's India Act) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত ছয় জন সদস্য দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসন পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। পরিষদের নাম হইল **বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোল** (Board of Control) বা নিয়ন্ত্রণ

বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল

পরিষদ্। এই আইনে কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত শাসনের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের হস্তে স্থানান্তরিত হইল। কারণ, নিয়ন্ত্রণ-পরিষদের সভাপতি ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন এবং এই সভাপতি আবার পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী রাজার মন্ত্রিগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইতেন। পিটের আইনে বাংলার গভর্ণর জেনারেল ও তিন জন সদস্য দ্বারা গঠিত কাউন্সিলের হস্তে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সন্ধি-বিগ্রহ এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল। এইরূপে রেগুলেটিং অ্যাক্টের একটি বড় ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিস্ ও সার জন শোর

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ	...	...	১৭৯০-৯২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	...	...	১৭৯৩
মহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু	...	...	১৭৯৪
খর্দ্দার যুদ্ধ	...	...	১৭৯৫

লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩)

কার্য্যভার গ্রহণ—হেস্টিংস্ প্রস্থান করিলে, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিস এদেশের গভর্নর জেনারেল হইয়া আগমন করেন।

কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময়ে গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি রূপে লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিসের উপর সামরিক ও অসামরিক বিভাগের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। এদেশের শাসন-ব্যাপারের সমস্ত অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্যই কর্তৃপক্ষ এই সদাশয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন, এবং কউন্সিলের মতের বিরুদ্ধেও তিনি নিজের বিবেচনামত কাজ করিতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্তৃত্ব হাতে থাকায় শাসনসংস্কারে কর্ন্ওয়ালিসের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। এদেশের শাসন ব্যাপারে তিনি যতগুলি সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন, তন্মধ্যে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

কর্ন্ওয়ালিসের সুবিধা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement), ১৭৯৩—এদেশের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎভাবে কৃষকগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন না। জমিদারগণ কর আদায় করিয়া তাহার একটি অংশ ইংরেজদিগকে প্রদান করিতেন। হেস্টিংস্ পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জমির উপর জমিদারের স্থায়ী স্বত্ব ছিল না; মেয়াদ অন্তে যিনি অধিক খাজনায় জমিদারি ডাকিয়া লইতেন, তাঁহাকেই প্রজার নিকট হইতে কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হইত। ইহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক লাভের আশায় জমিদারগণ প্রজার উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে কৃষকেরা অনেক সময়ে ক্ষেত্র কর্ষণ না করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিত। ইহাতে দেশে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং জমির মূল্য কমিয়া গিয়াছিল। অনেক সময় দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা অত্যধিক রাজস্ব দিতে স্বীকার হইয়া জমিদারি লইত; কিন্তু পরে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত না। সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণে এইরূপ অনিশ্চয়তা থাকায় শাসনকার্য্য পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার সৃষ্টি হইত। লর্ড কর্ন্‌ওয়ালিস্ ইংলণ্ডের মত এদেশে প্রজাগণের সুখ-দুঃখের প্রতি মনোযোগী জমির বংশগত মালিক এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিতে চাহিলেন। তিনি জমিদারের দেয় করের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিলে জমিদারগণ পুরুষানুক্রমে জমিদারি ভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহার অন্যথা ঘটিলে যে-কোন ব্যক্তি নিলামে জমিদারি কিনিয়া লইতে পারিবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবস্থা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত হয়; দুই বৎসর পরে বারাণসীতেও ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।

পাঁচশালা বন্দোবস্তের কুফল

বংশানুক্রমিক জমিদার সৃষ্টি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কর্ন্‌ওয়ালিস্ কৃষি ও কৃষকগণের এবং জমিদারের অবস্থা উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইল না। কৃষককে জমিদারের দয়ার উপরেই নির্ভর করিতে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল

হইল। পরে কয়েকটি প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইলে কৃষকের স্বার্থ কতকটা সংরক্ষিত হইয়াছিল। প্রথমে এই ব্যবস্থায় জমিদারেরাও লাভবান্ হন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিবার নিয়মের কঠোরতা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া রাজস্ব বাকি ফেলায়, প্রথম দিকে অনেক জমিদারের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদিগের অবস্থার উন্নতি হয়। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে বংশগত জমিদার এবং প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব জইল। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার একটি ত্রুটি এই যে, জমি জরিপ না করাইয়া আনুমানিক লাভের হিসাব অনুসারে জমিদারি বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ভূমির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পাইলেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারের দেয় নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না; সুতরাং অর্থের প্রয়োজন হইলে প্রজার উপর নূতন নূতন কর ও শুল্ক বসাইয়া ঐ অভাব দূর করিতে হইত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়ায়, সেকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শাসন পরিচালনার কার্য্যে কোম্পানির যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

অন্যান্য সংস্কার—এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বেতন অল্প ছিল বলিয়া তাঁহারা নানা অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার অবৈধ উপার্জ্জন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি প্রদেশগুলিকে বহুসংখ্যক **জিলা**য় বিভক্ত করেন। প্রতি জিলায় বিচারালয় স্থাপিত হইল। জিলা আদালতের বিচারক (District Judge) ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও পুলিস বিভাগের পরিচালনাভার প্রাপ্ত হইলেন। কালেক্টর (Collector) উপাধিধারী রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের বিচার করিবার অধিকার রহিত করা হইল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হইল। বিচারকার্য্যে ইংরেজ বিচারপতিকে সাহায্য করিবার জন্য দেওয়ানি আদালতগুলিতে একজন হিন্দু পণ্ডিত ও একজন মুসলমান কাজী নিযুক্ত হইলেন। মুসলমান আইন অনুসারে ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার হইত; কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ম্মম শাস্তির

কর্ম্মচারীর বেতনবৃদ্ধি

জিলা

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত

প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল। কর্ন্‌ওয়ালিস্ এক বিরাট্ আইন গ্রন্থ (Cornwallis Code) সংকলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চারিটি **প্রাদেশিক বিচারালয়** স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়ের বিচারকগণ বিভিন্ন জিলায় ভ্রমণ করিয়া ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। কর্ন্‌ওয়ালিস্ প্রত্যেক জিলা কতকগুলি **থানাতে** বিভক্ত করিয়াছিলেন ; থানার ভার দারোগাসংজ্ঞক কর্ম্মচারির উপর অর্পিত হয়। কিন্তু কর্ন্‌ওয়ালিসের শাসনব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি ভারতীয়গণকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন না। ভারতীয় কর্ম্মচারীর কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতার উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। ফলে অল্পসংখ্যক বৃটিশ কর্ম্মচারীর উপর অত্যধিক কাজের ভার পড়িয়াছিল।

কর্ন্‌ওয়ালিস্ কোড

থানা

ভারতীয়দিগের প্রতি অনাস্থা

তৃতীয় মহিসূর্ যুদ্ধ বা তৃতীয় ইঙ্গ-মহিসূর্ যুদ্ধ (১৭৯০-৯২) —পিটের ভারত আইনে নির্দ্দেশ ছিল যে, ইংরেজগণ এদেশে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে পারিবে না। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্ন্‌ওয়ালিস্‌কে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মহিসূরের তীপূ সুল্‌তান ইংরেজের মিত্র ত্রিবাঙ্কুর-রাজের রাজ্য আক্রমণ করিল, পর বৎসর কর্ন্‌ওয়ালিস্ তীপূর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তীপূর রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে, এই শর্ত্তে ইংরেজগণ নিজাম ও মরাঠাদিগের সহিত মিত্রতা করিল। অতঃপর সমবেত মিত্রশক্তি মহিসূর্ রাজ্য আক্রমণ করিল। কর্ন্‌ওয়ালিস্ স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য তীপূর রাজধানী

তীপূ কর্তৃক ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ



তীপূ সুল্‌তান

সেরিঙ্গপটমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়। তীপুকে বাধ্য হইয়া সন্ধি করিতে হইল। **সেরিঙ্গপটমের সন্ধি** অনুসারে তীপু রাজ্যের অর্দ্ধাংশ বিজেতৃগণের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন এবং তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করিলেন। জামিন স্বরূপ তীপু তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরেজদিগের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হন। এইরূপে তীপুর প্রভাব খর্ব্ব হইল। মহিষুর্ রাজ্যের বিজিত অংশের মধ্যে মালাবার, কুর্গ্, মদুরা ও সালেমের কিয়দংশ ইংরেজগণের ভাগে পড়িল। তীপুর পরাজয় সেরিঙ্গপটমের সন্ধি

কোম্পানির নূতন সনন্দ ও কর্ন্ওয়ালিসের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিশ বৎসরের মেয়াদে নূতন সনন্দ লাভ করিল। ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রহিল। এই বৎসরই লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিস্ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এদেশের শাসন বিভাগের নানা দুর্নীতি দূর করিবার জন্য তিনি সাধুতা ও আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সার জন শোর (১৭৯৩-৯৮)

শোরের নীতি—লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিসের পরে কোম্পানির কর্ম্মচারী সার জন শোর গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি পিটের ভারত আইন অনুসারে দেশীয় রাজগণের সন্ধি-বিগ্রহ ব্যাপারে **ঔদাসীন্য নীতি** (Policy of Non-intervention) অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ নিজামকে আক্রমণ করিলে, তিনি নিজামের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব অসফ্-উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তিনি মৃত নবাবের মনোনীত উত্তরাধিকারী মীর্জ্জা আলিকে বঞ্চিত করিয়া অসফের ভ্রাতা **সাদৎ আলি খাঁকে** নবাবের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। নূতন নবাবের নিকট হইতে ইংরেজগণ এলাহাবাদের অধিকার পাইল। ঔদাসীন্যমূলক শাসননীতি

নিজাম ও মরাঠাগণ—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্ধিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মরাঠা সাম্রাজ্যে নানা ফড়্নবিসের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। নামে পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাও মন্ত্রী হইলেও, কার্য্যতঃ তিনিই মরাঠা সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিতেন। তাঁহার প্ররোচনায় মরাঠা কর্ত্তৃক নিজামের পরাজয়

মরাঠাগণ নিজামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। সার জন শোর নিজামকে সাহায্য করিলেন না। ফলে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে **খর্দ্দা** নামক স্থানে নিজাম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তাঁহাকে নিজ রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে হইল।

এদিকে নানা ফড়্‌নবিসের কঠোর ব্যবহার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাও আত্মহত্যা করেন (১৭৯৬)। তখন রঘুনাথ

পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও

বা রাঘোবার পুত্র **দ্বিতীয় বাজীরাও** পেশবা-পদ লাভ করিলেন। এই সময়ে মরাঠা নায়কগণ শোচনীয় আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ফলে নিজাম তাঁহার পূর্ব্বক্ষতি অনেকাংশে পূরণ করিয়া লইতে সমর্থ হন।

Model Questions

1. Briefly describe the struggle between the English and the French for supremacy in South India with reference to the career and policy of Dupleix.

2. Sketch the career of Clive in India with regard to (a) his contribution to the foundation of British domination in India, and (b) the Double Government established by him in Bengal.

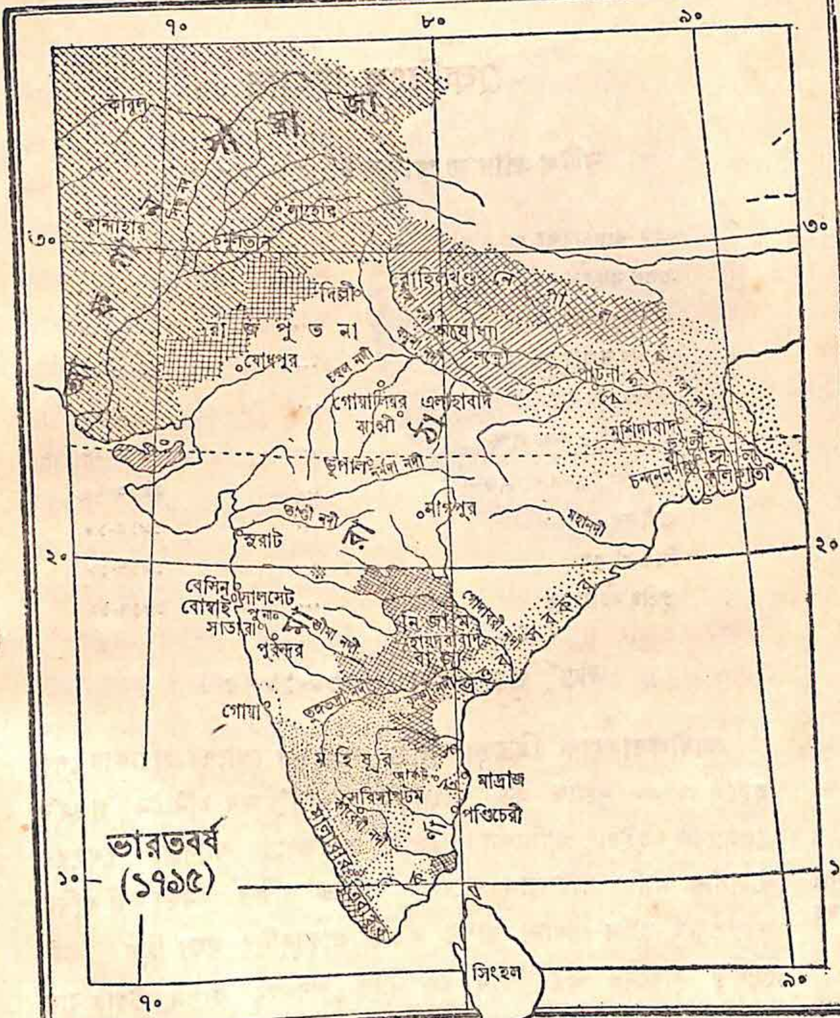
3. Describe the government of Warren Hastings with special reference to (a) his character and achievements, (b) his revenue, judicial and financial reforms, and (c) the extent of British possessions in India about the time of his departure.

4. What dangers and difficulties faced the British in India in the time of Warren Hastings? How did he overcome them?

5. Discuss British relations with Mysore under Warren Hastings and Lord Cornwallis.

6. Describe the measures of land-revenue introduced by Lord Cornwallis and point out its merits and demerits.

7. Write notes on—(1) The Regulating Act of 1773, (2) Pitt's India Act of 1784, (3) Shore's Policy of Non-intervention.



আফগানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের কিয়দংশ আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানীর বংশধরগণের অধীন ছিল। পঞ্জাবে শিখগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ্‌ আলমের কোন ক্ষমতা ছিল না। অযোধ্যার নবাব, রাজপুত রাজগণ, হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহিষূরের টীপু সুল্‌তান স্বাধীন ছিলেন। মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ মরাঠাদিগের অধীন ছিল বোম্বাই, বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিয়দংশ, বাংলা এবং বিহার প্রদেশ ইংরেজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

একবিংশ অধ্যায়

বৃটিশ-প্রাধান্য স্থাপন (১৭৯৮-১৮২৩)

লর্ড্ ওয়েলস্‌লির শাসন কাল	...	১৭৯৮-১৮০৫
চতুর্থ মহিশূর্ যুদ্ধ	...	১৭৯৯
বেসিনের সন্ধি	...	১৮০২
দ্বিতীয় মরাঠা যুদ্ধ	...	১৮০৩-০৫
অমৃতসরের সন্ধি	...	১৮০৯
কোম্পানির সনন্দ লাভ	...	১৮১৩
লর্ড্ হেস্‌টিংসের শাসনকাল	...	১৮১৩-২৩
গুর্খা যুদ্ধ	...	১৮১৪-১৬
পিণ্ডারী যুদ্ধ	...	১৮১৭-১৮
তৃতীয় মরাঠা যুদ্ধ	...	১৮১৭-১৯

লর্ড্ ওয়েলস্‌লি (১৭৯৮-১৮০৫)

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি—সার জন শোরের কার্য্যকাল শেষ হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ ওয়েলস্‌লি (আর্ল্ অব মর্নিংটন) গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াই শোরের ঔদাসীন্য নীতি পরিত্যাগ করেন। অন্যান্য শক্তির ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ-প্রাধান্য স্থাপন করাই ওয়েলস্‌লির লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে নীতি অবলম্বন করেন, উহার নাম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Policy of Sudsidiary Alliance)।

অধীনতা মূলক নীতির উদ্দেশ্য

এই নীতির অর্থ এই যে, বৃটিশ সরকার ভারতীয় মিত্র রাজ্যসমূহকে সর্ব্বপ্রকার শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মিত্ররাজ্যে এক দল বৃটিশ সৈন্য রাখিবেন। ইহার বিনিময়ে মিত্র রাজগণকে তাঁহাদের সেনাদল হইতে ফ্রান্স্ প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের সৈন্যদিগকে বিদায় দিতে হইবে, বৃটিশ সরকারের বিনা অনুমতিতে অপর

উহার অর্থ

কোন শক্তির সহিত সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত হইবার অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে, এবং নিজ রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত বৃটিশ সৈন্যগণের ব্যয়-বহনের জন্য বৃটিশ সরকারকে অর্থ অথবা রাজ্যের কোন অংশ প্রদান করিতে হইবে। মরাঠা আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত, দুর্ব্বল নিজাম সর্ব্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করিয়া ইংরেজের আশ্রিত নৃপতিরূপে পরিগণিত হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি নিজ রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন।

নিজাম কর্তৃক মিত্রতা স্বীকার



লর্ড ওয়েলস্‌লি

চতুর্থ মহিসূর্ যুদ্ধ (বা চতুর্থ ইঙ্গ মহিসূর্ যুদ্ধ) এবং মহিসূরের পতন (১৭৯৯)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে ফরাসি গণতন্ত্রের সহিত ইংরেজগণের যুদ্ধ চলিতেছিল। মহিসূরের টীপূ সুল্‌তান ফরাসিদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন জানিতে পারিয়া ওয়েলস্‌লি তাঁহাকে অধীনতামূলক মিত্রতা অবলম্বন করাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু মহাবীর টীপূ এই অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহিসূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। ইংরেজ সৈন্য মহিসূরের রাজধানী সেরিঙ্গপটমে প্রবেশ করিলে, টীপু রাজধানী রক্ষার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর ইংরেজপক্ষ এবং ইংরেজের মিত্র নিজাম টীপূর রাজ্যের অধিকাংশ ভাগাভাগি করিয়া লন। ইংরেজগণ কানাড়া (অর্থাৎ পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ) এবং অন্যান্য কতিপয় স্থান লাভ করিল। নিজামের প্রাপ্ত অংশও কিয়ৎকাল পরে ইংরেজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। বাকী অংশ প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের কৃষ্ণরাজা নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করা হইল।

টীপূর মিত্রতা গ্রহণে অসম্মতি

টীপূর পরাজয় ও মৃত্যু

তীপূ সুলতানের চরিত্র—সমসাময়িক ভারতীয় রাজগণের মধ্যে তীপূর স্থান অতি উচ্চে। তিনি সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, উদ্যমশীল ও চরিত্রবান্ নরপতি ছিলেন। তীপূর ন্যায় বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী এবং রাজনীতির অনুরাগী ব্যক্তি তৎকালে ভারতীয় রাজগণের মধ্যে একান্ত বিরল ছিল। তিনি আফ্‌গানিস্থান, তুরুষ্ক ও ফ্রান্স্ এবং মরিশিয়স্ প্রভৃতি ফরাসি উপনিবেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তীপূ জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন এবং মুসলমান হইয়াও হিন্দুমন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি অসমসাহসী বীর ছিলেন; কিন্তু হায়দার আলির ন্যায় তাঁহার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ছিল না। ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ তীপূকে নিষ্ঠুর, ধর্ম্মান্ধ, অত্যাচারী এবং বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইংরেজগণের রাজ্যবিস্তার—পিটের ভারত আইনের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া ওয়েল্‌স্‌লি আরও কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরতের নবাবকে পেন্‌শন দিয়া **তাঞ্জোর ও সুরত** অধিকার করা হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাবকে ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগে পদচ্যুত করিয়া **কর্ণাটক** অধিকার করা হইল। অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলির বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ আনয়নপূর্ব্বক ওয়েল্‌স্‌লি গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের কিয়দংশ এবং গোরক্ষপুর ও রোহিলখণ্ড অঞ্চল হস্তগত করিয়াছিলেন।

তাঞ্জোর ও সুরত

কর্ণাটক ও অযোধ্যা

বেসিনের সন্ধি (১৮০২) ও দ্বিতীয় মরাঠা যুদ্ধ বা **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-০৫)**—১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়্‌নবিসের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বাজীরাওর পেশবাপদ প্রাপ্তির (১৭৯৬) পর হইতেই মরাঠা সাম্রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হোলকর রাজ্যের রাণী পূতচরিত্রা অহল্যাবাঈর মৃত্যুর পর যশোবন্তরাও হোলকর রাজ্য লাভ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে **পুণার যুদ্ধে** তিনি সিন্ধিয়া এবং পেশবা বাজীরাওকে পরাজিত করেন। পরাজিত হইয়া পেশবা রাজধানী হইতে পলায়নপূর্ব্বক লর্ড্ ওয়েল্‌স্‌লির অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। যে চুক্তি অনুসারে তিনি ইংরেজের অধীন মিত্ররূপে

পেশবা কর্তৃক মিত্রতা গ্রহণ

পরিগণিত হন, উহা **বেসিনের সন্ধি** নামে বিখ্যাত। পেশবার এই হীনতাস্বীকারে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং বেরারের ভোঁস্লে রাজা ইংরেজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। একদল সৈন্যের সাহায্যে বাজীরাও পুণায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কোম্পানির শত্রুদিগের সহিত গোপনে মিলিত হইলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা আর্থার ওয়েল্স্লি (পরবর্ত্তী কালের নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটন) সিন্ধিয়া ও ভোঁস্লের মিলিত সৈন্যদলকে ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী **আসাইর যুদ্ধে** সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিয়ৎকাল পরে বেরারের অন্তর্গত **আর্গাঁও** নামক স্থানে ভোঁস্লে পুনরায় পরাজিত হন। তিনি অতঃপর **দেওগাঁও** নামক স্থানে **সন্ধি** করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন এবং কটকপ্রদেশ (অর্থাৎ উড়িষ্যার পশ্চিমাঞ্চল) ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে দিল্লী সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইল, এবং তাঁহার বিশালবাহিনী আলোয়ারের অন্তর্গত **লাসোয়ারির যুদ্ধে** ইংরেজ সেনাপতি লেক কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল (১৮০৩)। অতঃপর **সুর্জি অর্জ্জুনগাঁওর সন্ধি** অনুসারে সিন্ধিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন।

ভোঁস্লে কর্ত্তৃক মিত্রতা গ্রহণ

সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মিত্রতা গ্রহণ

যশোবন্ত রাও হোল্কর এতদিন পরে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি মন্সনের বিরাট্ সেনাদল হোল্করের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। কিন্তু শীঘ্রই **দীগের যুদ্ধে** হোল্কর ইংরেজগণের হস্তে পরাজিত হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি লেক **ভরতপুরের জাঠ-দুর্গ** অবরোধ করিয়া ব্যর্থকাম হন। এই সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে লর্ড ওয়েল্স্লি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায় ইংরেজগণের উগ্র রণনীতি পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে মরাঠাশক্তি আপাততঃ ধ্বংস হইল না। কয়েক বৎসর পরে লর্ড্ হেস্টিংস্কে পুনর্ব্বার মরাঠাগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

হোল্করের সহিত যুদ্ধ

মহিষুর বিজয় ও মরাঠা দমন

ওয়েল্‌স্‌লির স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও কৃতিত্ব—ওয়েল্‌স্‌লি এদেশে বৃটিশ শক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মহিষূরের শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং মরাঠাদিগকে নির্জ্জীব করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাধিকার নীতি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে অজস্র অর্থ ব্যয় হইতেছিল। কর্নেল মন্‌সনের পরাজয় এবং লেকের ব্যর্থতার বার্ত্তা ইংলণ্ডে পৌছিলে কর্ত্তৃপক্ষ ওয়েল্‌স্‌লিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে অনুগ্রপন্থী কর্ন্‌ওয়ালিস্‌কে ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য পুনরায় এদেশে পাঠাইলেন।

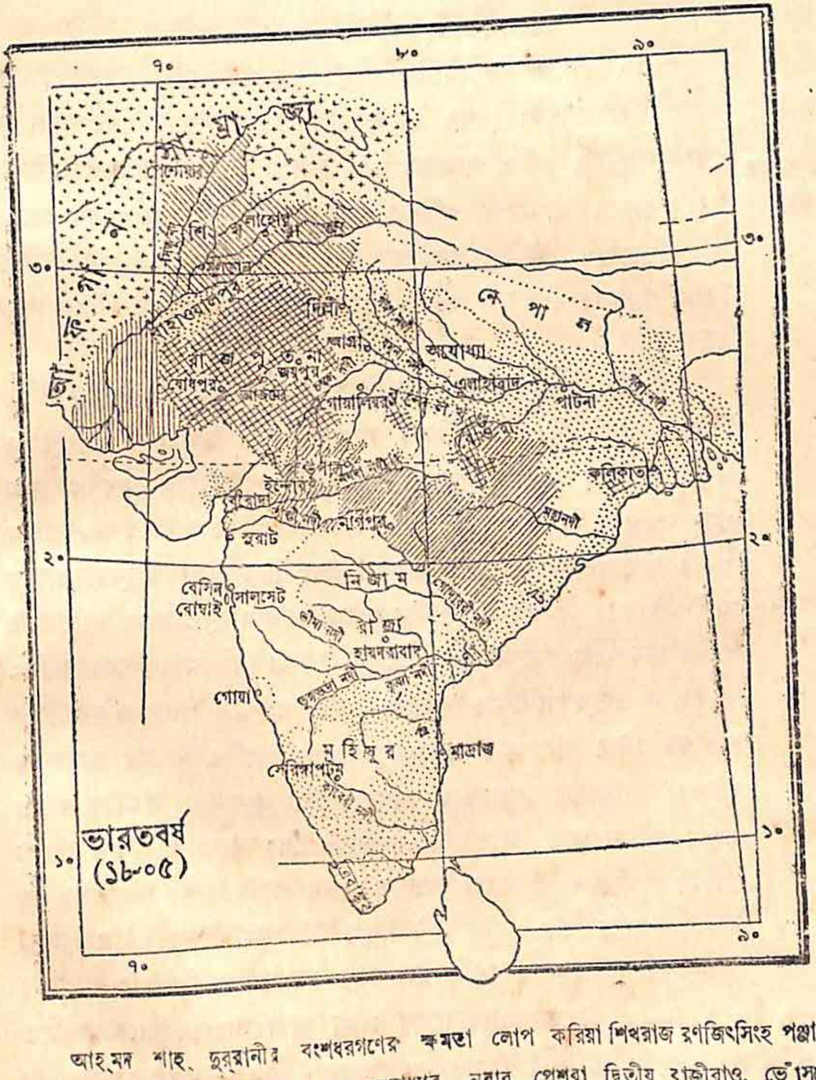
ফরাসি প্রভাব উন্মূলন

ওয়েল্‌স্‌লি ভারতে ফরাসিগণের প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছিলেন। বিদেশে ফরাসি-প্রভাব রোধ করিবার জন্য তিনি **মিশর ও পারস্যে অভিযান** প্রেরণ করেন। এই দুই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে বিব্রত থাকিয়াও ওয়েল্‌স্‌লি সাধারণ শাসনকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। সিভিলিয়ান-দিগের শিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় **ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজ** স্থাপন করিয়াছিলেন।

লর্ড্‌ কর্ন্‌ওয়ালিস্‌ (১৮০৫) ও সার জর্জ্জ্‌ বার্লো (১৮০৫-০৭)

লর্ড কর্ন্‌ওয়ালিস্‌ যখন দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ এবং স্বাস্থ্যহীন। কিয়ৎকাল পরে গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। নূতন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিবার পূর্ব্বে সাময়িকভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য কাউন্সিলের সদস্য সার জর্জ্জ্‌ বার্লো অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ওয়েল্‌স্‌লির রাজ্যাধিকার নীতি পরিত্যাগ করিয়া বার্লো হোল্‌করের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বেলোরের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া বহুসংখ্যক ইংরেজের প্রাণনাশ করে; কিন্তু গভর্ন্‌মেণ্টের সতর্কতায় এই বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

হোল্‌করের সহিত সন্ধি



আহ্মদ শাহ্ দুর্রানীর বংশধরগণের ক্ষমতা লোপ করিয়া শিখরাজ রণজিৎসিংহ পঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব, পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও, ভোঁস্লে, সিন্ধিয়া ও হায়দরাবাদের নিজাম ইংরেজদিগের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিলেন টীপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৩)

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজগণ ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট্ **নেপোলিয়ন বোনাপার্টের** সহিত সংগ্রামে রত ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ফরাসি-প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্য কাবুলে এবং পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্যক্ সফল হয় নাই। কিন্তু তিনি পঞ্জাবের শিখরাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাবুল ও পারস্যে দূত প্রেরণ

রণজিৎ সিংহ এবং শিখশক্তির অভ্যুত্থান—অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখগণ বারটি ভিন্ন ভিন্ন মিস্‌ল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে একটি মিস্‌লের নায়ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র রণজিৎ সিংহ পিতার গদিতে আরোহণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব আক্রমণ কালে রণজিতের সাহায্যে প্রীত হইয়া আফ্‌গানিস্থানের অধিপতি, আহ্‌মদ শাহ্ দুর্‌রানীর পৌত্র জমান শাহ্ তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব এবং 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে রণজিৎ আফ্‌গান প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন এবং বাহুবলে পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। ক্রমে লুধিয়ানাও রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিতের নায়কতায় খাল্‌সা সৈন্য অসামান্য সামরিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইউরোপীয় কর্মচারিগণের দ্বারা সুশিক্ষিত বিরাট্ বাহিনী রণজিতের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। অতঃপর এই শিখবীর শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী শিখরাজ্যসমূহ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলে, এই রাজ্যগুলি ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহার ফলে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে **অমৃতসরের সন্ধি** দ্বারা লাহোর রাজ্যের সহিত ইংরেজগণের চিরস্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হয়। রণজিৎ শতদ্রুর দক্ষিণস্থিত শিখরাজ্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া স্বীকার করিলেন। লুধিয়ানায় ইংরেজগণের একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইল। এইরূপে পশ্চিমে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বৃটিশ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সম্পর্কে ইংরেজগণ অনেকটা নির্ভয় হইল।

রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়

অমৃতসরের সন্ধি

ফরাসি ও ওলন্দাজ অধিকার আক্রমণ—ভারত মহাসাগরে ফরাসি-প্রভুত্ব বিনষ্ট করিবার জন্য লর্ড্ মিণ্টো ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মরিশিয়স্ ও বুর্ব্ব (Bourbon) দ্বীপ অধিকার করেন। যবদ্বীপ ও মলক্কা ওলন্দাজগণের অধিকারভুক্ত হইলেও ঐ সকল স্থানে ফরাসিদিগের প্রতিপত্তি ছিল। ১৮১০-১১ খৃষ্টাব্দে মিণ্টো এই দুইটি স্থানও অধিকার করিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে একমাত্র মরিশিয়স্ ব্যতীত অপর সমুদয় স্থান পূর্ব্বাধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

নানাস্থানে গোলযোগ—লর্ড্ মিণ্টোর শাসনকালে ১৮০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরে এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইংরেজ সৈন্য অজয়গড় ও কালিঞ্জরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করে।

কোম্পানির নূতন সনন্দলাভ—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্প'নি পুনরায় সনন্দলাভ করিল। এইবার ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত হইল; কিন্তু কোম্পানির অনুরূপ অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সনন্দ দ্বারা ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়।

* লর্ড হেস্‌টিংস্ (লর্ড ময়্রা) ১৮১৩-২৩

লর্ড মিণ্টোর পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব্ হেস্‌টিংস্ (আর্ল্ অব্ ময়রা) গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকাল কয়েকটি যুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ।

গুর্খা যুদ্ধ (১৮১৪-১৬)—১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খানেতা পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল অধিকার করেন। কালক্রমে গুর্খারাজ্য দক্ষিণে ইংরেজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গুর্খারা অনেক সময়ে ইংরেজ অধিকারে প্রবেশপূর্ব্বক গোলযোগ ঘটাইত বলিয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ হেস্‌টিংস্ গুর্খাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গুর্খা সৈন্যগণ সাহস এবং রণদক্ষতার জন্য সুবিখ্যাত। অধিকন্তু, নেপালের পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং

নেপালিদিগের রণনীতি বিষয়ে ইংরেজ সেনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে লর্ড্ হেস্টিংস স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করা সত্ত্বেও সহজে নেপালিরা পরাজিত হইল না। কিন্তু ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি **অক্টার্লোনি** গুর্খাবীর **অমরসিংহকে** পরাজিত করিয়া মলাওঁ দুর্গ অধিকার করেন। পর বৎসর ইংরেজ সৈন্য গুর্খা রাজধানী কাঠমণ্ডুর নিকট পৌছিলে, নেপালিরা সগৌলি নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। **সগৌলির সন্ধি** অনুসারে কাঠমণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ রাখার ব্যবস্থা হইল এবং ইংরেজেরা কুমায়ুন, গাঢ়োয়াল এবং তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান লাভ করিল। গুর্খাগণ সিকিমের দাবি পরিত্যাগ করিল।

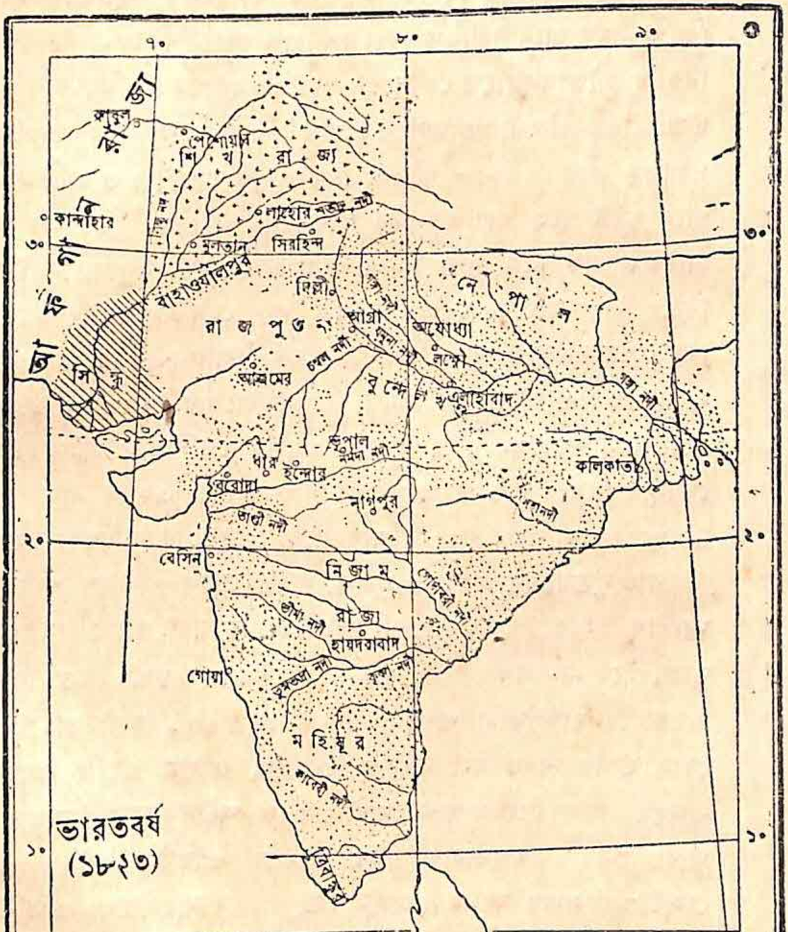
নেপালি সৈন্যের পরাজয়

সগৌলির সন্ধি

পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮)—এই সময়ে গুজরাত হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ পিণ্ডারী নামক নিষ্ঠুর দস্যুদলের অত্যাচারে উপদ্রুত হইতেছিল। তাহারা নর্ম্মদা-উপত্যকায় বাস করিত এবং সিন্ধিয়া ও হোল্‌করের সৈন্যদলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। অরাজকতার সুযোগে তাহারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। পিণ্ডারীরা শত্রু-সৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিত। লর্ড্ হেস্টিংস্ বহু চেষ্টায় এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের কবল হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিয়াছিলেন। প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য চারিদিক হইতে পিণ্ডারীদিগের অধিষ্ঠিত মালব দেশ ঘিরিয়া ফেলিল। পিণ্ডারী সর্দার **আমীর খাঁ** ও **করিম খাঁ** ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং দুইটি জমিদারি লাভ করিয়া শান্ত হইলেন। অপর পিণ্ডারীনেতা **চিতু** ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর দেশে আর পিণ্ডারীদিগের উপদ্রব রহিল না। পিণ্ডারী যুদ্ধ শেষ দিকে তৃতীয় মরাঠা যুদ্ধের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

পিণ্ডারী দমন

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ বা তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯)—বেসিনের সন্ধির পর হইতেই পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। ফলে তাঁহাকে কোঙ্কণ প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গের অধিকার এবং মরাঠা রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব ত্যাগ করিতে হয়। অন্যান্য মরাঠা নায়কগণও অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে পেশবা, ভোঁস্‌লে



ভারতবর্ষ
(১৮২৩)

তৃতীয় মরাঠা যুদ্ধের ফলে, পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহার রাজ্য ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়; হোল্‌করের রাজ্য অধীনতামূলক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়; ভোঁস্‌লের রাজ্যের একাংশ ইংরেজ শাসনাধীন হয় এবং অপরাংশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। রাজপুত রাজগণ অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন। নেপাল যুদ্ধের ফলে হিমালয়ের পাদদেশস্থ কয়েকটি জেলা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়।

ও হোল্‌কর ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন। পুণার নিকটবর্ত্তী **কির্কি** নামক স্থানে পরাজিত হইয়া বাজীরাও পলায়ন করেন। নাগপুরের নিকটস্থ **সীতাবল্‌দীতে** ভোঁস্‌লেও পরাজিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী **মহীদপুরে** ইংরেজ সৈন্যগণ হোল্‌করকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবা **কোরেগাঁও** ও **অষ্টি** নামক স্থানে দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। পেশবার জন্য বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে বাস করিতে দেওয়া হইল। লর্ড্ হেস্‌টিংস্ পেশবা-রাজ্যের কিয়দংশের অধিকার দিয়া প্রতাপসিংহ নামক শিবাজির একজন বংশধরকে সাতারাতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পেশবারাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হইল। ভোঁস্‌লে-রাজ্যের অতি সামান্য অংশের অধিকার দিয়া একজন নাবালককে নাগপুরের রাজা করা হইল। ইন্দোর রাজ্যে হোল্‌করের আধিপত্য রহিল।

মরাঠাগণের পরাজয়

ইংরেজের রাজ্যবৃদ্ধি

রাজপুতগণের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাজপুতদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া মরাঠারা তাহাদিগকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতেছিল। তদুপরি পিণ্ডারীগণের অত্যাচারে রাজপুতানা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল; স্বাধীনতা রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুত রাজগণ ইংরেজ গভর্ন্‌মেণ্টের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। রাজপুতানায় বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। লর্ড্ হেস্‌টিংসের সময়ে কর্নেল **জেম্‌স্ টড্** রাজপুতানায় ইংরেজ প্রতিনিধি-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতগণের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া **Annals and Antiquities of Rajasthan** নামক অমর গ্রন্থ রচনা করেন।

লর্ড হেস্‌টিংসের কৃতিত্ব—লর্ড্ হেস্‌টিংসের শাসনকালে সিন্ধু, পঞ্জাব, নেপাল ও আসাম ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র বৃটীশ-প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের সার্ব্বভৌম প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রস্থান করেন।

শাসন কার্য্যের সুবন্দোবস্ত—লর্ড্ হেস্টিংসের সময়ে তিন জন বিখ্যাত ইংরেজ কর্ম্মচারী—এল্ফিন্স্টোন্, ম্যাল্কম্ এবং মন্রো—যথাক্রমে বোম্বাই, মালব ও মাদ্রাজে সুশাসনের বন্দোবস্ত করেন। এল্ফিন্স্টোন্ এবং মন্রো বোম্বাই ও মাদ্রাজে রাজস্ব সম্বন্ধে **রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত** প্রবর্ত্তন করেন। এল্ফিন্স্টোন্ এবং ম্যাল্কম্ ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রয়াতওয়ারি বন্দোবস্ত

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত—১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে লর্ড্ হেস্টিংসের সময় হইতে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সরকারি তহবিল হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে থাকে। কেরী ও মার্শম্যান্ নামক দুইজন খ্যতনামা পাদ্রী ভারতীয়গণকে শিক্ষাদানের জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামক একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ডেভিড্ হেয়ার, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের চেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই যুগের শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। সমাচার-চন্দ্রিকা হিন্দু কলেজ

Model Questions

1. Briefly narrate the chief events of the time of Wellesly with reference to his war with Mysore and the Marathas.

2 Explain Wellesley's policy of Subsidiary Alliance and show how he was able to establish the Britlsh as the paramount power in India.

3 Write a note on the administration of Lord Minto and show to what extent he diviated from the policy of non-intervention.

4. Sketch the events of the time of Lord Hastings with reference to his wars with the Nepalese, the Pindaris and the Marathas.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবিস্তার, সমাজসংস্কার ও বিদ্রোহদমন

(১৮২৩-৫৮)

লর্ড্ আমহার্স্ট্ (১৮২৩-২৮)

লর্ড্ হেস্‌টিংসের পরে লর্ড্ আমহার্স্ট্ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। লর্ড্ আম্‌হার্স্‌টের সময়ে ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকৃত হয়। তাঁহার সময়েই সিমলায় বড় লাটের গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ (১২২৪-২৬)—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আলোম্প্রা নামক জনৈক বীরপুরুষ ব্রহ্মদেশে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আরাকান, মণিপুর, কাছার এবং আসাম প্রদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। এমন কি, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ লর্ড্ হেস্‌টিংস্‌কে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। এই সময়ে আসাম ও আরাকানের অনেক বিদ্রোহী ইংরেজ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল। ব্রহ্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি মহাবন্দুলের নায়কতায় এক বিরাট সেনাদল বঙ্গদেশ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। চট্টগ্রামের সীমান্তে **রামু** নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হইল। কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ আসাম অধিকার করে। অতঃপর রেঙ্গুন এবং প্রোম অধিকৃত হইল। ব্রহ্ম সেনাপতি মহাবন্দুল ডোনাবিউ নাক স্থানে নিহত হন। ব্রহ্মরাজধানী আবা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিতে বাধ্য হন। **ইয়ান্দাবুর সন্ধি** অনুসারে ইংরেজগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করিল, এবং আসাম, আরাকান এবং তেনাসেরিম প্রদেশ প্রাপ্ত হইল। অধিকন্তু ব্রহ্মরাজ কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মণিপুর প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে

ব্রহ্মসৈন্যের পরাজয়

ইংরেজের রাজ্যবিস্তার

সমগ্র আসাম ও ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ব্রহ্মরাজধানী আবাতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ রাখার বন্দোবস্ত হইল।

ব্যারাক্‌পুরের সিপাহী বিদ্রোহ (১৮২৪)—ভারতীয় সিপাহীগণের মনে ব্রহ্মদেশের সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার ছিল। অধিকন্তু সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে গেলে জাতি যাইবে বলিয়া তাহারা ভয় করিত। এই সকল কারণে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহ কঠোরতার সহিত দমন করা হইল বটে, কিন্তু ভারতীয় সিপাহীগণের মনে একটা অসন্তোষের ভাব রহিয়া গেল। পরবর্ত্তী কালে লর্ড ক্যানিঙের শাসন সময়ে এই অসন্তোষের ভয়াবহ পরিণতি দেখা গিয়াছিল।

ভরতপুর যুদ্ধ (১৮২৬)—ভারতপুরের জাঠ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র **দুর্জ্জনশাল** মৃত রাজার নাবালক পুত্রের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। গৃহবিবাদের সূচনায় বাধ্য হইয়া লর্ড আম্‌হার্স্টকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি কোম্বারমিয়ার ভরতপুরের বিখ্যাত দুর্গ ধ্বংস করেন। দুর্জ্জনশালকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতপুরের মৃত রাজার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে ভরতপুর অর্পণ করা হইল।

ভরতপুর দুর্গ অধিকার

লর্ড্ উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিশ-বেণ্টিঙ্ক্ (১৮২৮-৩৫)

লর্ড আম্‌হার্স্টের পরে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ (বা ক্যাভেণ্ডিশ-বেণ্টিঙ্ক্) গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি বেণ্টিঙ্কের নীতি—আসামের অন্তর্গত কাছাড়ের রাজার মৃত্যু হইলে তত্রত্য প্রজাবর্গের আবেদন অনুসারে বেণ্টিঙ্ক্ **কাছার** রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কুর্গের রাজা প্রজাগণকে উৎপীড়িত করায় বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রজাবর্গের সম্মতি অনুসারে রাজাকে পদচ্যুত করিয়া **কুর্গ্** রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লন। অনুরূপ ভাবে মহিসুরের কুশাসক কৃষ্ণরাজকে অধিকারচ্যুত করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক্ **মহিসুর্** রাজ্যে বৃটিশ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন;

কাছার কুর্গ ও মহিসুর

কিন্তু এই রাজ্য পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দু রাজবংশের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। কেবল প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্যই এই সকল রাজ্য অধিকার করিতে হইয়াছিল; রাজ্য-বিস্তার বেন্টিঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সিন্ধু দেশের আমীরগণ এবং পঞ্জাবের শিখরাজ রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রুশ-প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রোধ করিয়াছিলেন।

বিচার ও সমর বিভাগের সংস্কার—এই সময় প্রাদেশিক আদালতগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড্ কর্ন্ওয়ালিস্ জিলার কালেক্টরদিগকে বিচারের ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছিলেন; লর্ড্ বেন্টিঙ্ক্ কোন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার পুনরায় তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করেন। বেন্টিঙ্ক্ বিচার বিভাগে ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিচারকার্য্য সুলভ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা প্রচলিত করেন। তাঁহার সময়ে ভারতীয় সৈন্যদিগকে বেত্রদণ্ড দানের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি কমাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়সঙ্কোচ করিলেন; কিন্তু যে সমস্ত সিপাহী দীর্ঘকাল কোম্পানির সেবা করিয়াছিল, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করা হইল।

আদালতের ভারতীয় কর্ম্মচারী ও দেশীয় ভাষা

আর্থিক ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতি—নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোম্পানির কোষাগারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বেন্টিঙ্ক্ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। মালবের আফিমের উপর শুল্ক স্থাপিত হইল। মাদ্রাজে জমির রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে এবং আগ্রা অঞ্চলে জমির ত্রিংশদ্বার্ষিক বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। বাংলার কয়েকটি জমিদারি মহালের খাজনাও এই সময়ে নির্দিষ্ট হয়। এই সময়ে সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত সন্ধির ফলে ঐ দেশে, এবং রণজিৎ সিংহের সহিত নূতন সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় (১৮৩১) পঞ্জাবে বৃটিশ বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

ব্যয়সঙ্কোচ ও আয় বৃদ্ধি

শিক্ষা-সংস্কার—বেন্টিঙ্কের সময়ে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় **মেডিকেল কলেজ** প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টির প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়, তাহা লইয়া এই সময়ে মতভেদ এবং বিতর্কের উৎপত্তি হইয়াছিল। উইল্‌সন্ প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে প্রাচ্য শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন সমর্থন করিলেন; লর্ড মেকলে, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি অপর একদল ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার এবং আদালতসমূহে ইংরেজি ভাষার প্রচলনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। পরিণামে এই শেষোক্ত দলেরই জয় হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার স্থির করেন যে, ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষা



রাজা রামমোহন রায়

শিক্ষার জন্য যে সরকারি অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের পথ সুগম হয়। ভারতীয়-গণের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সরকারি পদ লাভ সহজ হইল।

সতীদাহ নিবারণ (১৮২৯)—সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাই এদেশে বেন্টিঙ্কের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তিনি সতীদাহ নামক নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা রহিত করিয়া দেন। সেকালে যে সকল হিন্দু বিধবা মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিতেন, তাঁহাদিগকে "সতী" (অর্থাৎ, সাধ্বী রমণী) বলা হইত। এই প্রথার ফলে স্বার্থপরায়ণ সম্পত্তিলোভী আত্মীয়গণের প্ররোচনায় প্রতি বৎসর দেশের শত শত হতভাগিনী নারীর প্রাণনাশ হইত। বাংলাদেশে এই প্রথা অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ ভারতবাসীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই এই নির্ম্মম প্রথা এতদিন রহিত হয় নাই। অবশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক্ নিজের দায়িত্বে ঘোষণা করিলেন যে, সতীদাহের সহায়কগণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে এবং আইন লঙ্ঘনকারীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত শাস্তি হইতে পারিবে। **দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়** প্রভৃতি বাঙালী সংস্কারকগণ সতীদাহ নিবারণ কার্য্যে কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিয়াছিলেন।

সতী

ঠগীদমন—ঠগ বা ঠগী নামক দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলকে দমন করা বেন্টিঙ্কের আর একটি প্রশংসনীয় কার্য্য। ঠগীগণ পথিকদিগের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া পথ চলিতে চলিতে শ্বাসরোধ বা অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের অর্থ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। ইহাদের মধ্যে নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ ও চিহ্ন প্রচলিত ছিল; সাধারণ লোকে উহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদের নিরীহ পথিকের জীবন বিপন্ন হইত। **উইলিয়ম্ স্লীম্যান্** নামক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে এই দস্যুদলকে খুঁজিয়া বাহির করিবার এবং শাস্তি দিবার ব্যবস্থার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিন সহস্রেরও অধিক ঠগী বন্দী হইয়া দণ্ডভোগ করিল। ভারতের পথঘাট নিরুপদ্রব হইল।

ঠগীর অত্যাচার

কোম্পানির নূতন সনন্দ লাভ (১৮৩৩)—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সনন্দ অনুসারে স্থির হইল যে, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে নূতন করিয়া আর বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারিবে না; ভারতীয়গণ শিক্ষার যোগ্যতা

লাভ করিলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উচ্চ সরকারি পদের অধিকারী হইতে পারিবে। এই সনন্দবলে "বাংলার গভর্নর জেনারেল" ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল আখ্যা লাভ করিলেন, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকার রহিত হইল। বড়লাটের কাউন্সিলে একজন আইন সচিব (Law Member) নিযুক্ত হইলেন। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সমর্থক লর্ড্ মেকলি প্রথম আইন-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গভর্নর জেনারেল

সার চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্ (১৮৩৫-৩৬)

মুদ্রণ স্বাধীনতা—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক্ স্বদেশে প্রস্থান করিলে, আগ্রা প্রদেশের গভর্নর সার্ চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্ অস্থায়িভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি সাময়িক পত্রাদির স্বাধীনতামূলক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে কোন কোন বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না। উক্ত আইনের ফলে ঐ সকল বিধি-নিষেধ উঠিয়া গেল। পরবর্ত্তীকালে মুদ্রণবিষয়ক স্বাধীনতা (Freedom of the Press) পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করা হইয়াছিল। ফ্রীডম্ অব্ দি প্রেস্

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড্ (১৮৩৬-৪২)

দুর্ভিক্ষ—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ড্ ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার সময় ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গভর্ন্‌মেণ্ট্ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

প্রথম আফ্‌গান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২)—আফ্‌গানিস্থানের যুদ্ধই লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ডের শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। এই সময়ে মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় ইংরেজ মন্ত্রিগণ ভারতের উপর রুশ আক্রমণের কল্পনায় ভীত ছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় পারসিকগণ আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত হিরাত আক্রমণ করিলে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া উঠেন; কারণ ভারত-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হিরাত রাশিয়ার অনুগত পারস্যের হস্তগত হইলে রাশিয়া সহজেই ভারত আক্রমণ মধ্য-এশিয়ায় রুশ প্রভাব

করিতে পারিত। এই সময় **দোস্ত্ মুহম্মদ** আফ্‌গানিস্থানের আমীর ছিলেন। লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ড্ তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। আমীরের সভায় রুশ দূত সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। তখন লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ড্ দোস্ত্ মুহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজদিগের একজন অনুগত ব্যক্তিকে আফ্‌গানিস্থানের আমীরের পদ প্রদান করিতে মনস্থ করেন। এই সময়ে কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর **শাহ্ শুজা** ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ, শাহ্ শুজা এবং ইংরেজগণ—এই **ত্রিশক্তির মধ্যে সন্ধি** স্থাপিত হইল। অতঃপর এই মিত্রশক্তিগণের সৈন্যদল আফ্‌গানিস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিল। দোস্ত্ মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন। শাহ্ শুজাকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল।

আফ্‌গানিস্থানে **রুশ প্রভাব**

ত্রিশক্তির সন্ধি

কিন্তু আফ্‌গানগণ পরাশ্রিত শাহ্ শুজাকে ঘৃণা করিত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাহারা দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র **আকবর খাঁর** নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া আলেক্‌জাণ্ডার বার্নেস্, উইলিয়ম্ ম্যাক্‌ন্যাটেন্ প্রমুখ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিল এবং বৃটিশ সৈন্যগণকে কাবুল হইতে তাড়াইয়া দিল। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র ইংরেজ সৈন্য অনুচরগণসহ খাইবার গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইল; কিন্তু দারুণ শীতে এবং আফ্‌গান শত্রুর গুলিতে তাহাদের সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ডাক্তার ব্রাইডন্ নামক এই দলের এক ব্যক্তি অতিকষ্টে জলালাবাদে পৌছিয়া এই শোচনীয় ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে শেল্ ও নট্ নামক দুইজন সাহসী সেনানায়কের অধীনে ইংরেজ সেনাদল জলালাবাদ ও কান্দাহারে যুদ্ধ করিতেছিল।

ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়

লর্ড্ এলেন্‌বরা (১৮৪২-৪৪)

প্রথম আফ্‌গান যুদ্ধের অবসান (১৮৪২)—লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ডের পরে লর্ড এলেন্‌বরা গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সেনানায়ক নট্‌কে কান্দাহার হইতে এবং পোলক্‌কে

পেশোয়ার হইতে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ সৈন্য অতঃপর গজ্‌নী ধ্বংস করিল এবং কাবুলের বিখ্যাত বাজার ভস্মীভূত করিয়া দিল। কিন্তু এই জয়লাভ কোন সুফল প্রসব করিল না। কারণ ইতিমধ্যে শাহ্‌ শুজা শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ দোস্ত্‌ মুহম্মদকে কাবুলে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন। যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণের প্রভূত সৈন্যক্ষয় এবং অর্থব্যয় হইল ; লাভ কিছুই হইল না।

সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩)—সিন্ধু দেশের হায়দরাবাদ, খয়েরপুর ও মীরপুরের বালুচিজাতীয় আমীরগণ বৃটিশ সরকারের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। ইংরেজরা রাজ্যবিস্তারপ্রয়াসী রণজিৎ সিংহকে সিন্ধু অধিকার করিতে দিল না ; কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ দেশে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে **সার্‌ চার্লস্‌ নেপিয়ার্‌** নামক একজন উদ্ধত ইংরেজ সেনানায়ক রাজনৈতিক ও সামরিক বিধিব্যবস্থার পূর্ণ ক্ষমতাসহ সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। তিনি আমীরগণের মুদ্রা প্রস্তত করিবার ক্ষমতা রহিত করেন এবং তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। নেপিয়ারের নানারূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে বালুচিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী **মিয়ানী** নামক স্থানের **যুদ্ধে** আমীরগণ পরাজিত হইলেন। বালুচি আমীর-গণের পরাজয় **দবোর যুদ্ধেও** ইংরেজ সেনাদল জয়লাভ করিল। আমীরগণ বিতাড়িত হইলেন ; সিন্ধু বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। নিতান্ত অন্যায়ভাবেই ইংরেজরা এই দেশের অধিকার লাভ করিয়াছিল।

গোয়ালিয়র যুদ্ধ (১৮৪৩)—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় গোয়ালিয়রের মহারাজ জনকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা মহিষী এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। বালক রাজার অভিভাবক নিয়োগ ব্যাপারে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় গোয়ালিয়রের বিশাল বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। অবাধ্য সেনাদলের উচ্ছৃঙ্খলতায় গোয়ালিয়র রাজ্যের সুখ-শান্তি বিপন্ন দেখিয়া লর্ড্ এলেন্‌বরা গোয়ালিয়রের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ গোয়ালিয়র-বাহিনী যদি পাঞ্জাবের শিখ সেনার সহিত সম্মিলিত হইত, তবে ভারতে ইংরেজ

রাজত্ব বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। লর্ড্ এলেন্‌বরার শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী **মহারাজপুর** নামক স্থানে সিন্ধিয়ার সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। **পানিয়ারের যুদ্ধেও** ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করিল। গোয়ালিয়র রাজ্যের কোন অংশ ইংরেজরাজ্যের অন্তভুক্ত করা হইল না বটে, কিন্তু বৃটিশ প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইল এবং গোয়ালিয়রের সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল।

সিন্ধিয়ার পরাজয়

শাসন-সংস্কার—লর্ড এলেন্‌বরা 'ডেপুটি ম্যাজিস্‌ট্রেট্, নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি দারোগার বেতন বৃদ্ধি করিয়া পুলিশ বিভাগের শৃঙ্খলা এবং কার্য্যক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দাসত্ব প্রথা রহিত করা হয় এবং সরকারি লটারি খেলা (State Lottery) বন্ধ করা হয়।

সার্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ্ (প্রথমে লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্)

(১৮৪৪-৪৮)

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড্ এলেন্‌বরাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেন এবং সার্ হেন্‌রি (পরে লর্ড্) হার্ডিঞ্জ্‌কে বড়লাট নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। পঞ্জাবে শিখগণের সহিত যুদ্ধই হার্ডিঞ্জের শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬)—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া গেলেন শতদ্রু হইতে আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য এবং সুশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ খাল্‌সা সৈন্যদল। রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়্‌ক্ (খড়গ) সিংহ রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতার ফলে শীঘ্রই রাজ্যে নানারূপ গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। শক্তিমান শাসকের অভাবে শাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং খাল্‌সা সেনাদলের পরিচালক পঞ্চায়েৎসমূহই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রণজিতের

রণজিৎ সিংহের পর পঞ্জাবের অবস্থা

নাবালক পুত্র দলীপ বা দিলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হয় এবং দলীপের মাতা রাণী **ঝুন্দা** বা **ঝিন্দন** রাজার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। রাণী এবং তাঁহার সাহায্যকারী লাল সিংহ ও তেজ সিংহ দুর্দ্ধর্ষ খাল্‌সা সেনাগণকে বশে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, অবাধ্য সৈন্যদিগকে শতদ্রুর অপর তীরবর্ত্তী ইংরেজ রাজ্যে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করাই কর্ত্তব্য। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইলেও ক্ষতি নাই; আবার জয়ী হইলে উহাদেরও যুদ্ধ-লালসা মিটিবে, শিখরাজ্যেরও পরিধি বিস্তৃত হইবে। এদিকে রণজিতের মৃত্যুর পর ইংরেজেরাও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে ছিল। শিখগণের আশঙ্কা হইল যে, ইংরেজেরা পঞ্জাব অধিকারের আয়োজন করিতেছে। যাহা হউক, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ষাট হাজার শিখ সৈন্য শতদ্রু অতিক্রম করিয়া দিল্লী লুণ্ঠনের আশায় অগ্রসর হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাণী ঝুন্দা

শিখ-ইংরেজ সংঘর্ষ

মুদকী নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল। ইংরেজ পক্ষে প্রভূত সৈন্যক্ষয় হইলেও শিখনায়ক লাল সিংহের পরিচালনার ত্রুটিতে এই যুদ্ধে পরাক্রান্ত শিখবাহিনীর পরাজয় হয়। ইহার তিন দিন পরে সেনাপতি সার্ হিল গাফ্ ও স্বয়ং বড়লাটের নেতৃত্বে বিপুল ইংরেজবাহিনী **ফিরোজ শা** বা ফিরোজশহর নামক স্থানে শিখগণকে আক্রমণ করে। দুই দিবস ব্যাপী তুমুল যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের প্রায় আড়াই হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছিল; কিন্তু শিখ সেনাপতি তেজ সিংহের অবিবেচনায় এই যুদ্ধেও শিখ সৈন্য পরাজিত হইল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে (১৮৪৬) **আলিওয়ালের যুদ্ধে** শিখ সৈন্য পুনরায় পরাজিত হয়। অতঃপর শতদ্রুর তীরস্থিত **সোব্রাওঁ** (বা সুব্রাহান) নামক স্থানে উভয় পক্ষের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণ নষ্ট হইলেও ইংরেজগণ জয়লাভ করিল।

মুদকীর যুদ্ধ

ফিরোজ শার যুদ্ধ

আলিওয়াল ও সোব্রাওর যুদ্ধ

যুদ্ধের অবসানে লাহোরে ইংরেজ ও শিখ সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। **লাহোরের প্রথম সন্ধির** শর্ত্ত অনুসারে শিখ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করা হইল; শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর

দোয়াব এবং শতদ্রুর বামদিকস্থিত শিখরাজ্যাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ইংরেজগণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করিল। শিখ রাজকোষের অর্থাভাব হেতু গুলাবসিংহ নামক শিখরাজ্যের একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহাকে কাশ্মীর ও জম্মুর অধিকার প্রদান করা হইল। কিয়ৎকাল পরে লাহোরে নূতন একটি সন্ধি হয়। **লাহোরের দ্বিতীয় সন্ধিতে** পঞ্জাবে বৃটিশ সৈন্যদল রক্ষার বন্দোবস্ত হইল এবং শিখরাজ্যের শাসনকার্য্য বৃটিশ পরিচালনায় সম্পাদিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। এদিকে **অমৃতসরের সন্ধিতে** ইংরেজেরা গুলাবসিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে কাশ্মীর ও জম্মুর রাজা বলিয়া স্বীকার করিল।

লাহোরের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধি

অমৃতসরের সন্ধি

আভ্যন্তরীণ সংস্কার—হার্ডিঞ্জের শাসনকালে দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে শিশুহত্যা ও সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা হয়। হার্ডিঞ্জ্ খোন্দ্ জাতির মধ্যে প্রচলিত নরবলির প্রথা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

* লর্ড্ ডাল্‌হৌসী (১৮৪৮-৫৬)

লর্ড্ হার্ডিঞ্জের পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ ডাল্‌হৌসী ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি পঞ্জাব, পেগু এবং আরও কতিপয় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্‌টিংস্, ওয়েল্‌সলি ও লর্ড্ হেস্‌টিংসের রাজ্যাধিকার পরিকল্পনা সফল এবং তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি **যুদ্ধ জয় দ্বারা, স্বত্বলোপ নীতি দ্বারা** এবং **অন্যান্য উপায়ে** রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯) ও পঞ্জাব অধিকার—প্রথম শিখ যুদ্ধের ফলে পঞ্জাবে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিখগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাণী-মাতা ঝিন্দনের নির্ব্বাসন তাহাদের অসন্তোষ-বহ্নিকে ধূমায়িত করিয়া তুলে। নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে মূলতানের শিখ শাসনকর্ত্তা **মূলরাজ** পদত্যাগ করেন। নবনিযুক্ত শাসনকর্ত্তা দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত মূলতানে পৌছিলে, কর্ম্মচারী দুইটিকে হত্যা করা হয়। সম্ভবতঃ মূলরাজ এই হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। লাহোর

যুদ্ধের কারণ

কর্ত্তৃপক্ষ শের সিংহকে মূলরাজের বিদ্রোহ দমনের জন্য মূলতানে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু শের সিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। ক্রমে সমগ্র পঞ্জাবে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ঝেলম নদীর তীরে **চিলিয়ান্‌বালা** নামক স্থানে শের সিংহের সহিত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড্ গাফের তুমুল যুদ্ধ হয়। ইংরেজগণ জয়লাভ করিতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে চিনাব নদীর নিকটবর্ত্তী **গুজরাত** নামক স্থানে শিখদিগকে পরাজিত করিয়া গাফ্ তাঁহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন (১৮৪৯)। লর্ড্ ডাল্‌হৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। সিংহাসনচ্যুত মহারাজ দলীপ সিংহের জন্য বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

চিলিয়ান্‌বালা ও গুজরাতের যুদ্ধ

পঞ্জাবে ইংরেজ অধিকার

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২) ও পেগু অধিকার—ব্রহ্মদেশে ইংরেজ বণিকেরা নানারূপ উৎপীড়িত হইতেন। ব্রহ্মরাজের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কোনই ফল হইত না; বরং বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণ অপমানিত হইয়া ফিরিতেন। লর্ড্ ডাল্‌হৌসী ইহার প্রতিবিধানকল্পে নৌসেনাপতি ল্যাম্বর্ট্‌কে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ল্যাম্বার্ট্ রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করিলেন এবং ব্রহ্মরাজের একখানি জাহাজ দখল করিয়া লইলেন। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুপরিচালনার গুণে ইংরেজ সৈন্য সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে লাগিল। একে একে রেঙ্গুন, বেসীন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হয়। ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিতে রাজি হইলেন না; তখন লর্ড্ ডাল্‌হৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগু প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

স্বত্বলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) ও তদনুসারে রাজ্যাধিকার—কোম্পানির একটি নীতি ছিল যে, কোন আশ্রিত রাজ্যের অধিকারী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, ঐ রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং এইরূপ কোন রাজা ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ঐ পুত্রকে তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে পারিবেন না। লর্ড্ ডাল্‌হৌসী

স্বত্বলোপ নীতি

দেশীয় রাজ্যসমূহে শাসন-শৃঙ্খলার অভাব এবং প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া এই নীতিটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বৃটিশ শাসন ভারতীয় রাজগণের শাসন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। **সাতারা, ঝান্সী, নাগপুর** প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজগণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, এই স্বত্বলোপ নীতি অনুসারে ঐসকল রাজ্য কোম্পানির শাসনাধীন করা হয়। কর্ণাটক এবং **তাঞ্জোর** রাজ্যের রাজগণকে যে বৃত্তি প্রদান করা হইত, এই নীতি অনুসারে উহা হইতে তাঁহাদের দত্তক পুত্রদিগকে বঞ্চিত করা হইল। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পোষ্যপুত্র **নানাসাহেব**কে তাঁহার বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বলা হইল যে, উক্ত বৃত্তি মৃত পেশবাকে তাঁহার জীবিতকালের জন্য পেন্‌শন স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

সাতারা, ঝান্সী ও নাগপুর

কর্ণাটক তাঞ্জোর

নানা সাহেব

অন্যান্য উপায়ে রাজ্যাধিকার—লর্ড্ ডাল্‌হোসী প্রজার মঙ্গলের দোহাই দিয়া **কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য** ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন (১৮৫৬); নাবাব ওয়াজিদ আলিকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপর দুর্ব্ব্যবহার করিবার অপরাধে লর্ড্ ডাল্‌হৌসী **সিকিম রাজ্যের কিয়দংশ** বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন (১৮৫০)। উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুরের অপুত্রক রাজার মৃত্যু হইলে, মৃত রাজার ইচ্ছানুসারে **সম্বলপুর রাজ্য** ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়। হায়দরাবাদের নিজাম স্বীয় রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া **বেরার প্রদেশ** ভারত সরকারকে প্রদান করেন (১৮৫৩)।

অযোধ্যা

সিকিম

সম্বলপুর ও বেরার

আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার—রাজ্যশাসন ব্যাপারেও লর্ড ডাল্‌হৌসী আসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। রাস্তা নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তিনি পূর্ত্ত বিভাগ (Public Works Department) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়েই গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্ এবং ভারতবর্ষের প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। তিনি টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন

পূর্ত্তবিভাগ

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ

করেন এবং অল্প মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য কাহাকেও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না, এই মর্ম্মে একটি আইন ডাল্‌হৌসীর সময় প্রণীত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি চার চাল্‌স উড্ এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়া একটি শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র (Educational Despatch) প্রেরণ করেন। ডাল্‌হৌসী অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগ (Department of Public Instruction) গঠিত করিয়া শিক্ষা-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিধবাবিবাহ ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বিষয়ক আইন শিক্ষা বিভাগ

কোম্পানির শেষ সনন্দ (১৮৫৩)—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন সনন্দ লাভ করে। এই সনন্দ অনুসারে পরিচালক সভার (Court of Directors) গঠন ও ক্ষমতা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। বাংলা ও বিহারের শাসনভার একজন ছোট লাটের (Lieutenant-Governor) হস্তে ন্যস্ত করিয়া বড়লাটের কার্য্যের গুরুভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করা হইল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ পদে (Civil Service) কর্ম্মচারিনিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইল। বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সচিব (Law Member) আইন প্রণয়ন ব্যতীত শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইলেন। আরও ব্যবস্থা হইল যে, কাউন্সিল যখন আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, তখন সাতজন অতিরিক্ত সদস্য উহাতে যোগদান করিবেন। ইঁহারা সকলেই সহকারী কর্ম্মচারী হইবেন এবং ইঁহাদের মধ্যে চারিজনকে প্রাদেশিক গভর্ন্‌মেণ্ট্ সমূহ মনোনীত করিবে। ছোট লাট সিভিল সার্ভিস আইন সচিব

লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর কৃতিত্ব—লর্ড্ ডাল্‌হৌসী ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসন-কর্ত্তাদিগের অন্যতম। রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসন, এই উভয় কার্য্যেই তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সময়েই পশ্চিমে

আফ্‌গানিস্থানের সীমান্ত হইতে পূর্ব্বে সালুইন নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে একচ্ছত্র বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শাসন বিভাগের সংস্কার এবং নানা সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এদেশের প্রাচীন প্রথা পদদলিত করিয়া তিনি যে দত্তকোচ্ছেদ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা করা যায় না। লর্ড্ ক্যানিঙের সময়ে যে ভীষণ বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, ডাল্‌হৌসীর নীতি তজ্জন্য বহুলাংশে দায়ী।

ডাল্‌হৌসীর শাসননীতির কুফল

লর্ড্ ক্যানিং (১৮৫৬-৫৮)

লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর পর লর্ড্ ক্যানিং ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্রে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের যে নীতি পরিকল্পিত হইয়াছিল, তদনুসারে তিনি **কলিকাতা, বোম্বাই** ও **মাদ্রাজে** তিনটি **বিশ্ব-বিদ্যালয়** স্থাপন করিলেন (১৮৫৭)। উত্তর-ভারতব্যাপী ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহ এবং উহার ফলে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ—এই দুইটি লর্ড্ ক্যানিঙের শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা।

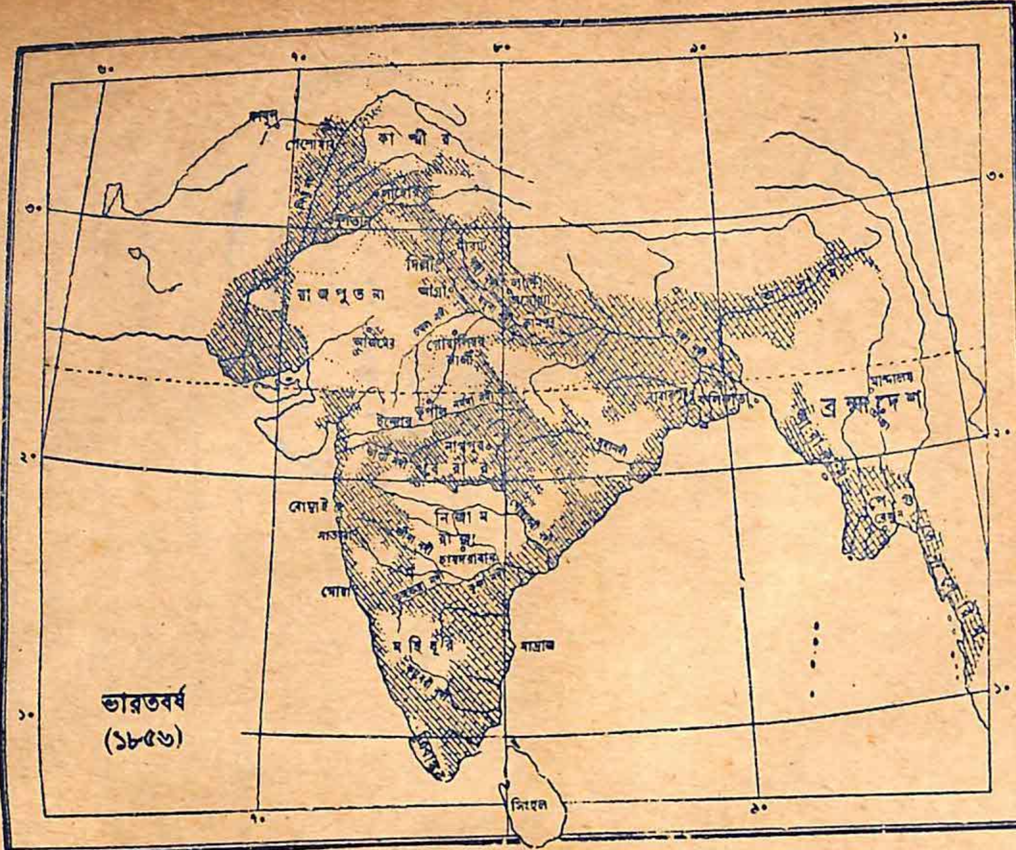
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ—লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর **সামন্ত রাজ্য গ্রাস** করিবার চেষ্টায় ভারতবাসিগণের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। রাজ্যহারা অনেক রাজবংশের দাবিদারগণ চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বিস্তার করিতেছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলিকে রাজ্যচ্যুত করায় অযোধ্যা-বাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেকালে কোম্পানির ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যে অধিকাংশ আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর শাসনকর্ত্তৃগণ সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সম্পর্কিত যে সকল **সমাজ সংস্কার** মূলক বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এদেশের অনেকে উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিত। সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যাইতে বাধ্য হওয়ায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদিগের মনে অসন্তোষ সঞ্চিত হইয়াছিল। এই সন্দেহ-বহ্নিতে অনেকে ইন্ধন যোগাইতেছিল। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে, ইংরেজগণ তাহাদের জাতি নষ্ট করিয়া

ডালহৌসীর শাসননীতি

কুসংস্কার

[১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আসাম ও ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের ফলে পঞ্জাব কোম্পানির হস্তগত হয়। লর্ড্ ডালহৌসী অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।]



ভারতবর্ষ
(১৮৫৬)

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ষড়যন্ত্র করিতেছে। তৃতীয়তঃ, যখন **এনফিল্ড রাইফেল** নামক পশুচর্ব্বিতে প্রস্তুত কার্ত্তুজ (টোটা) বিশিষ্ট এক প্রকার বন্দুক সিপাহীগণকে ব্যবহার করিতে বলা হইল, তখন সিপাহী-দিগের অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উত্তর-ভারতে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিল। এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজগণ রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে (Crimean War) ব্যাপৃত ছিল; সে জন্য ভারতে বহুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য ছিল না। ইহাতে সিপাহীরা সহজেই ইংরেজদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবে আশা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়।

এনফিল্ড রাইফেল

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তার—প্রথমে বাংলা দেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের সৈন্যদলে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত অম্বালায় বিদ্রোহ সামান্য আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মেরাটে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করিল। মেরাটের সিপাহীগণ দলবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক ইউরোপীয়কে হত্যা করে এবং অনতিবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া নামাবশেষ মুঘল বাদ্‌শাহ্‌ বৃদ্ধ **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে** ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে। দিল্লীর প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসী বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল। শীঘ্রই শতদ্রু হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিদ্রোহের তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইল।

মেরাটে বিদ্রোহ

বহাদুরশাহ্‌, দিল্লীর হত্যাকাণ্ড

কানপুর ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ—আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চলেই বিদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওর দত্তক পুত্র **নানাসাহেব** কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে বাস করিতে-ছিলেন। তিনি কানপুরের বিদ্রোহীদিগের নায়কতা লাভ করিলেন। ২৭শে জুন কানপুরে বিদ্রোহীরা স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রায় দুই শত ইউরোপীয়ের প্রাণ সংহার করে। নানাসাহেব আপনাকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কানপুরের অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণকে সাহায্য করিবার জন্য **হ্যাভলক** ও **নেল** সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই সমস্ত বন্দীকে হত্যা করিয়া একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। নানাসাহেব পরে নেপালের

নানাসাহেব

কানপুরে হত্যাকাণ্ড

জঙ্গলে আত্মগোপন করেন ; তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই।

লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় সাহায্য

লক্ষ্ণৌর ইউরোপীয়গণ **সার হেন্‌রি লরেন্স্‌** নামক সেনাপতির নায়কতায় কিছুকাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লরেন্স্‌ নিহত হইলে সেনাপতি **ইংলিস্‌** তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হাভ্‌লক ও **আউট্রাম্‌** উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অতঃপর নভেম্বর মাসে **সার কলিন ক্যাম্প্‌বেল** লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণকে উদ্ধার করেন। শিখ ও অন্যান্য জাতীয় কতকগুলি বিশ্বস্ত ভারতীয় সিপাহী লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরেজগণের আত্মরক্ষার সহায় হইয়াছিল। নেপালের জং বহাদুর একদল গুর্খা সৈন্য দ্বারা ক্যাম্প্‌বেলের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীবাঈ ও তান্তিয়াতোপী—এই সময়ে অযোধ্যার দক্ষিণস্থ প্রদেশের বিদ্রোহীরা মরাঠা বীর তান্তিয়াতোপীর নেতৃত্বে কানপুরে সমবেত হইয়াছিল। কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ উইণ্ডহাম বিদ্রোহীদিগের হস্তে পরাজিত হন ; কিন্তু পরে ক্যাম্প্‌বেল তান্তিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তান্তিয়া অতঃপর ঝান্সীর তেজস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈর সহিত মিলিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্য **বেতোয়ার যুদ্ধে** ইংরেজ সেনাপতি **সার হিউ রোজ** কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটি যুদ্ধে বীরনারী লক্ষ্মীবাঈ অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। পর বৎসর তান্তিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইলে বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

ইংরেজের জয়

দিল্লীতে বিদ্রোহ—দিল্লী বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে সিপাহীরা দিল্লীতে সমবেত হইতেছিল। অবশেষে পঞ্জাব হইতে সার জন লরেন্স্‌ কতকগুলি ইংরেজ ও শিখ সৈন্য পাঠাইলেন। দিল্লী অধিকৃত হইল (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭)। হাড্‌সন নামক একজন ইংরেজ সৈনিক দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্‌ এবং তাঁহার দুই

দিল্লী অধিকার

পুত্র ও এক পৌত্রকে প্রাসাদ হইতে টানিয়া বাহির করিল। রাজকুমারগণ তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে বহাদুর শাহ্ বন্দী অবস্থায় রেঙ্গুনে প্রেরিত হন। আক্‌বর ও ঔরংজীবের বংশধরগণের কি শোচনীয় পরিণাম! ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইংরেজগণ লক্ষ্ণৌ ও বেরিলী অধিকার করে। ফলে উত্তর-ভারতে একরূপ শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি ঘোষণা করা হইল। বহাদুর শাহের পরিণাম

সিপাহীগণের ব্যর্থতার কারণ—সিপাহীগণের ব্যর্থতার সর্ব্বপ্রধান কারণ **একতার অভাব**। আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র সিপাহীরা দেশের অধিবাসিগণের সহযোগিতা পায় নাই। এমন কি, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সিপাহীগণ এবং শিখ ও গুর্খা সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। বিভিন্ন বিদ্রোহ-কেন্দ্রের সিপাহীদিগের মধ্যে একযোগে কাজ করিবার প্রবৃত্তিরও অভাব ছিল। নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বিদ্রোহের নায়কগণের মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্য লাভ করিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুশৃঙ্খলা ও সুপরিচালনার প্রয়োজন হয়: সিপাহীগণের পক্ষে তাহার নিতান্তই অভাব ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় রাজারা বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিজাম, সিন্ধিয়া এবং পাতিয়ালা রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়তঃ বিদ্রোহী দলে সুযোগ্য সেনানায়কের অভাব ছিল। লরেন্স, আউট্রাম, ক্যাম্প্‌বেল, হ্যাভ্‌লক প্রভৃতির ন্যায় সুদক্ষ সেনানায়ক ভারতীয়গণের মধ্যে কেহই ছিল না। একতার অভাব উদ্দেশ্যের অসামঞ্জস্য সাহায্যের অভাব সেনাপতির অভাব

কোম্পানির রাজত্বের অবসান—সিপাহী বিদ্রোহের লোমহর্ষণ সংবাদ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট্ দেশের শাসনভার ক্ষুদ্র একটি বণিক্‌সমিতির উপর ন্যস্ত রাখা, তাঁহারা আর ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন না। ভারতবর্ষে শান্তি ঘোষণার পূর্ব্বেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট্ মহাসভায় এক আইন (Government of India Act, 1858) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে স্থির হইল যে, অতঃপর ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ

'ভাইস্‌রয়' (Viceroy) অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি উপাধি লাভ করিলেন। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিগণের মধ্য হইতে একজন ভারত-সচিব (Secretary of of State for India) নিযুক্ত হইবেন, এবং তিনি পঞ্চদশ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদের (India Council) সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র (Queen's Proclamation)—১৮৫৮ ১লা নভেম্বর লর্ড্‌ ক্যানিং এলাহাবাদে একটি দরবার আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ শাসনের জন্য তিনি স্বয়ং প্রথম 'ভাইস্‌রয়' বা রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। মহারাণীর ঘোষণাপত্রে বিবৃত হইল যে, অতঃপর শাসনব্যাপারে ন্যায়বিচার এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বিত হইবে; যোগ্যতা থাকিলে ভারতবাসীর উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তির পথে কোন বাধা থাকিবে না; কোম্পানির আমলের সমস্ত সন্ধির সর্ত্ত পালিত হইবে এবং সামন্ত রাজ্য গ্রাসের নীতি পরিত্যক্ত হইবে। মহারাণীর ঘোষণায় বৃটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল।

রাজ-প্রতিনিধি

নিরপেক্ষ শাসননিতি

Model Questions

1. Give an account of the various reforms of Lord William Bentinck.

2. Describe the achievements of Lord Dalhousie with reference to (a) his administration and (b) policy of annexation through lapse.

3. Write notes on—the first and second Burmese Wars, suppression of the Thugs, the first Afghan War, annexation of Oudh, the Charter Act of 1833, Freedom of the Indian Press.

4. Sketch the story of the first and second Sikh wars leading to the annexation of the Punjab by the British.

5. Give an account of the Sepoy Mutiny with reference to its causes and effects.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাজপ্রতিনিধিগণের শাসন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রসারের চেষ্টা

(১৮৫৮-১৯৪৫)

ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রবর্তন	...	১৮৬০
হাইকোর্ট স্থাপন	...	১৮৬১
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট	...	১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯
ভূটান যুদ্ধ	...	১৮৬৪-৬৫
মহারাণীর 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ	...	১৮৭৭
দেশীয় সংবাদপত্র আইন	...	১৮৭৮
দ্বিতীয় আফ্গান যুদ্ধ	...	১৮৭৮-৮০
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রথার সূত্রপাত	...	১৮৮৩-৮৫
তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ	...	১৮৮৫
জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন	...	১৮৮৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন	...	১৯০১
বঙ্গ বিভাগ	...	১৯০৫
মর্লি-মিন্টো সংস্কার	...	১৯০৯
দিল্লী দরবার	...	১৯১১
মন্ট্ ফোর্ড্ সংস্কার	...	১৯১৯
তৃতীয় আফ্গান যুদ্ধ	...	১৯১৯
সাইমন কমিশন	...	১৯২৭
গোল টেবিল বৈঠক	...	১৯৩০-৩২
ভারত শাসন আইন	...	১৯৩৫
ভারত বিভাগ এবং ভারত ও পাকিস্থান নামক দুইটি পৃথক্ জাতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তন		১৯৪৭
ভারতে স্বাধীন গণরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা	...	১৯৫০

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-৬২)

মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে লর্ড্ ক্যানিং ভারতবর্ষের প্রথম 'ভাইস্‌রয়' (Viceroy) বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া দেশে **শান্তি স্থাপন** করিলেন। দেশীয় রাজগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর স্বত্বলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজগণ আর ভারতে রাজ্যবিস্তার করিতে ইচ্ছুক নহে। পুনরায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা বিনষ্ট করিবার জন্য দেশীয় সৈন্যের সংখ্যার অনুপাতে

স্বত্বলোপ নীতি ত্যাগ

ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হইল এবং গোলন্দাজ সৈন্যবিভাগে দেশীয় লোক নিয়োগ করিবার প্রথা রহিত হইল। ভারতীয় নৌবাহিনী উঠাইয়া দেওয়া হইল।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য ক্যানিং কয়েকটি সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এক **খাজনা আইন** বিধিবদ্ধ করা হয়; ইহার ফলে বাংলা, আগ্রা ও মধ্যপ্রদেশে প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। এই সময় ইউরোপীয় **নীলকরগণ** অতিরিক্ত লাভের আশায় বাংলার কৃষকগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র **'নীলদর্পণ'** নামক নাটকে এই অত্যাচারের জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। লর্ড্ ক্যানিং নীলকরগণের অত্যাচার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিয়াছিলেন।

খাজনা আইন

নীলকরের অত্যাচার

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে **আইনবিষয়ক বহু সংস্কার** প্রবর্ত্তিত হয়। লর্ড্ উইলিয়ম বেণ্টিংকের সময়ে আইন-সচিব লর্ড্ মেকলে যে সকল আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে **ভারতীয় দণ্ডবিধি** (Indian Penal Code) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট্ এবং সদর আদালতসমূহ উঠিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে **হাইকোর্ট** (High Court) প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতীয় দণ্ডবিধি

হাইকোর্ট

ঐ বৎসরই **ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্‌ট্** (Indian Councils Act) নামক আইন দ্বারা বড়লাটের পরিষদে (Council) বে-সরকারি সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র কয়েকজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী লইয়া গভর্নর জেনারেলের পরিষদ্ গঠিত হইত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নিয়ম হইল যে, আইন প্রণয়নের সুবিধার জন্য অন্যূন ছয় জন এবং অনধিক বার জন অতিরিক্ত সভ্য উক্ত পরিষদে আসন গ্রহণ করিবেন। এই অতিরিক্ত সভ্যগণ দুই বৎসরের জন্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং তাঁহাদের অর্দ্ধেক হইবেন বে-সরকারি (অর্থাৎ, যাঁহারা সরকারি কর্ম্ম করেন না)। এই ব্যবস্থা অনুসারে বে-সরকারি ভারতবর্ষীয়েরা আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে কাউন্সিলের সদস্য হইবার অধিকার

বড়লাটের পরিষদে [illegible] সভ্য

লাভ করিলেন। প্রাদেশিক গভর্ন্‌মেণ্ট্‌সমূহও স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন ; তবে আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকারকে গভর্নর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট্‌ (Indian Civil Service Act) নামক আইন অনুসারে নানা বিভাগের কতিপয় উচ্চপদ সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সভ্যগণের জন্য সংরক্ষিত হইল। সিভিল সার্ভিস

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ব্যয়ভার অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য রাজস্ব সচিব উইল্‌সন্‌ **রাজস্ববিষয়ক** নানাবিধ **সংস্কার** প্রবর্ত্তন করেন। আয়কর ভারত সরকারের আয়বৃদ্ধির জন্য **আয়কর** (Income Tax) আদায়ের কাগজের মুদ্রা ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই কাগজের মুদ্রার (Paper Currency) প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে এক ভয়ানক **দুর্ভিক্ষ** উপস্থিত হয় এবং বহুলোক অন্নাভাবে ও পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম লর্ড্‌ এল্‌গিন (১৮৬২-৬৩)

লর্ড ক্যানিঙের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্‌ এল্‌গিন ভারতবর্ষে আগমনের কিছুদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময়ে উত্তর-পশ্চিম ওহাবী বিদ্রোহ সীমান্তের অধিবাসী **ওহাবী** সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা বিদ্রোহী হয়। ইংরেজগণ সহজেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দমন করে।

সার জন্‌ লরেন্স্‌ (১৮৬৪-৬৯)

লর্ড্‌ এল্‌গিনের পর সার জন্‌ লরেন্স্‌ রাজপ্রতিনিধি হইলেন। তিনি ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সুদক্ষ কর্ম্মচারী রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী—লরেন্সের শাসনকালে উড়িষ্যা, বুন্দেলখণ্ড এবং রাজপুতানায় ভয়ানক **দুর্ভিক্ষ** উপস্থিত হয়, এবং গভর্নমেণ্ট্‌ যথাসময়ে সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করায় বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ শোচনীয় অবস্থা না ঘটিতে পারে, এজন্য লরেন্স্‌

সেচ বিভাগ

একটি সেচ বিভাগ (Irrigation Department) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময় হইতেই গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ দুর্ভিক্ষ নিবারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লরেন্স্‌ রুড়কী নামক স্থানে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে অযোধ্যার তালুকদারগণের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। লরেন্সের শাসনকালে রাজকোষে অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছিল।

নিরপেক্ষতা নীতি

বৈদেশিক নীতি—লরেন্স্‌ বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিজ্ঞোচিত নীতি (Masterly Inactivity) অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আফ্‌গানিস্থানের আমীর দোস্ত্‌ মুহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লরেন্স্‌ কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ সমর্থন করেন নাই। অবশেষে শের আলি নামক দোস্ত্‌ মুহম্মদের এক পুত্র স্বীয় ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিলে, লরেন্স্‌ তাঁহাকেই প্রকৃত আমীর বলিয়া স্বীকার করেন।

দেওয়ানগিরির যুদ্ধ

ভূটান রাজের সম্বন্ধে লরেন্স্‌ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ভূটানিগণ প্রায়ই উত্তর-বাংলা ও আসামের নানা স্থান লুণ্ঠন করিত। অবশেষে তাহারা একজন বৃটিশ দূতকে অপমান করে। তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য লরেন্স্‌ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন (১৮৬৪)। **দেওয়ানগিরির যুদ্ধে** ভূটানিরা জয়লাভ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। ভূটানিরা বাৎসরিক বৃত্তির বিনিময়ে দুয়ার প্রদেশ ইংরেজদিগের সমর্পণ করে।

লর্ড্‌ মেয়ো (১৮৬৯-৭২)

সার জন লরেন্সের পর লর্ড্‌ মেয়ো বড়লাট হইলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি আন্দামান দ্বীপে এক মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত হন।

বৈদেশিক নীতি—লর্ড্‌ মেয়ো লরেন্সের ন্যায় নিরপেক্ষতা নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। আফ্‌গানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তিনি

আমীর শের আলিকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত **অম্বালা** শহরে **দরবার** করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। আফগান আমীরের অভ্যর্থনা

দেশীয় রাজ্যসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড্ মেয়ো বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে দেশীয় রাজকুমারগণের সুশিক্ষার জন্য আজমেরে **মেয়ো কলেজ** স্থাপিত হয়।

আভ্যন্তরীণ ঘটনা—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র **ডিউক অব এডিন্‌বরা** এদেশে আগমন করেন। এই সময়ে সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাতায়াত সহজ হয়।

লর্ড মেয়ো **রাজস্ব বিভাগে** বহু **সংস্কার** প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সময়ে আয়কর ও লবণকর বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট্‌সমূহের সহিত ভারত গভর্ন্মেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক এক নূতন বন্দোবস্ত হয়। ভারত গভর্ন্মেণ্ট্, প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ন্মেণ্ট্‌কে কেন্দ্রীয় রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; প্রাদেশিক গভর্ন্মেণ্ট্‌সমূহ স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের জন্য উহা ব্যয় করেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। রাজস্ব সংস্কার

লর্ড্ মেয়োর সময় ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম **লোক গণনা** করা হইয়াছিল।

লর্ড্ নর্থ্‌ব্রুক্ (১৮৭২-৭৬)

বৈদেশিক নীতি—লর্ড্ মেয়োর পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড নর্থ্‌ব্রুক আফ্‌গানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন না। আমীর **শের আলি** তাঁহার নিকট বিপৎকালে সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। ফলে শের আলি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে উৎসুক হইলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার **গায়্‌কবাড়্** মল্‌হর রাও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন। তিনি স্বীয় রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেণ্ট্‌কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অভিযোগে তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানে তাঁহার দোষ নিঃসন্দেহ-ভাবে বরোদার গায়্‌কবাড়্

প্রমাণিত হইল না। তখন কুশাসনের অভিযোগে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার দূরবর্ত্তী আত্মীয় সয়াজী রাও নামক এক বালককে বরোদার সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

আভ্যন্তরীণ ঘটনা—১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড) সপত্নীক ভারতবর্ষে আগমন করেন।

অবাধ বাণিজ্য নীতি

লর্ড নর্থব্রুক্ **অবাধ বাণিজ্য নীতি** (Free Trade) প্রবর্ত্তন করেন এবং আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক কমাইয়া দেন। তিনি বিলাতি বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। নর্থব্রুক্ আয়কর হ্রাস করেন।

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহারে এক **দুর্ভিক্ষ** উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের যত্নে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই।

লর্ড্ লিটন্ (১৮৭৬-৮০)

আভ্যন্তরীণ ঘটনা—লর্ড্ নর্থব্রুকের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্ লিটনের শাসনকাল নানা কারণে বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার সময়ে পার্লামেণ্টের এক আইন Royal (Titles Act, 1876) অনুসারে রাণী ভিক্টোরিয়া **ভারতসম্রাজ্ঞী** উপাধি ধারণ করেন। এই পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিবার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে **দিল্লীতে** এক বিরাট্ **দরবার** অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যসমূহ রাণীর মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হইত; এখন উহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধীন রাজ্যে পরিণত হইল। ভারতে ইংলণ্ডের সার্ব্বভৌমত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।

দিল্লীর দরবার ১৮৭৭

লর্ড্ লিটন যখন মহাসমারোহে দরবার করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণ-ভারতে এক ভয়ানক **দুর্ভিক্ষ** উপস্থিত হয় (১৮৭৭-৭৮)। গভর্ণ্মেণ্টের শৈথিল্যের ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। লর্ড্ লিটন্ দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকার নির্দ্ধারণের জন্য এক কমিশন (Famine Commission) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট্ অনুযায়ী সরকারের দুর্ভিক্ষ-প্রতিকার নীতি স্থির হয়।

দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ

লর্ড্ লিটন্ অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থক ছিলেন। তাঁহার সময় অনেকগুলি জিনিষের উপর কর রহিত করা হয়। লর্ড্ মেয়োর সময়ে

প্রাদেশিক গভর্ন্‌মেন্ট্‌-সমূহের সহিত ভারত গভর্নমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক চুক্তির যে নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা লর্ড লিটনের সময়ে আরও প্রসারিত হয়।

লর্ড লিটন নানা বিষয়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রসমূহ যাহাতে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে না পারে, সেজন্য তিনি **দেশীয় সংবাদপত্র আইন** (Vernacular Press Act) প্রবর্ত্তন করেন (১৮৭৮)। সরকারের অনুমতি ব্যতীত অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করিবার জন্য এক **অস্ত্র-আইন** (Arms Act) বিধিবদ্ধ হয়। ভারতীয় কর্ম্মচারিগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দানের জন্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে **ষ্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস** (Statutory Civil Service) স্থাপিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এই প্রথা রহিত করা হইয়াছিল।

দেশীয় সংবাদপত্র ও অস্ত্র আইন

বৈদেশিক নীতি—দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮০)— উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া ধীরে ধীরে মধ্য-এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। আফগানিস্থানের আমীরের সহায়তা পাইলে রাশিয়া সহজেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত। এইজন্য রাশিয়া যাহাতে আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে না পারে, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লর্ড নর্থব্রুকের নীতির ফলে আমীর শের আলি ইংরেজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলি (Disraeli বা Lord Beaconsfield) এই বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য লর্ড লিটন্‌কে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করেন। শের আলির আচরণে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া লর্ড লিটন্ বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোয়েটা অধিকারপূর্ব্বক তথায় বৃটিশ সৈন্যনিবাস স্থাপন করিলেন এবং নানাপ্রকারে আমীরকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনার ফলে শের আলির বিরুদ্ধভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার এক দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং লর্ড লিটনের

দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধের কারণ

দূতকে আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশের অনুমতি না দিয়া রাশিয়ার প্রতি তাঁহার মিত্রতা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। ফলে তিন দল বৃটিশ সৈন্য তিন দিক হইতে আমীরের রাজ্য আক্রমণ করিল। শের আলি তুর্কিস্থানে পলায়ন করেন এবং কিছুদিন পরে তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র **ইয়াকুব খাঁ** ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে **গণ্ডামকের সন্ধি** দ্বারা বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে গভর্ন্‌মেন্টের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার দরবারে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট্‌ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আফ্‌গানেরা বৃটিশ দূত সার লুই ক্যাভাগ্‌নরীকে কাবুলে হত্যা করিল ; কারণ আমীর ইয়াকুব খাঁ ইংরেজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া জনমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় আফগানিস্থান আক্রমণ করিল এবং ইয়াকুব খাঁকে নির্ব্বাসিত করিল। ইতিমধ্যে বিলাতের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হয় এবং উদারনৈতিক (Liberal) প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাড্‌স্টন (Gladstone) লর্ড লিটনের নীতি অনুমোদন না করায় আফ্‌গান যুদ্ধের সমাপ্তির পূর্ব্বেই বড়লাট পদত্যাগ করেন।

(গণ্ডামকের সন্ধি)

(আফ্‌গানিস্থান আক্রমণ)

লর্ড্‌ রিপন্‌ (১৮৮০-৮৪)

লর্ড লিটনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্‌ রিপন্‌ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সময়ে নানাবিধ সংস্কার এবং জনসাধারণের হিতকর কার্য্যের সূত্রপাত হয়।

দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধের অবসান—ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লর্ড্‌ রিপন্‌কে আফ্‌গান যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইল। ইয়াকুব খাঁর নির্ব্বাসনের পর **আব্দুর রহমান** নামক শের আলির এক ভ্রাতুষ্পুত্র কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। লর্ড্‌ রিপন্‌ এই শর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন যে, তিনি ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইবেন না। ইতিমধ্যে **আয়ূব খাঁ** নামে শের আলির এক পুত্র সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা

(আমীর আব্দুর রহমান)

করিতেছিলেন। তিনি **মাইবন্দের যুদ্ধে** ইংরেজদিগকে পরাজিত করেন ; কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্য তাঁহাকে পরাজিত করিল। অবশেষে আব্দুর রহ্মানই কাবুলের আমীর হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দ্বিতীয় আফ্গান যুদ্ধের ফলে বৃটিশ বেলুচিস্থান প্রদেশ গঠিত হয়। খেলাত রাজ্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইংরেজগণের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কোয়েটা শহরে স্থায়িভাবে বৃটিশ সৈন্যনিবাস স্থাপিত হইল, এবং আফ্গানিস্থানে রাশিয়ার ষড়্যন্ত্র ব্যর্থ হইল। আফ্গান যুদ্ধের ফল

মহিসূর্ প্রত্যর্পণ—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ (লর্ড্ উইলিয়ম্ বেন্টিকের সময় হইতে) মহিযুর্ রাজ্য ইংরেজগণের শাসনাধীন ছিল। লর্ড্ রিপন্ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহার শাসনভার পুনরায় হিন্দু রাজার হস্তে অর্পণ করেন।

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী—আফ্গান যুদ্ধের সমাপ্তির পর লর্ড্ রিপন্ আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের **আদমসুমারী** বা লোকগণনা করা হয়। সেই সময় হইতে প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর লোকগণনা করা হইয়া থাকে। লর্ড্ রিপন্ রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সংস্কার করেন এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিশু শ্রমিকগণের দুরবস্থার লাঘব করিবার জন্য একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। বাংলার প্রজার সুবিধার জন্য প্রজাস্বত্ব বিষয়ক একটি আইন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। ইহা পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্ ডফ্রিনের সময় কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। লর্ড্ রিপন্ লবণের উপর শুল্ক হ্রাস করিয়া জনসাধারণের উপকার করেন। তিনিও অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থক ছিলেন ; তাই তাঁহার সময়ে বহু বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড্ লিটনের প্রবর্ত্তিত 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' রহিত করিয়া লর্ড্ রিপন্ ভারতীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার দান করেন। আদমসুমারী শ্রমিক আইন লবণ শুল্ক হ্রাস অবাধ বাণিজ্য মুদ্রণ স্বাধীনতা

লর্ড্ রিপনের সময় বাংলা দেশে **স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন** (Local Self-Government) প্রথা প্রসারিত হয়। ইহার পূর্ব্বেই কলিকাতা,

মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু এই মিউনিসিপ্যালিটির উপর জনসাধারণের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। তিনি একটি নূতন আইন (Bengal Municipal Act, 1884) পাশ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। এই আইন অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য করদাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যগণ সকলেই গভর্ণমেণ্টের মনোনীত ছিলেন। * শহরের বাহিরে অর্থাৎ গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের উন্নতি করিবার জন্য মেয়োর সময়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জেলাগুলিতে একটি করিয়া 'কাউন্সিল' (District Council) স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা লর্ড রিপন্ জেলা কাউন্সিলের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক জেলায় একটি **জেলা বোর্ড** (District Board) ও প্রত্যেক মহকুমায় একটি **লোকাল বোর্ড** (Local Board) স্থাপন করেন। এই সকল বোর্ডের সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় করদাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং কয়েকজন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। † এই বন্দোবস্তের ফলে কেবল যে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হইল, তাহা নহে; জনসাধারণও ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল।

মিউনিসি-প্যালিটি

জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড

শিক্ষার উন্নতির জন্য লর্ড রিপন্ **হাণ্টার কমিশন** নামে এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এই কমিশনের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ছিল।

শিক্ষা কমিশন

তৎকালে আইনের দৃষ্টিতে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ভারতীয় বিচারকগণ ফৌজদারি মোকদ্দমায় ইউরোপীয়

* ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হয়। বাংলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সভ্যগণের তিন-চতুর্থাংশ করদাতৃগণের নির্ব্বাচিত এবং এক-চতুর্থাংশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

† পরে বাংলাদেশের জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্ব্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

অপরাধীর বিচার করিতে পারিতেন না। এই বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়া লর্ড রিপন্ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ইউরোপীয়দিগের অবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে আইন-সচিব মিঃ ইল্‌বার্ট্ এই উদ্দেশ্যে এক বিল প্রস্তুত করেন। তদানীন্তন আইন-সচিবের নাম অনুসারে এই বিল **ইল্‌বার্ট্ বিল** (Ilbert Bill) নামে পরিচিত। ইউরোপীয়গণের প্রবল প্রতিবাদে এই বিল অসম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যে পরিণত হয়। স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকগণ ফৌজদারি মোকদ্দমায় ইউরোপীয়দিগের বিচার করিবেন; তবে ইউরোপীয় আসামীরা ইউরোপীয় জুরির দাবি করিতে পারিবে। ইল্‌বার্ট বিল

লর্ড ডফ্‌রিন (১৮৮৪-৮৮)

বৈদেশিক নীতি—লর্ড রিপনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড ডফ্‌রিন রাশিয়ার সহযোগিতায় আফ্‌গানিস্থানের উত্তর সীমা নির্দ্দেশের বন্দোবস্ত করেন এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডিতে আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করেন।

লর্ড ডফ্‌রিনের সময়ে **তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ** সংঘটিত হয় (১৮৮৫)। উত্তর-ব্রহ্মের রাজা **থিব** (Thibaw) ইংরেজ বণিকগণের উপর অত্যাচার করিতেন এবং তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ফলে ইংরেজ সৈন্যদল ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় অধিকার করিল। রাজা থিবকে নির্ব্বাসিত করা হইল (১৮৮৬)। উত্তর-ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল। তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ

আভ্যন্তরীণ নীতি—লর্ড ডফ্‌রিন ঝান্সীর পরিবর্ত্তে গোয়ালিয়র প্রদান করিয়া সিন্ধিয়াকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি বাংলা, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের কৃষকগণের উপকারার্থ প্রজাস্বত্ববিষয়ক কয়েকটি আইন করেন। তাঁহার সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর কাল পূর্ণ হওয়ায় মহাসমারোহে **জুবিলী** (Jubilee) **উৎসব** হয় (১৮৮৭)। জুবিলী উৎসব ১৮৮৭

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** (Indian National Congress) স্থাপিত হয় এবং বোম্বাই নগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশ- জাতীয় কংগ্রেস

নায়কগণ ইহার স্থাপয়িতা ছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং এদেশে পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী গণতন্ত্রমূলক শাসন স্থাপনই কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল। ক্রমে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল।

লর্ড্ ডফ্‌রিণের সময়ে (১৮৮৬) আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে (তৎকালীন 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ') ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট্ অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়।

লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন (১৮৮৮-৯৪)

বৈদেশিক নীতি—লর্ড্ ডফ্‌রিনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন সীমান্ত প্রদেশসমূহে বৃটিশ প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সিকিম, আসামের অন্তর্গত লুসাই পর্ব্বত, এবং ব্রহ্মদেশের শান রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

মণিপুর রাজ্যে গোলযোগ

আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত **মণিপুর** রাজ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে, লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন উক্ত রাজ্যের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে পদচ্যুত করিবার বন্দোবস্ত করেন। এই উপলক্ষে আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কুইণ্টন মণিপুরে গমন করেন এবং তথায় কতিপয় অনুচরসহ মণিপুর-সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট টিকেন্দ্রজিৎকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এক নাবালক রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন। রাজ্যের শাসনভার একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইল।

কাশ্মীর ও খেলাত

লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউনের সময়ে ইংরেজগণ কিয়ৎকালের জন্য কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করে এবং গিল্‌গিট উপত্যকার অন্তর্গত কয়েকটি পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করে। খেলাতের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়।

লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন আফগানিস্থানের আমীর আব্দুর রহ্‌মানের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করেন। এই সময়েই সার মর্টিমার ডুরাণ্ড নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী বৃটিশ ভারত

ও আমীরের রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই রেখা **ডুরাণ্ড্ লাইন** নামে প্রসিদ্ধ। ডুরাণ্ড্ লাইন

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী—রাশিয়ার আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার সুবিধার জন্য লর্ড ল্যান্স্ডাউনের সময়ে 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ট্রুপস্' (Imperial Services Troops) নামক এক নূতন সৈন্যদল গঠিত হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিপৎকালে সাহায্য করিবার জন্য দেশীয় রাজগণ এই সৈন্যদল পোষণ করিতে লাগিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ সংস্কৃত করিবার জন্য পার্লামেণ্ট্ কর্ত্তৃক **ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স্ অ্যাক্ট্** Indian Councils Act) নামক আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সভ্যগণকে শাসনকার্য্য ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও মন্তব্য জ্ঞাপন করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় আইন সভার সভ্যগণ গভর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক এবং প্রাদেশিক আইন সভার সভ্যবৃন্দ গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে, বড় বড় শহর, বিশ্ববিদ্যালয় ও বণিক্ সভা প্রভৃতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণ আইন সভায় স্থান লাভ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাচন গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র স্থাপনের সূত্রপাত হইল। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার

লর্ড্ ল্যান্স্ডাউনের সময়ে এক **ফ্যাক্টোরি আইন** দ্বারা কলকারখানায় স্ত্রীশ্রমিকের কাজ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই সময়ে রৌপ্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় নিদারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। কারখানা আইন

দ্বিতীয় লর্ড্ এল্গিন (১৮৯৪-৯৯)

বৈদেশিক নীতি—লর্ড্ ল্যান্স্ডাউনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্ এল্গিনের সময়ে অক্সস্ (Oxus) নদীর তীর পর্য্যন্ত রাশিয়ার সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অর্দ্ধসভ্য জাতিসমূহ বিদ্রোহী হওয়ায় তাহাদিগকে দমন করা হয় এবং চিত্রলে বৃটিশ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী—লর্ড্ এল্‌গিনের সময়ে ভূমিকম্প, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের ফলে ভারতবর্ষের বিশেষ অনিষ্ট হয়। প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য সরকারি চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করে নাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মহাসমারোহে **হীরক জুবিলী** (Diamond Jubilee) উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ভারতীয় **সেনাদল** তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক ভাগ একজন স্বতন্ত্র সেনানায়কের অধীন ছিল। লর্ড্ এল্‌গিন এই ব্যবস্থায় সমগ্র বাহিনী একজন প্রধান সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করেন।

লর্ড্ কার্জ্জন্ (১৮৯৯-১৯০৫)

লর্ড্ কার্জ্জন্ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃটিশ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে ভারতে বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বৈদেশিক নীতি—পশ্চিম-এশিয়ার বৃটিশ প্রভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য লর্ড্ কার্জ্জন্ **পারস্য** দেশে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তিব্বত অভিযান

তিনি **তিব্বতে** একটী অভিযান প্রেরণ করেন। ইংরেজ সৈন্য তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইহার ফলে কোন স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারে নাই।

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী—বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্য এবং সীমান্তবাসী অর্দ্ধসভ্য জাতিসমূহকে দমন করিবার জন্য লর্ড্ কার্জ্জন্ পঞ্জাবের কয়েকটি জেলা এবং সীমান্তের কিয়দংশ সম্মিলিত করিয়া **উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ** (North-Western Frontier Province) নামে নূতন একটী প্রদেশ গঠন করেন এবং একজন চীফ কমিশনারের উপর উহার শাসনভার অর্পণ করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

সেনাদল গঠন

তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য **ইম্পীরিয়াল ক্যাডেট কোর** (Imperial Cadet Crops) নামে এক সৈন্যদল গঠন করেন। কার্জ্জন্ হায়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বেরার প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

বেরার

পঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন (The Punjab Land Alienation

Act) দ্বারা তিনি ঐ প্রদেশের কৃষকদিগকে মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। **কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান সমিতি** (Co-operative Credit Societies) স্থাপন করিয়া তিনি দরিদ্র ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী ও সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেন। **শিল্প বাণিজ্য** বিষয়ক সমুদয় সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন্ একটি নূতন শাসন-বিভাগ স্থাপন করেন। **পুলিশ** বিভাগে বহু সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হয়। দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার জন্য **লবণ কর** এবং মধ্যবিত্তদিগের জন্য **আয় কর** হ্রাস করা হয়। *কৃষকের উন্নতি* *শিল্পবাণিজ্য ও পুলিশ বিভাগ* *কর হ্রাস*

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী **ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু** হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ জাঁকজমক সহকারে দিল্লীতে এক **দরবার** করা হয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ কার্জ্জন্ এক আইন (Indian Universities Act) দ্বারা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কার করেন। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। *বিশ্ববিদ্যালয় আইন*

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য **বঙ্গ বিভাগ** করিয়া লর্ড্ কার্জ্জন্ সমগ্র দেশব্যাপী এক প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পূর্ব্বে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিতভাবে একজন লেফ্টেনাণ্ট্ গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। ইহাতে শাসনকার্য্যের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিত; কারণ একজন শাসনকর্ত্তার পক্ষে এত বড় প্রদেশের শাসনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করা কঠিন ছিল। লর্ড্ কার্জ্জন আসাম ও পূর্ব্ব-বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিলেন; পশ্চিম-বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সম্মিলিত ভাবে অপর একটি প্রদেশরূপে পরিণত হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশমান্য নেতৃগণের প্রেরণায় দেশবাসী এই নূতন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করে; কারণ অনেকেরই ধারণা হইল যে, বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্ব্বল করিবার জন্যই লর্ড্ কার্জ্জন্ বঙ্গভঙ্গ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট্ এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হন। তখন দেশে বহু গুপ্ত সমিতি স্থাপিত *বঙ্গ বিভাগ*

হইল এবং বিপ্লবীরা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিতে লাগিল। আবার সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃগণ অহিংসায় আস্থাবান্ থাকিয়া বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। এইরূপে বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতে **স্বদেশী আন্দোলন** আরম্ভ হয়। এই নবজাগ্রত জাতীয় ভাব আপাততঃ কার্য্যকর হইল না বটে; কিন্তু ক্রমশঃ ইহার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

স্বদেশী আন্দোলন

লর্ড্ কার্জ্জন কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের মঙ্গলজনক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দেশের **প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্নসমূহ রক্ষা** করিবার জন্য তিনি এক আইন পাশ করেন এবং প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিও তাঁহার সময়ে স্থাপিত হয়।

প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ
লাইব্রেরী

দ্বিতীয় লর্ড্ মিণ্টো (১৯০৫-১০)

লর্ড্ কার্জ্জনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড্ মিণ্টো বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য কঠোর বব্যস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার কয়েকজন প্রসিদ্ধ জননায়ক বিনা বিচরে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসিত হন। দমন নীতির সঙ্গে সঙ্গে লর্ড্ মিণ্টো সংস্কার-নীতিও অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব লর্ড্ মর্লির সহিত সম্মিলিতভাবে তিনি যে সংস্কার-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন তাহা **মর্লি-মিণ্টো সংস্কার** (Morley-Minto Reforms) নামে পরিচিত। প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বে-সরকারি সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এই সময়েই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা (communal representation) প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পৃথক্‌ভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণকে সাক্ষাৎভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল না; কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জেলা বোর্ড্ ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত হইল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সভ্যগণের অধিকার প্রসারিত হইল। ভারত-সচিবের পরিষদে (India Council)

দমন নীতি

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার

স্বায়ত্তশাসনের প্রসার

এবং বড়লাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের শাসন-পরিষদসমূহে (Executive Council) ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ* বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন-সচিব নিযুক্ত হইলেন এবং কিশোরীলাল গোস্বামী বাংলার লেফ্টেনাণ্ট্ গভর্নরের শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিবের পরিষদে দুইজন ভারতীয় সদস্য (সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং সৈয়দ হোসেন বিল্‌গ্রামী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ (১৯১০-১৬)

লর্ড্ হার্ডিঞ্জের শাসনকালে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড্ পরলোকগমন করেন (১৯১০) এবং তাঁহার পুত্র **পঞ্চম জর্জ্জ্** সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং **দিল্লীতে** তাঁহাদের অভিষেক সম্পর্কে এক বিরাট্ **দরবার** অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হয় এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলা সম্মিলিতভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত হইল এবং একজন গভর্ণরের শাসনাধীন হইল। বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত ভাবে একটি নূতন প্রদেশে পরিণত হইল। আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন হইল।

দিল্লীর দরবার

বঙ্গবিভাগ রহিত করণ

লর্ড্ হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ইউরোপে ইংরেজ ও তদীয় মিত্রবর্গের সহিত জার্ম্মানি ও অন্যান্য শক্তির প্রথম **মহাযুদ্ধ** (First World War) আরম্ভ হয় (১৯১৪)। এই বিপদের সময় ভারতবর্ষ অর্থ এবং সৈন্য দ্বারা ইংরেজগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

লর্ড্ চেম্‌সফোর্ড্ (১৯১৬-২১)

শিক্ষা-সংস্কার—লর্ড্ চেম্স্ফোর্ডের শাসনকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে **স্যাড্লার কমিশন** (Sadler Commission) নিযুক্ত করা হয়। সার মাইকেল স্যাড্লার নামক

স্যাডলার কমিশন

* ইনি পরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন এবং বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্নরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী এই কমিশনের সভাপতি এবং **সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্ট্ অনুযায়ী কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা হইল।

শাসন-সংস্কার—মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতবাসিগণের সাহায্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজ গভর্নমেণ্ট্ স্থির করেন যে, তাহাদের রাজনৈতিক দাবি কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিবার জন্য শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই নীতি অনুযায়ী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণকে সাম্রাজ্যের সামরিক মন্ত্রণা-সভায় (Imperial War Conference) আহ্বান করা হইল। এবং উক্ত সভার এক মন্তব্য দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈদেশিক নীতি পরিচালনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। অতঃপর ভারতসচিব মিঃ **মণ্টেগু** ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন, "শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইবে, এবং ভারতবর্ষ যাহাতে সাম্রাজ্যের অংশরূপে দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র লাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, সে জন্য ভারতে স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতে হইবে।" এই ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে নূতন **ভারত-শাসন আইন** (Government of India Act, 1919) বিধিবদ্ধ করে। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড্ চেম্‌স্‌ফোর্ড্ সম্মিলিতভাবে এক রিপোর্ট্ দাখিল করিয়াছিলেন; সেই রিপোর্ট্‌কে ভিত্তি করিয়াই এই আইন প্রণীত হইয়াছিল। শাসন-তন্ত্রের এই পরিবর্ত্তন **মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্ সংস্কার** (Montague Chelmsford Reforms) নামে পরিচিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই আইন অনুযায়ী নূতন শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার

এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। ভারত-সচিবের পরিষদে (India Council) সভ্য সংখ্যা হ্রাস করা হইল। বিলাতে ভারত সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়

করা, বিলাতে ভারতীয় শিক্ষার্থিগণের তত্ত্বাবধান করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য **হাই কমিশনার** (High Commissioner) সংজ্ঞক একজন উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। গভর্নর-জেনারেল শাসন পরিষদে (Executive Council of the Viceroy) তিন জন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সমগ্র বৃটিশ ভারতের প্রতি প্রযোজ্য আইন প্রণয়নের জন্য **ব্যবস্থাপক সভা** (Legislative Assembly এবং **রাষ্ট্রীয় পরিষদ্** (Council of State) নামক দুইটি কক্ষসমন্বিত এক আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যবস্থাপক সভার ১৪৪ জন সভ্যের মধ্যে ১০৩ জন জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং বাকী ৪১ জন গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ৬০ জন সভ্যের মধ্যে ৩৩ জন নির্ব্বাচিত এবং বাকী ২৭ জন গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। সাধারণতঃ এই উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে আইন প্রণয়ন এবং আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ করা হইবে; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে গভর্নর জেনারেল উভয় কক্ষের বা যে কোন কক্ষের মত অগ্রাহ্য করিয়া অস্থায়ী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে এবং রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করিতে পারিবেন। গভর্ণর-জেনারেলের শাসনপরিষদের সদস্যগণ আইন সভার নিকট দায়ী হইবেন না।

হাই-কমিশনার

ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ্

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে **'ডায়ার্কি'** (Dyarchy) বা দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। প্রাদেশিক গভর্ন্‌মেণ্টের উপর যে সকল বিষয়ের শাসনভার ন্যস্ত হইল, উহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—রক্ষিত (Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transferred)। আইন ও শৃঙ্খলা, জেল, বিচার প্রভৃতি বিষয় রক্ষিত বিভাগের অন্তর্গত গভর্নরের শাসন-পরিষদের (Executive Council of the Governor) সভ্যগণের শাসনাধীন ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্গত এবং দেশীয় মন্ত্রিগণের (Ministers) শাসনাধীন ছিল। শাসন-পরিষদের সভ্যেরা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী ছিলেন না; কিন্তু মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্নর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং উক্ত সভার নিকট দায়ী ছিলেন। ব্যবস্থাপক

প্রাদেশিক শাসন

রক্ষিত বিভাগ

হস্তান্তরিত বিভাগ

মন্ত্রিগণ

সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাধিক্য ছিল; কিন্তু গভর্ন্‌মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন সভ্যও সভায় আসন গ্রহণ করিতেন।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ সংস্কারের ফলেও ভারতের স্বাধীনতাকামী জাতীয় দল সন্তুষ্ট হইল না। **মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু** প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃগণের প্রেরণায় এই আইনের বিরুদ্ধে দেশময় ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুল্‌তানের প্রতি ইংরেজ ও তদীয় মিত্রশক্তির দুর্ব্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ভারতীয় মুসলমানগণ **খিলাফৎ আন্দোলন** আরম্ভ করে। কংগ্রেস এই আন্দোলন সমর্থন করিতে থাকে।

কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলন

লর্ড্‌ চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ **রাউলাট আইন** (Rowlatt Act) নামে পরিচিত এক দমনমূলক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। জেনারল ডায়ার নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ পঞ্জাবের অন্তর্গত জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর প্রতি গুলিবর্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক ভারতীয়ের প্রাণনাশ করেন। কিন্তু বড়লাট ইহার কোন প্রতিকার করেন নাই।

দমননীতি

বৈদেশিক নীতি—লর্ড্‌ চেম্‌স্‌ফোর্ডের সময় **তৃতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ** সংঘটিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমীর আমানুল্লা ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করেন। কয়েক মাস পরেই সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজগণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আমীরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে।

লর্ড্‌ রেডিং (১৯২১-২৬)

লর্ড্‌ রেডিং মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করিয়া এবং লবণ কর বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাউলাট আইন রহিত হয় এবং ফৌজদারি আইনের সংস্কার করা হয়। লর্ড রেডিং ভারতীয় নৌবাহিনী (Royal Indian Navy) গঠনের ব্যবস্থা করেন।

লর্ড্‌ আরুউইন (১৯২৬-৩১

লর্ড্‌ আরুউইনের সময় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের ফলাফল বিচার করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন (Simon Commision) ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়

সাইমন কমিশন

(১৯২৭)। কোন ভারতবাসী এই কমিশনে সদস্য নিযুক্ত না হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়। কমিশনের সভ্যগণ ভারতবর্ষে বিশেষ অনুসন্ধানের পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এক বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

আইন অমান্য আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে **আইন অমান্য আন্দোলন** (Civil Disobedience Movement) আরম্ভ করে। ফলে মহাত্মাজী-প্রমুখ বহু নেতা এবং সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হন। অবশেষে লর্ড্ আরউইন মহাত্মাকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত এক সাময়িক মীমাংসা (Gandhi-Irwin Agreement) করেন।

গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রথম **গোলটেবিল বৈঠক** (Round-Table Conference) হয়। এই বৈঠকে বহু ভারতীয় নেতা উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু কংগ্রেস ইহাতে অংশ গ্রহণ করে নাই।

লর্ড্ উইলিংডন (১৯৩১-৩৬)

লর্ড্ উইলিংডনের সময়ে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরেজ গভর্ন্মেণ্ট তাঁহার দাবিসমূহ গ্রহণ করিলেন না। কংগ্রেস পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে ; লর্ড্ উইলিংডন কঠোর ভাবে ইহা দমন করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরের প্রস্তাব অনুসারে পার্লামেণ্টে নূতন ভারত-শাসন আইন (Government of India Act, 1935) বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ভারতে একটি সংঘীভূত রাষ্ট্র (Federation) গঠনের ব্যবস্থা হয়। ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে স্বতন্ত্র করিবার বন্দোবস্ত হইল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্ পরলোক গমন করেন। অতঃপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **অষ্টম এড্ওয়ার্ড্** নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

Model Questions

1. Give an account of the viceroyalty of Lord Canning.

2 Describe the reforms associated with the administration of Lord Ripon.

3. What do you know about the reforms introduced during the administration of Lord Lansdown ?

4. Summarise the chief events of Lord Curzon's administration.

5. Write a note on the Morley-Minto reforms ; the Montague-Chelmsford reforms ; the Government of India Act of 1935.

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতের সূচনা ও বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভারতে স্বাধীনতার সূচনা

প্রাদেশিক স্বাত্মকর্ত্তৃত্ব প্রবর্ত্তন	...	১৯৩৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	...	১৯৩৯-৪৫
বাংলার মন্বন্তর	...	১৯৪৩-৪৪
আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের মণিপুর আক্রমণ	...	১৯৪৪
ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন	...	১৯০৬
রাষ্ট্রতন্ত্র সংগঠক পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা	...	১৯৪৬
অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন	...	১৯৪৬
ভারত বিভাগ, ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা	..	১৯৪৭
ভারতে সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	...	১৯৫০

লর্ড্ লিন্‌লিথ্‌গো (১৯৩৬-৪৩)

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট্ অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড্ সিংহাসন ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা **ষষ্ঠ জর্জ্জ্** নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে এগারটি প্রদেশে (বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম) প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (**Provincial Autonomy**) প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ব্বাচনে ছয়টি প্রদেশে (বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার এবং আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্ত প্রদেশ) কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য লাভ করে; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস অন্যান্য সমস্ত দলের সম্মিলিত সভ্য-সংখ্যার সমতা লাভ করে এবং বাকী চারিটি প্রদেশে (বাংলা, আসাম, পঞ্জাব ও সিন্ধু) অ-মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত প্রায় সমুদয় আসন অধিকার করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের শাসনভার পরিচালনা করাই সাধারণ রীতি; কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে গভর্নরদিগকে যে সমুদয় ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে মন্ত্রিগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। অবশেষে বড়লাট এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রাদেশিক গভর্নরগণ দৈনন্দিন শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তখন আটটি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে অ-কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা কার্য্য করিতে থাকে। কংগ্রেসি মন্ত্রিগণ কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কালের মধ্যে বহু জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিধি-অনুযায়ী শাসন-সংস্কার

কংগ্রেস-পন্থী-দিগের প্রাধান্য

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মানির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হয়। বৃটিশ গভর্ন্‌মেণ্ট্ এই সময়ে ভারতবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করিলে কংগ্রেস এই অঙ্গীকার দাবি করে যে, যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। বৃটিশ গভর্ন্‌মেণ্ট এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কংগ্রেসি মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। ইহার ফলে অনেকগুলি প্রদেশে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিধি অনুযায়ী শাসনের ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে।

অচল অবস্থা

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানি কর্তৃক পোলাণ্ড্ আক্রান্ত হইলে, উহার দুই দিন পরে গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্স্ জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ইটালি জার্ম্মানির পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পর বৎসর ২২শে জুন জার্ম্মানি রাশিয়া আক্রমণ করিলে, বৃটিশ মিত্রপক্ষ রাশিয়ার সহিত একযোগে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মানির পক্ষে জাপান এবং বৃটিশ পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমরে অবতীর্ণ হয়। ফলে যুদ্ধের অনল সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। জাপান পূর্ব্ব হইতে চীনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল এবং ঐ দেশের অনেক অংশ কবলিত করিয়াছিল। বৃটিশপক্ষ চীনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জাপসৈন্য কর্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত **মালয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর** ও **ব্রহ্মদেশ** অধিকৃত হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও জাপানের করতলগত হইল। ঐ সময়ে আমেরিকার অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত যবদ্বীপ প্রভৃতি জনপদেও জাপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে জাপ বৈমানিকগণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে এবং সিংহলে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। **আসাম** এবং **চট্টগ্রাম** অঞ্চলে বহুবার বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর জাপ বিমানকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম বাংলার রাজধানী **কলিকাতা** আক্রান্ত হয়। কিন্তু শীঘ্রই প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় জাপ আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

পূর্ব্ব-ভারতে বিমান আক্রমণ

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণ করিয়া বড়লাটের শাসনপরিষদ্ প্রসারিত করা হয় এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ্ গঠিত হয়। পর বৎসর মার্চ্চ্ মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারে সার ষ্ট্যাফার্ড্ ক্রিপ্স্ শাসনসংস্কার সম্পর্কিত এক প্রস্তাব লইয়া ভারতে উপস্থিত হন। তাঁহার প্রধান প্রস্তাব এই ছিল যে, ভারতবর্ষকে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্ররূপে অন্যান্য ডোমিনিয়নের ন্যায় বৃটিশরাজ্যের সহিত যুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইবে ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে ভারতের কোন প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা কিংবা নূতন শাসনপদ্ধতি অনুসরণ

ক্রিপ্স্ প্রস্তাব

করিতে পারিবে। সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের থাকিবে। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে ভারতের নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রস্তাব গৃহীত হইল না। অতঃপর আগষ্ট মাসে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়। ফলে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অচল অবস্থা।

পূর্ব্ব-এশিয়ার হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য বৃটিশপক্ষকে বাংলা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য রক্ষা করিতে হয়। ইহার উপর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বন্যা ও ঝটিকার প্রকোপে দক্ষিণ-বাংলার ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা এই দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বহু গুণে অধিক হইয়াছিল। বৎসরের শেষের দিকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চেষ্টায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়; কিন্তু এই সময়ে ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিল। অনাহারে জীবিকাশক্তি হ্রাসের ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু রোগের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই মন্বন্তরে সরকারি হিসাবে ১৫ লক্ষ (অনেকের মতে প্রায় ৫০ লক্ষ) লোক প্রাণ হারায়। বাংলার মন্বন্তর ১৩৫০ সাল (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)

লর্ড্ ওয়েভ্‌ল্ (১৯৪৩—৪৭)—লর্ড্ লিন্‌লিথ্‌গোর কার্য্যকাল শেষ হইবার পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড্ ওয়েভ্‌ল্ বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি পূর্ব্বে ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে এদেশের শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সিঙ্গাপুর ও মালয়ের পতনের সময় বৃটিশ পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য জাপানি সেনার হস্তে বন্দী হয়। এই সময় পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণ সমবেত হইয়া টোকিও-প্রবাসী ভারতীয় নেতা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে **আজাদ হিন্দ্ (স্বাধীন ভারত) সঙ্ঘ** স্থাপন করেন। বন্দী ভারতীয় সেনাদলে যাহারা ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল, আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন

তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। পর বৎসর জুলাই মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি **সুভাষচন্দ্র বসু** সিঙ্গাপুরে পৌছিয়া আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ স্বাধীন ভারতীয় সেনাদল পুনর্গঠন করেন। অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ্ হুকুমত বা **স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট্** গঠন করেন। এই সকল কার্য্যে শাহ্‌নওয়াজ প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিত্বে আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপ-অধিকৃত মালয়াদি অঞ্চলের ভারতীয়বর্গের সহানুভূতি লাভ করে এবং জাপানের মিত্র রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ্ মাসের শেষভাগে ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আজাদ হিন্দ্ সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারের উদ্দেশ্যে ভারতের পূর্ব্বাংশস্থিত **মণিপুর** নামক দেশীয় রাজ্য **আক্রমণ** করে। শীঘ্রই মণিপুরের রাজধানী **ইম্‌ফল অবরুদ্ধ** হয়। উত্তর দিকে আজাদ হিন্দ্ সৈন্য আসামের অন্তর্গত **কোহিমা** পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা ব্রিটিশ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করে। অতঃপর বৃটিশপক্ষের সৈন্য উত্তর-ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। ডিসেম্বর মাসে বৃটিশপক্ষ-কর্তৃক **ভারতীয় সৈন্য** সাহায্যে ভামো নগরী অধিকৃত হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আকিয়াব এবং মার্চ্চ্ মাসে মাণ্ডালয় অধিকৃত হয়। অতঃপর মে মাসের প্রারম্ভে পঞ্চদশ ভারতীয় সেনাদলকর্তৃক ব্রহ্মদেশের রাজধানী **রেঙ্গুন** শত্রু-কবলমুক্ত হয়। জাপানের পরাজয়ের সূচনা হয়। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মার্কিনসেনা জাপগণকে পরাজিত করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ এবং অন্যান্য অনেক অঞ্চল অধিকার করিল। ইউরোপেও জাপানের মিত্র জার্ম্মানির পরাজয় ঘটিল। জার্ম্মানেরা ফ্রান্স্ প্রভৃতি ইউরোপের অধিকাংশ পদানত করিয়া পূর্ব্বদিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ভল্‌গানদীর তীরবর্ত্তী ষ্টালিন্‌গ্রাদে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিত্রপক্ষ **ভারতীয় সৈন্য** সাহায্যে উত্তর-আফ্রিকা হইতে জার্ম্মান ও ইটালীয়ানদিগকে বিদূরিত করে এবং রোমসহ খাস ইটালির সমগ্র দক্ষিণাংশ অধিকার করে। এই বৎসর রাশিয়াতেও জার্ম্মান সৈন্যের

পূর্ব্ব-ভারতে যুদ্ধ

জাপানের পরাজয়ের সূচনা

ইউরোপের যুদ্ধে জার্ম্মানির পরাভয়

পরাজয় আরম্ভ হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের রণক্ষেত্রে জার্ম্মানেরা পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে। ক্রমে পূর্ব্বদিক হইতে ইংরেজ-মার্কিনপক্ষীয় সৈন্য এবং পশ্চিমদিক হইতে রুশসৈন্য খাস জার্ম্মানির অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে জার্ম্মানি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে মার্কিন সেনা **'আণবিক বোমা'** সংজ্ঞক নবাবিস্কৃত ভয়াবহ বিস্ফোরক দ্বারা জাপানের **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** নামক দুইটি নগর **ধ্বংস** করিয়া দেয়। শত্রুর এই নূতন মারণাস্ত্রের ধ্বংস-ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া জাপকর্ত্তৃপক্ষ অধিককাল যুদ্ধ চালাইতে সাহসী হইলেন না। ১৪ই আগষ্ট্ জাপান প্রায় বিনাশর্ত্তে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর মার্কিন সেনাপতি ম্যাক্ আর্থারকে জাপ রাজধানী টোকিওতে প্রেরণ করা হয়। তিনি পরাজিত জাপানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে জাপসেনা অপসারণ এবং জাপপ্রভাব উন্মূলনের চেষ্টা চলিতে থাকে।

জাপানের পরাজয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ব্রিটিশমিত্রপক্ষকে যথাশক্তি সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারতবাসিগণ দলে দলে স্থলসৈন্য, বৈমানিক ও নৌসেনাদলে যোগ দেয় এবং পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করে। বহুসংখ্যক ভারতীয় যোদ্ধা বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার **ভিক্টোরিয়া ক্রস্** (Victoria Cross) এবং অন্যান্য সামরিক সম্মান লাভ করেন। এই যুদ্ধে বৃটিশসেনা ব্যতীত মিত্রপক্ষের অপর কোন দেশের সেনাদলই ভারতীয় সৈন্যগণের ন্যায় এত অধিক সংখ্যায় ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করে নাই। রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি ও রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স্ নামক ভারতীয় নৌ ও বিমানবহরের অবস্থা উন্নত হয়।

মহাযুদ্ধে ভারতের সাহায্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের নিকট হইতে নানারূপে যে অপরিমিত সাহায্য লাভ করেন, কেহ কেহ আশা করিতেছিলেন যে, উহার প্রতিদানে শীঘ্রই ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত-সচিব এমেরি

প্রস্তাব করেন যে, বড়লাটের শাসন পরিষদে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে প্রতিনিধি লওয়া হইবে এবং তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব, আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হইবে। অতঃপর কারারুদ্ধ ভারতীয় নেতৃবর্গকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বড় লাটের উদ্যোগে উক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য সিমলাতে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিগণ এক বৈঠকে সমবেত হন। কিন্তু নানা কারণে সিমলা বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হইল না।

সিমলা বৈঠক

এই সময়ে বৃটেনের নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে শ্রমিকদল পার্লামেণ্টের কমন্স্ সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে। নূতন প্রধানমন্ত্রী **ক্লিমেণ্ট-অ্যাট্‌লি** ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য রাজনৈতিক অচলাবস্থা বিদূরণের জন্য ভারতে আগমন করেন। বড় লাটের সহযোগিতায় ১৬ই মে তাঁহারা একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইহাতে বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হয়। ঐ সম্মিলিত রাষ্ট্রের হস্তে বৃটিশকর্তৃপক্ষ ভারতের শাসন-কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন। কিন্তু উহার সংগঠনের পূর্ব্বেই ভারতীয়গণের দ্বারা পররাষ্ট্র-সম্পর্ক, দেশরক্ষা, চলাচল ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভাগ পরিচালনের ব্যবস্থা হইবে। ঐ সম্মিলিত রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিগঠিত শাসন-পরিষদ্ ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভায় কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন পাশ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। ভারতের প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি আত্মকর্তৃত্বশীল হইবে। একাধিক প্রদেশ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া প্রদেশমণ্ডলের শাসন পরিচালনা করিতে পারিবে। সম্মিলিত রাষ্ট্র বা প্রদেশমণ্ডলের অন্তর্গত কোন প্রদেশ স্বকীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব পাশ করাইয়া দশবৎসর পরে পরে রাষ্ট্র বা মণ্ডলের গঠন ও পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিবর্ত্তন দাবি করিতে পারিবে। তিনটি প্রদেশমণ্ডল গঠনের কথা হয়। ইহাদের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব

কনস্টিটিউএন্ট্ অ্যাসেম্ব্লি

মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রসংগঠক পরিষদ্ (Constituent Assembly) গঠিত হইল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে উহার অধিবেশন আরম্ভ হয়।

মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার এবং উহার অনুকূল আব্হাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বড়লাটের শাসনপরিষদে ১৪ জন ভারতীয় নেতাকে গ্রহণ করিয়া এক সাময়িক অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ন্মেণ্ট্ গঠন করা হয়। দৈনন্দিন শাসনকার্য্যে বড়লাট হস্তক্ষেপ করিবেন না, এইরূপ আশ্বাস পাইয়া কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি পণ্ডিত **জবাহরলাল নেহরু** অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ন্মেণ্ট্ গঠন করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এই গভর্ন্মেণ্ট্ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বড়লাট বাহাদুর ইহার সভাপতি ; পণ্ডিত নেহরু সহকারী সভাপতি এবং পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর মর্য্যাদা লাভ করিলেন। এই গভর্ন্মেণ্ট যে সকল বিষয়ে কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দেন তন্মধ্যে পররাষ্ট্রসমূহে স্বাধীনভাবে ভারতীয় দূতাদি নিয়োগের চেষ্টা উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পূর্ব্ববর্ত্তী লীগ অব নেশন্সের স্থলে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) গঠিত হয়, উহার নিউইয়র্ক অধিবেশনে ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রতিনিধিবর্গ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদিগের প্রতি তথাকার গভর্ন্মেণ্টের দুর্ব্যবহারের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে মুসলীম লীগ নামক প্রতিষ্ঠানভুক্ত কতিপয় মুসলমান নেতাও যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা ভারতের মুসলমান অধিবাসিবহুল অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি করায় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সহিত মুসলমান রাজনৈতিক গণের মতৈক্য হইল না।

অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ন্মেণ্ট্

নূতন নীতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—স্বাধীন ভারত

লর্ড্ মাউণ্ট্ব্যাটেন (১৯৪৭-৪৮)

হিন্দু ও মুসলমান নেতৃগণের সম্মতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বৃটেনের শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ্ মাসে লর্ড্ ওয়েভেলের স্থলে লর্ড্ মাউণ্ট্ব্যাটেনকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি

নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুসলমানেরা যখন কিছুতেই ভারতের মুসলমান অধিবাসিবহুল অংশে স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের দাবি পরিত্যাগ করিতে চাহিল না, তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য অনুসারে দেশবিভাগে রাজী হইলেন। অতঃপর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট্ ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া **ভারত ও পাকিস্থান** নামক দুইটি পৃথক স্বশাসক রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। দেশীয় রাজ্যগুলি ইহার যে কোন একটি রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা রহিল। এই বিভাগ অনুসারে সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পঞ্জাব এবং পূর্ব্ব বাংলা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদয় অংশ নবীন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত রহিল। রাষ্ট্রদ্বয়ের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে দেশীয় ব্যক্তিগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। লর্ড মাউন্ট্ব্যাটেন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু যথাক্রমে নবগঠিত ভারতরাষ্ট্রের বড়লাট এবং প্রধানমন্ত্রী রহিলেন। পাকিস্থানের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও প্রধানমন্ত্রী হইলেন যথাক্রমে কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্না এবং লিয়াকৎ আলী খাঁ। করাচীতে নবীন পাকিস্থান রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের ফলে নানাপ্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়। উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ঐগুলির সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয়ক আইন (Indian Independence Act.) পাশ হইবার পর ভারতের শাসনতন্ত্র সংগঠক পরিষদ ভারতরাষ্ট্র সম্পর্কিত আইনাদি প্রণয়ন বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মধ্যস্থিত চরখার পরিবর্ত্তে চক্রচিহ্ন প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতরাষ্ট্রের পতাকা নির্ম্মিত হইল। অশোকের সারনাথ স্তম্ভের চারিসিংহমূর্ত্তি সমন্বিত শীর্ষের প্রতিকৃতি ভারতের মুদ্রায় গৃহীত হয়। পরে নিম্নে ইহার উপনিষদের বাণী "সত্যমেব জয়তে" সংযুক্ত হইয়াছে।

স্বশাসক ভারতরাষ্ট্রের সৃষ্টি

চক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারী (১৯৪৮—৫০)

ভারতবর্ষে দুইটি স্বশাসক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করিয়া লর্ড্ মাউন্ট্ব্যাটেন স্বদেশে প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অতঃপর

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা চক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারী ভারতরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই বৎসরের শেষ দিকে কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্না মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান শাসক নিযুক্ত হইলেন।

তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ভারতের শাসনতন্ত্র সংগঠক পরিষদ কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইলে ২৬শে নবেম্বর তারিখে পরিষদে উহা গৃহীত হইয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক সাক্ষরিত হইল। এই শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় ভারতরাষ্ট্রকে একটি সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়। পর পরিচ্ছদে স্বাধীন ভারতের এই নবরচিত শাসনতন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী উল্লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল। ভারতের শাসন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার হইতে বৃটিশ অধিকারের সমুদয় চিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, আপাততঃ স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ বা রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিবে না। হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করে।

ভারতে সার্ব্বভৌম গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

বৃটিশকর্ত্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার সময় ভারতের ৫৬৫টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেশীয় রাজ্যের পরিণাম কিন্তু অনিশ্চিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার **বল্লভভাই পটেলের** চেষ্টায় কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরের মধ্যে ভারতের সীমারেখার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় দেশীয় রাজ্যই ভারতরাষ্ট্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হয় এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিচালনাধীন হয়। স্বাধীন ভারতের কর্ত্তৃপক্ষের ইহা একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। ইহার ফলে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও ভারতের রাষ্ট্রশক্তি অভাবনীয়রূপে সবল হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর চষ্টায় আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় প্রধান রাষ্ট্রেই ভারতের দূতাদি নিযুক্ত হইয়াছে। ভারত ক্রমশঃ এশিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলীর মধ্যে নায়কত্ব লাভ করিতে চলিয়াছে।

জনপ্রতিনিধিগণের চেষ্টায় এইবার স্বাধীন ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতি সম্ভব হইবে এবং ভারত বিশ্বসভায় আপনার গৌরবময় স্থান পুনরধিকার করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

Model Questions

1. Describe the circumstances leading to the partition of India and the creation of the Dominions of India and Pakistan.

2. Write notes on :—(a) the Bengal famine of 1943 ; (b) Azad Hind Government ; (c) British Cabinet Mission ; (d) Constituent Assembly ; (e) Interim Government ; (f) merger of the native states.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শাসন-পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ—শাসন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

লণ্ডন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন	...	...	১৬০০
কোম্পানির দেওয়ানি লাভ	...	...	১৭৬৫
লর্ড্ নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট্	...	...	১৭৭৩
পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্	...	...	১৭৮৪
কোম্পানির সনন্দ লাভ	...	১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩	
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স্ অ্যাক্ট্	...	১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯	
মর্লি-মিণ্টো সংস্কার	...	...	১৯০৯
মণ্ট্যাগু-চেম্স্ফোর্ড্ সংস্কার	...	...	১৯১৯
নূতন ভারত-শাসন আইন	...	...	১৯৩৫
অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ও কন্স্টিটুয়েন্ট্ অ্যাসেম্ব্লি গঠন	...	...	১৯৪৬
ভারত বিভাগ এবং ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা		...	১৯৪৭
ভারতে সার্ব্বভৌম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	...	...	১৯৫০

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-পদ্ধতি—১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ 'লণ্ডন ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামক বণিক্‌-সমিতিকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ (charter) প্রদান করেন। এই সনন্দ অনুসারে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের শাসনভার প্রাপ্ত হয়। আবশ্যক মত আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও কোম্পানিকে দেওয়া হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ পুনরায় কোম্পানিকে এক সনন্দ দান করেন। এই সনন্দ অনুসারে কোম্পানি ভারতবর্ষে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে এবং কোম্পানির এলাকায় যে সকল ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজা বাস করিত তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিতে অধিকারী হইল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে কোম্পানি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট্ এক আইন দ্বারা কোম্পানিকে স্বীয় সৈন্যদলের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পণ করে।

বাণিজ্য সনন্দ, ১৬০০

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জব চার্নক্ কলিকাতা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং বাংলায় ইংরেজগণের বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা একটি প্রেসিডেন্সি (Presidency) রূপে গণ্য হয় এবং বাংলায় ইংরেজ কুঠিসমূহের গভর্নর ও কাউন্সিল বিচারকের ক্ষমতা লাভ করেন। এই সময় হইতে কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর গ্রামের অধিবাসিগণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচারের জন্য ইংরেজের আদালতে উপস্থিত হইত। বর্ত্তমানে আমরা বৃটিশ ভারতে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতেছি, এইরূপেই তাহার সূত্রপাত হয়।

বাংলা প্রেসিডেন্সি

বিলাতে কোম্পানির কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য **অংশীদারগণের সভা** (House of Proprietors) এবং **ডিরেক্টরগণের সভা** (Court of Directors) নামে দুইটি সমিতি ছিল। প্রতি বৎসরে দুই তিন বার মাত্র অংশীদারগণ সম্মিলিত হইতেন। ডিরেক্টরগণের সভায় ২৪ জন সভ্য ছিলেন; তাঁহারাই প্রয়োজন অনুযায়ী সম্মিলিত হইয়া সারা বৎসর কোম্পানির কাজ চালাইতেন।

ডিরেক্টর সভা

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধ ও দেওয়ানি লাভ—কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োজন, প্রথমে তাহার অধিক ক্ষমতা ইংরেজগণ দাবি করে নাই। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার শাসনভার ক্রমে ক্রমে কোম্পানির হস্তগত হইল। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয়ের (১৭৬৪) পর বাংলার নবাবগণ (মীরজাফর ও তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা) সমস্ত ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া ইংরেজ বণিক্‌গণের হস্তে ক্রীড়নক হইলেন।

দেশের দুরবস্থা

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ কোম্পানির ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। তখন দেশের নিতান্ত দুরবস্থা। নবাব স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে অক্ষম; আর কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্বার্থ-সাধনের জন্য ব্যস্ত। প্রজার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার কেহই নাই। ক্লাইভ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, কোম্পানি যতদিন শাসন-কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিবে, ততদিন বিশৃঙ্খলা দূর হইবে না। কিন্তু বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার কোম্পানির ছিল না। বাংলা তখনও নামে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; সুতরাং দিল্লীর মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলমই বাংলার শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিবার অধিকারী। তখন ক্লাইভ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি* (অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার) লাভ করিলেন। নিজামৎ বা শাসন-বিভাগের ভার পূর্ব্ববৎ নবাবের উপরই রহিল।

দেওয়ানি লাভ

দ্বৈত শাসন

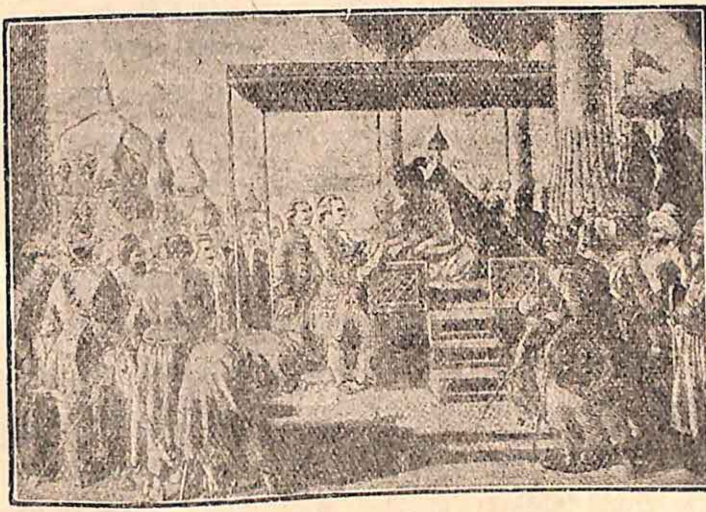
এই **দ্বৈত শাসন প্রণালী** (Double Government) প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলায় দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মুহম্মদ রেজা খাঁ নামক

---

* মুঘল আমলে প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে দুইজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। 'নাজিম' বা 'সুবাদার' সাধারণ শাসনকার্য্য পরিচালনা (অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা) করিতেন; 'দেওয়ান' রাজস্ব আদায় করিতেন। উভয়েই সাক্ষাৎভাবে সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। এই প্রথা অনুসারে শাহ্ আলম বাংলার নবাবকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নাজিমের পদে বহাল রাখিলেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এক ব্যক্তি নবাবের প্রতিনিধি (নায়েব নাজিম) পদে নিযুক্ত হইলেন ; কোম্পানিও স্বীয় কর্মচারিগণের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ না করাইয়া দেওয়ানি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিল। ফলে রেজা খাঁ বাংলার প্রকৃত শাসক হইলেন এবং সকলের উপর অত্যাচার করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া (১৭৭২) রেজা খাঁকে পদচ্যুত করেন এবং কোম্পানির কর্মচারিগণের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব বিস্তার—ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি যতদিন কেবলমাত্র বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, ততদিন বৃটিশ পার্লামেণ্ট্ ইহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু কোম্পানি যখন ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, তখন পার্লামেণ্ট্ আর উদাসীন থাকিতে



ক্লাইভের দেওয়ানি লাভ

পারিল না। বাংলায় কুশাসনের সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড্ নর্থের নেতৃত্বে **রেগুলেটিং অ্যাক্ট্** (Regulating Act) বা **নিয়ন্ত্রণ আইন** বিধিবদ্ধ হয়।* এই আইন নিয়ন্ত্রণ আইন

* ৩০১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অনুসারে কয়েক বৎসর শাসনকার্য্য পরিচালিত হইল; কিন্তু ইহাতে বাংলার গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হওয়ায় নানাবিধ অসুবিধার উৎপত্তি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তরুণ উইলিয়ম পিটের (William Pitt the Younger) নেতৃত্বে **ভারত শাসন সম্বন্ধীয়** এই আইন (India Act) পাশ হয়।* এই আইন অনুসারে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার উপর ভারতবর্ষ শাসনের প্রকৃত কর্তৃত্ব অর্পিত হইল। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী; সুতরাং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের আইন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টের

পিটের ভারত শাসন আইন

কর্তৃত্ব বদ্ধমূল হইল। সিপাহীবিদ্রোহের পর মহারাণীর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ (১৮৫৮) পর্য্যন্ত প্রায় ৭৪ বৎসর কাল পিটের আইন অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়।

কোম্পানির সনন্দসমূহ—রাজ্ঞী এলিজাবেথ লণ্ডন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ১৫ বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন। এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে কোম্পানি পুনঃ পুনঃ সনন্দ (charter) লাভ করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেছিল। ক্রমশঃ সনন্দ দানের ক্ষমতা রাজার হস্তচ্যুত হইয়া পার্লামেণ্টের হস্তগত হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট্ এক সনন্দ † দ্বারা বিশ বৎসরের জন্য কোম্পানিকে ভারতবর্ষ শাসন করিবার অধিকার প্রদান করে। ভারতবর্ষে অবস্থিত কোম্পানির রাজ্য ইংলণ্ডের রাজার অধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এক সনন্দ ‡ দ্বারা কোম্পানি আরও বিশ বৎসরের জন্য ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হয়। এই সনন্দ অনুসারে

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সনন্দ

বাংলার গভর্ণর-জেনারেল সমগ্র ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হইলেন; কিন্তু বাংলার শাসনভার তাঁহার উপরেই রহিল। এতদিন পর্য্যন্ত বোম্বাইর গভর্নর বোম্বাইর জন্য, মাদ্রাজের গভর্নর মাদ্রাজের জন্য এবং গভর্নর জেনারেল শুধু বাংলার জন্য শাসনসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (Regulations) বিধিবদ্ধ করিবার অধিকারী ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে সপারিষদ্ গভর্নর-জেনারেল (Governor-Generel-in-Council)

* ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † ৩২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ‡ ৩৩২-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্য আইন (Act), প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। আইন প্রণয়নের সুবিধার জন্য গভর্নর-জেনারেলের শাসন-পরিষদে (Council) একজন আইন-সচিব (Law-Member) নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু এই সচিবকে শাসনসম্বন্ধীয় অন্য কোন বিষয়সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হইল না।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ * দ্বারা কোম্পানি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইল। গভর্নর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের আইনসচিব আইন-প্রণয়ন ব্যতীত শাসন সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইলেন। আইন-প্রণয়নের সুবিধার জন্য শাসন-পরিষদকে প্রসারিত করিয়া এক **ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা** (Legislative Council of India.) গঠন করা হইল। এই সভায় গভর্নর-জেনারেল এবং শাসন-পরিষদের সভ্য-গণের সহিত আরও সাত জন অতিরিক্ত সভ্য যোগদান করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। একজন ভারতবর্ষের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, দ্বিতীয় জন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, তৃতীয় জন সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি এবং অবশিষ্ট চারিজন চারিটি প্রাদেশিক গভর্ন্‌মেণ্টের (বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ গভর্ন্‌মেণ্টের) মনোনীত প্রতিনিধি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গভর্নর নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপক সভা

মহারাণীর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ—সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট্‌ এক আইন দ্বারা কোম্পানিকে ভারতবর্ষের শাসনভার হইতে বঞ্চিত করে এবং রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার হস্তে উহা অর্পণ করে।† ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে পরিচিত একজন মন্ত্রী ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১৫ জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি পরিষদ (India Council) গঠিত হইল। ভারতবর্ষের গভর্নর-

ভারত সচিব ও তাঁহার পরিষদ্

* ৩৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। † ৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জেনারেল 'রাজ-প্রতিনিধি' (Viceroy) হইলেন। কোম্পানির সকল ক্ষমতা ও অধিকার বিলুপ্ত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে শাসন-সংস্কার—লর্ড ক্যানিঙের শাসনকালে **১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্স্ অ্যাক্ট্** * দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত সভায় বে-সরকারি সভ্য গ্রহণ করিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরগণও আইন প্রণয়নের সুবিধার জন্য স্ব স্ব শাসনপরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা (Provincial Legislative Council) স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স্ অ্যাক্ট্ † দ্বারা আইনসভাসমূহের সভ্য-সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার ‡—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা প্রবল আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের বেগ প্রশমিত করিবার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি (Lord Morley) এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টো পরামর্শ করিয়া এক সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হয় এবং বড়লাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই আইন দ্বারা ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসন পদ্ধতি (responsible government) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন

মণ্ট্যাগু-চেম্স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার—মর্লি-মিণ্টো সংস্কার ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের দাবি ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকারে ইংলণ্ডের সাহায্য করিয়া ইংরেজগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল।

* ৩৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † ৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ‡ ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন এক সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ভারত-সচিব মিঃ মণ্ট্যাগু এবং বড়লাট লর্ড্ চেম্স্‌ফোর্ডের নাম অনুসারে এই সংস্কার মণ্টাগু-চেম্স্‌ফোর্ড্, (বা মণ্ট্-ফোর্ড্) সংস্কার নামে পরিচিত। এই আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল এবং শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রিগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।* ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন

ভারত-শাসন আইন (১৯৩৫) মণ্ট্-ফোর্ড্ সংস্কারও স্বাধীনতা-কামী ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কয়েক বৎসরব্যাপী তুমুল আন্দোলন ও গোলযোগের পরে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এক সংস্কার আইন পার্লামেণ্ট্ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়।† ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই আইন অংশতঃ কার্য্যকর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারত সরকারের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। ফলে অধিকাংশ প্রদেশে গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। কেন্দ্রীয় শাসন সাধারণভাবে মণ্ট্-ফোর্ড্ সংস্কার আইন অনুসারে নির্ব্বাহ হইতে থাকে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী শাসনতন্ত্র

রাজা—ইংলণ্ডের রাজা ভারতবর্ষের সম্রাট্। তাঁহার নামে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইবে। তিনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ভারত-সচিব তাঁহার পরামর্শদাতা।

পার্লামেণ্ট্—ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত, এবং পার্লামেণ্ট্ ব্যতীত কাহারও উহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারত শাসনের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী।

ভারত-সচিব—(Secretary of state for India)—ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্য। ভারত শাসন সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারে

* ৩৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † এই সংস্কার আইনের বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তিনিই কর্তৃত্ব করিবেন। ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নরগণ অনেক বিষয়ে তাঁহার আদেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য থাকিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা (Advisers) থাকিবে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা—বৃটিশ-শাসিত ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনগত কোন্ সম্পর্ক ছিল না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে

যুক্তরাষ্ট্র

সম্মিলিত করিয়া এক যুক্তরাষ্ট্র (Federaton) গঠন করিবার ব্যবস্থা হয়। এই নূতন নীতি অনুসারে, যে কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা এক যোগদান পত্র (Instrument of Accession) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। তিনি যে সকল বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন, তাহা গভর্নর জেনারেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার কর্তৃত্বাধীন হইবে। দেশীয় রাজগণের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবেন।

কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে **গভর্নর-জেনারেল** রাজার প্রতিনিধি থাকিবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকরী (executive) ক্ষমতা ও অধিকার পরিচালনা

বড়লাট ও তদীয় মন্ত্রিসভা

করিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য দশ জনের অনধিক মন্ত্রী লইয়া একটী মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) গঠিত হইবে; মন্ত্রিগণ আইন সভার সভ্য হইবেন এবং উক্ত সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। দেশরক্ষা, খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেল মন্ত্রিগণের পরামর্শ না লইয়া বা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তিন জনের অনধিক উপদেষ্টা

রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ ও সম্মিলিত পরিষদ্

(Counsellor) নিযুক্ত করিতে পারিবেন। একটী রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ (Council of State) এবং একটী সম্মিলিত ব্যবস্থা পরিষদ্ (Federal Assembly) লইয়া আইন সভা (Legislature) গঠিত হইবে।

এই উভয় পরিষদে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজগণের প্রতিনিধিবর্গ আসন গ্রহণ করিবেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ২৬০ জন সভ্যের মধ্যে ১৫০ জন বৃটিশ ভারতের এবং ১০০ জন দেশীয় রাজগণের প্রতিনিধি হইবেন; বাকী ১০ জন গভর্নর-জেনারেল মনোনীত করিবেন। সম্মিলিত পরিষদের ৩৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৫০ জন বৃটিশ ভারতের এবং ১২৫ জন দেশীয় রাজগণের প্রতিনিধি থাকিবেন। উভয় পরিষদ্ সম্মিলিত গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন সহকারে আইন প্রণয়ন এবং শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত না হওয়ায় এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিল না। কিছুকাল পর্য্যন্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন (মণ্ট্-ফোর্ড্ সংস্কার) আংশিক ভাবে বলবৎ ছিল।*

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট্—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এগারটি প্রদেশে (বাংলা মাদ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম) প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (**Provincial Autonomy**) প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন **গভর্নর** শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। গভর্নরের কার্য্যে সাহায্য করিবার এবং তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটী মন্ত্রিসভা (**Council of Ministers**) থাকে। মন্ত্রিগণ গভর্নর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। সাধারণতঃ গভর্নর মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে চালিত হইতেন; কিন্তু আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, সংখ্যা-ন্যূন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে মন্ত্রিবর্গের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন।†

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

মন্ত্রিসভা

---

* ৩৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

† কয়েকটি প্রদেশ (বৃটিশ বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমের-মার্‌বাড়া, কুর্গ, এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ) চীফ কমিশনার শাসনাধীন ছিল। চীফ কমিশনারগণ গভর্নর-জেনারেলের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন।

অ্যাসেম্ব্লি ও কাউন্সিল

প্রত্যেক প্রদেশে একটি আইন সভা (Legislative Assembly) ছিল; বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে ব্যবস্থা-পরিষদ্ (Legislative Council) নামক অপর একটি উচ্চতর কক্ষ ছিল। আইন সভার সকল সভ্যই নির্ব্বাচিত; কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকজন গভর্নরের মনোনীত সভ্য ছিলেন। আইন সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদ্ গভর্নরের অনুমোদন সহকারে প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিত।

এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পরে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট্ কংগ্রেসের উত্থাপিত ভারতে জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক দাবি পূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। ফলে অনেকগুলি প্রদেশে গভর্নর বাহাদুরের স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবস্থাপরিষদ্ ও আইন সভা

বাংলার শাসন-ব্যবস্থা—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের (Legislative Council) সভ্যসংখ্যা অন্যূন ৬৩ এবং অনধিক ৬৫; আইন সভার (Legislative Assembly) সভ্যসংখ্যা ২৫০ মাত্র। ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে ১০ জন অ-মুসলমান, ১৭ জন মুসলমান এবং ৩ জন ইউরোপীয় সভ্য স্ব স্ব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত; ২৭ জন আইন সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত; ৬ জন কিম্বা ৮ জন গভর্নর কর্ত্তৃক মনোনীত। আইন সভার সভ্যগণের মধ্যে অ-মুসলমান ৭৮ জন (তন্মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ৩০ জন), মুসলমান ১১৭ জন, অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ৩ জন, ইউরোপীয় ১১ জন, ভারতীয় খৃষ্টান ২ জন, বণিক্-সমিতি প্রভৃতির প্রতিনিধি ১৯ জন, ভূম্যধিকারিগণের প্রতিনিধি ৫ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ২ জন, শ্রমিকগণের প্রতিনিধি ৮ জন এবং মহিলা ৫ জন।

ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা

ভারতবাসীর মনোভাব—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কোন কোন বিষয়ে দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত হইল বটে, কিন্তু মোটের উপর ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইল না। **কংগ্রেস্** * এই শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে

* ৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের নির্ব্বাচনে সাতটি প্রদেশে (বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) কংগ্রেসের সাফল্য দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণ কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপন্থার সমর্থক। উক্ত সাতটি প্রদেশ এবং আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর মন্ত্রিত্ব করিয়া কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন; কারণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট্ বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত কিনা সে সম্বন্ধে কোন সরকারি ঘোষণা প্রচার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজ' স্থাপনের দাবি করিতেছিল।

কংগ্রেসের প্রতিপত্তি

'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' (**Dominion Status**)—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বড়লাট লর্ড্ আরউইন ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন-নীতির চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন, "ভারতীয় শাসন-নীতির ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক পরিণতি—'ডোমিনিয়ন'-সমূহের (Dominion) সহিত তুল্যতালাভ।" ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি বড়লাট লর্ড্ লিন্‌লিথ্‌গো বাহাদুরও বলেন যে, ভারত অচিরে পূর্ণ স্ব-শাসক রাষ্ট্রের মর্য্যদা লাভ করিবে।

'ডোমিনিয়ন'-সমূহ (কানাডা, নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড্, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অস্‌ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড্ এবং আয়ার বা দক্ষিণ আয়র্লণ্ড্) বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও তাহারা পরস্পরের বা ইংলণ্ডের অধীন নহে; তাহারা কেবলমাত্র একই রাজার প্রতি আনুগত্যের বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট্ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন 'ডোমিনিয়ন'-সমূহের প্রতি প্রযোজ্য নহে, এবং রাজবংশের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে 'ডোমিনিয়ন'-সমূহের সম্মতি লইতে হয়। মোটের উপর 'ডোমিনিয়ন'-গুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা যায়।

ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কার পরিকল্পনা

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইন্‌স্টন চার্চ্চিলের নির্দ্দেশে সার স্ট্যাফার্ড্ ক্রিপ্‌স্ ভারতের শাসন সম্পর্কিত এক প্রস্তাব লইয়া এদেশে উপস্থিত হন। তাঁহার প্রস্তাবের বিষয় পূর্ব্বেই

উল্লিখিত হইয়াছে।* ভারতের নেতৃগণ ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার ভারতসচিব এমেরি একটি প্রস্তাব করেন। উহা আলোচনার জন্য বড়লাটের উদ্যোগে সিমলাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকের বিফলতার কথাও পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।†

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভারত-সচিব লর্ড্ পেথিক লরেন্স্, বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফার্ড্ ক্রিপ্‌স্ এবং ফার্স্ট্ লর্ড্ অব্ দি অ্যাড্‌মিরাল্টি এ. ভি. অ্যালেক্‌জাণ্ডার বৃটেনের নূতন শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের এই তিনজন সদস্য ভারতে আগমন করেন। ১৬ই মে এই মন্ত্রিমিশন বড়লাটের সহযোগিতায় যে নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, তদ্বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।‡ এই পরিকল্পনায় তিনটি প্রদেশমণ্ডল গঠনের কথা হয়। প্রথমটিতে মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা; ইহার প্রতিনিধি সংখ্যা ১৮৭; তন্মধ্যে মুসলমান ২০ এবং অন্যান্য ১৬৭। দ্বিতীয় প্রদেশমণ্ডলে পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু; ইহার ৩১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২২ জন মুসলমান এবং ৪ জন শিখ সহ ৯ জন অমুসলমান। তৃতীয় প্রদেশমণ্ডলে বাংলা ও আসাম; ইহার প্রতিনিধি সংখ্যা ৭০; তন্মধ্যে ৩৬ জন মুসলমান এবং ৩৪ জন অন্যান্য। দিল্লী, আজমের-মারবাড়া, কুর্গ ও বৃটিশ বেলুচিস্থানের এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া বৃটিশ ভারতের মোট প্রতিনিধি-সংখ্যা ২৯২ জন। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি-সংখ্যা সর্ব্বাধিক ৯৩ জন হইতে পারিবে। বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহারা ভারতের শাসনতন্ত্র সংগঠক পরিষদে (Constituent Assembly) সমবেত হইয়া দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। দেশীয় রাজ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। স্থির হইল যে, নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর যে ভারত গভর্নমেণ্ট্ গঠিত হইবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ উহার হস্তে ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবেন।

---

* ৩৭০-৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † ৩৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ‡ ৩৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ঐ ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে অস্থায়ী অন্তবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট্ গঠিত হয়, উহাতে কংগ্রেস দলের ৬ জন, মুস্লিম লীগ দলের ৫ জন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দল হইতে ৩ জন সদস্য লইবার ব্যবস্থা হয়। অতঃপর মুসলমান নেতৃগণের অনমনীয় মনোভাবের ফলে কিরূপে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভারত এবং পাকিস্থান নামক দুইটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র

বৈশিষ্ট্য—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র সংগঠক পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর উহার কার্য্য শেষ হয়। এইরূপে স্বাধীন ভারতের যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, উহা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই শাসনতন্ত্রে ভারতকে একটি সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক গণরাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়। অস্পৃশ্যতার বিলোপ এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সকলের সমান নাগরিক অধিকার স্বীকার এই শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন এবং গোহত্যা নিবারণের নীতিও স্বীকৃত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা রহিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিতে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে স্থান দেওয়া হয় নাই; কাহারও ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু কতিপয় অত্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আগামী দশ বৎসরের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় উহাদের প্রতিনিধির আসন সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরে এই ব্যবস্থা রহিত হইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সের সমুদয় নরনারীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র অনুসারে শতকরা প্রায় ৯০ জন ভারতবাসী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। দেশীয়রাজ্য ও উপজাতি

অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পাদনে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই শাসনতন্ত্রের কোন ত্রুটি দৃষ্ট হইলে উহা সহজে সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। প্রধান বিচারালয় রাষ্ট্রের অধীন নহে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কতকগুলি বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ভার কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত আছে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ে ভারতের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবে। এইদিক্ হইতে দেখিলে স্বাধীন ভারতকে একটি রাষ্ট্র মণ্ডল বলা যাইতে পারে। প্রদেশগুলিকে ষ্টেট বা রাষ্ট্র বলা হইবে।

কেন্দ্রীয় শাসন—স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যাপারের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইবেন **রাষ্ট্রপতি** বা প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্ট্ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের রাষ্ট্রসভা ও জনসভার নির্ব্বাচিত সভ্যমণ্ডলী এবং ষ্টেট্ (প্রদেশ) সমূহের ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন ও পাঁচ বৎসরকাল কার্য্য করিবেন। তাঁহাকে ভারতবাসী এবং তাঁহার বয়স অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর হইতে হইবে। শাসনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্য্য করিলে সেই অপরাধে পার্লামেণ্টে প্রেসিডেণ্টের বিচার হইতে পারিবে। প্রেসিডেণ্টের নিম্নে একজন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ বা উপাধ্যক্ষ থাকিবেন।

প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দেশের শাসনকার্য্য কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে প্রেসিডেণ্ট্ অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। জন প্রতিনিধিগণের আস্থা হারাইলে অথবা শাসন সম্পর্কিত কার্য্যে গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করা যাইবে। প্রেসিডেণ্ট্ মন্ত্রিগণকে অপসারিত করিতে পারিবেন। মন্ত্রীরা তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য জনপ্রতিনিধিগণের নিকটও দায়ী থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রসভা (Council of States) এবং জনসভা (House of the People) নামক দুইটি পরিষদ্ থাকিবে। রাষ্ট্রসভায় সর্ব্বাধিক ২৫০ জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ১২ জন প্রেসিডেণ্ট্ কর্ত্তৃক

মনোনীত হইবেন এবং ২৩৮ জন প্রদেশসমূহের প্রতিনিধি হইবেন। প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। যে সকল প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ্ দুই কক্ষ সমন্বিত, সেখানে উভয় কক্ষের সদস্যেরাই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবেন।

কেন্দ্রীয় জনসভায় ৫০০ সদস্য থাকিবেন এবং ইহারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ ভারতবাসীর জন্য জনসভায় একজন করিয়া নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন। এই উভয় পরিষদে যে সকল ব্যবস্থা পাশ হইবে উহা প্রেসিডেণ্টের সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইবে।

প্রাদেশিক শাসন—কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের ন্যায় প্রদেশসমূহেও একজন শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রিমণ্ডল এবং ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। বাংলা (অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা), মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ এবং পূর্ব্ব পঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদ আপাততঃ দুই কক্ষ বিশিষ্ট হইবে। এই প্রদেশগুলিতে ব্যবস্থা পরিষদ্ (Legislative Council) নামে একটি উচ্চতর কক্ষ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত সমুদয় প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly) থাকিবে। প্রতি প্রদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে। প্রদেশসমূহের ব্যবস্থাপক সভায় ৬০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত সদস্য থাকিবেন। প্রতি ৭৫০০০ বয়স্ক নরনারীর একজন করিয়া প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন।

Model Questions

1. Review the growth of British administration in India.
2. Summarise the provisions of the Reform Acts of 1909, 1919 and 1935.
3. Give an account of the constitution of the Independent Democratic Republic of India passed by the Constituent Assembly in November, 1949.
4. Write notes on :—Dominion Status, Charters of the East India Company.

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের উন্নতি

শিক্ষার উন্নতি—জনৈক লেখক বলিয়াছেন, "প্রাচ্য দেশে ইংলণ্ড শিক্ষাদান কার্য্যকে ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; বস্তুতঃ শিক্ষাদান ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা। ইংলণ্ড যে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাই যে প্রধান, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।"

বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ন্‌মেন্টের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওয়ারেন হেস্‌টিংস্ আর্‌বি ও ফার্‌সি ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক সার উইলিয়ম জোন্‌স্ **এশিয়াটিক সোসাইটি** (Asiatic Society)* স্থাপন করেন। এই সভার সভ্যগণ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত, আর্‌বি, ফার্‌সি প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের জন্য গভর্ন্‌মেন্ট্ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। লর্ড্ উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময়ে লর্ড্ মেকলে, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষীর চেষ্টায় ভারতবাসীদিগকে **পাশ্চাত্য** ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড্ অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্ল্‌স্ উড্ শিক্ষাবিষয়ক এক বিবরণী (Education Despatch) প্রেরণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে **বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়। লর্ড্ রিপনের সময়ে শিক্ষাবিষয়ে পরামর্শদানের জন্য **হাণ্টার কমিশন** নিযুক্ত হয়। লর্ড্ কার্জ্জন্ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের জন্য এক আইন প্রবর্ত্তন করেন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের রক্ষা ব্যবস্থা করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণার পথ সুগম করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য **স্যাড্‌লার কমিশন** নিযুক্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্ট্যাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড

এশিয়াটিক সোসাইটি

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়

---

* বর্ত্তমানে ইহা Royal Asiatic Society of Bengal নামে পরিচিত।

সংস্কার আইন অনুসারে শিক্ষাবিভাগের ভার প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীর উপর অর্পণ করা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারেও শিক্ষাবিভাগের ভার প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীর উপরে অর্পিত হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার উন্নতির পথ সুগম হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। শিক্ষামন্ত্রী

ইংরেজ রাজত্বকালে আমাদের দেশে নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাতৃভাষা এবং সাধারণ অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য গ্রামসমূহে **পাঠশালা** স্থাপিত হয়। কোন কোন প্রদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য **মধ্যবাংলা বিদ্যালয়, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়** এবং **উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়** স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু **কলেজ** ও **বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও প্রচুর পরিমাণে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। শিল্পশিক্ষার জন্য **এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজ** এবং অন্যান্য নানাবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য **মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ** এবং আইন শিক্ষার জন্য **আইন কলেজ** স্থাপিত হয়। সামরিক শিক্ষার জন্য যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত দেরাদুনে একটি **সামরিক বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে **কৃষি কলেজ** স্থাপিত হয়। শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে সরকারি এবং অন্যান্য স্থানে বে সরকারি **শিল্পকলা** বিষয়ক **বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা

কেবল স্কুল ও কলেজে পাঠ করিলেই জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয় না। যাহাতে ভারতবাসীর দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং সত্যানুসন্ধানের সুযোগ সহজলভ্য হয়, সেজন্য গভর্নমেণ্ট্ নানাস্থানে **পুস্তকাগার, মিউজিয়ম** প্রভৃতি স্থাপন করেন। কলিকাতায় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী নামে একটি প্রকাণ্ড সরকারি পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের

লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম

জরিপ বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—দারিদ্র্যই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। দারিদ্র্য নিবারণের জন্য ইংরেজ গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক কৃষিজীবী; সুতরাং কৃষির উন্নতির প্রতি গভর্ন্‌মেণ্টের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। **কৃষি** সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য দিল্লীতে একটি সমিতি (Imperial Council of Agricultural Research) স্থাপিত হয়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য নানা স্থানে খাল ও কূপ খনন করিয়া জলসেচনের বন্দোবস্ত করা হয়। কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হয়। দরিদ্র কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবার জন্য বহু সমবায়-সমিতি ও কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কৃষিশিক্ষার জন্য নানা স্থানে কলেজ স্থাপনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কৃষির উন্নতি

দেশীয় **শিল্পের উন্নতি** সাধন গভর্ন্‌মেণ্টের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিল্প শিক্ষার জন্য নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ শুল্ক-নির্দ্ধারণ-সমিতির (Tariff Board) সাহায্যে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী স্থাপন করিয়া গভর্ন্‌মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ লোকশিক্ষা ও শিল্পিগণের উৎসাহবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন।

শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি

জনসাধারণকে **মিতব্যয়িতা** শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ অধিকাংশ ডাকঘরে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক্‌ (Savings Bank) স্থাপন করেন। সমবায় আন্দোলনের (Co-operative Movement) উন্নতির ফলেও দেশবাসী ক্রমশঃ মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী হইতে থাকে।

বৈষয়িক উন্নতি—ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ। এখানে শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার উন্নতি করিতে হইলে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বতন হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণ বহু রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সমগ্র দেশের অভাব পূরণ করিতে পারেন নাই। বৃটিশ গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ বহু **রাজপথ** এবং **সেতু**

যাতায়াতের সুবিধা

নির্ম্মাণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতবর্ষে **রেলপথ** নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইংরেজ রাজত্বকালে এ দেশে কিঞ্চিদধিক ৩৯ হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে **মোটর** গাড়ির প্রচলন হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়। **এরোপ্লেন** আবিষ্কারের ফলে দূরত্ব-জনিত অসুবিধা প্রায় লুপ্ত হয়। রেলগাড়ি, মোটর ও এরোপ্লেন

কেবল যে যাতায়াতের সুবিধা হয় তাহা নহে; সংবাদ আদান-প্রদানেরও সুবন্দোবস্ত হয়। লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর সময়ে প্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। ক্রমে ভারতবর্ষে প্রায় ১১ হাজার **টেলিগ্রাফ** আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় বড় শহরে **টেলিফোন** ব্যবহার প্রচলিত হয়। আবার বিনাতারে সংবাদ প্রেরণেরও বন্দোবস্ত হয়। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে বহু **কল-কারখানা** স্থাপিত হয়। দেশের নানা স্থানে কাপড়ের কল, পাটের কল, পশমিবস্ত্র নির্ম্মাণের কল, চাউলের কল প্রভৃতি স্থাপিত হয়। **খনির ব্যবসায়** ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাকে। এই সকল কল-কারখানায় ও খনিতে যে সকল মজুর কাজ করিত, তাহাদের সুবিধার জন্য গভর্ন্‌মেণ্ট্ নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। **পতিত জমি আবাদ** করিবার জন্য গভর্ন্‌মেণ্ট্ জনসাধারণকে নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করেন। **বনরক্ষার** জন্য বহু আইন প্রণীত হয় এবং গভর্ন্‌মেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয়। দেশের **স্বাস্থ্যের উন্নতি ও মহামারীর প্রতিকার** করিবার জন্য গভর্ন্‌মেণ্ট্ বহু হাসপাতাল স্থাপন করেন। পশু-চিকিৎসা এবং উন্মাদ ব্যক্তিগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য সুবন্দোবস্ত হয়। ইংরেজ আমলের শেষদিকে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের ভার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী দেশীয় মন্ত্রীর উপর অর্পিত হয়।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

কল-কারখানা

পতিত জমি ও বন

চিকিৎসা ব্যবস্থা

Model Questions

1. Give an account of the material progress of the Indian people under British rule.

2. Sketch the progress of European education in India.

———

ইংরেজ আমলের শাসনকর্ত্তৃগণ

(১) বাংলার গভর্নর

লর্ড্ ক্লাইভ ...	১৭৬৫-৬৭	কার্টিয়ার ...	১৭৬৯-৭২
ভেরেলস্ট্ ...	১৭৬৭-৬৯	ওয়ারেন হেস্টিংস ...	১৭৭২-৭৪

(২) বাংলার গভর্নর জেনারেল

(লর্ড্ নর্থের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট্' অনুসারে)

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ...	১৭৭৪-৮৫	*সার জর্জ্জ্ বার্লো ...	১৮০৫-০৭
*সার জন ম্যাক্ফার্সন	১৭৮৫-৮৬	প্রথম লর্ড্ মিণ্টো ...	১৮০৭-১৩
লর্ড্ কর্ণ্ওয়ালিস্ ...	১৭৮৬-৯৩	লর্ড্ ময়্রা (লর্ড্ হেস্টিংস্)	১৮১৩-২৩
সার জন শোর ...	১৭৯৩-৯৮	*জন অ্যাডাম্ ...	১৮২৩
*সার এ. ক্লার্ক্ ...	১৭৯৮	লর্ড্ আম্হার্স্ট্ ...	১৮২৩-২৮
লর্ড্ ওয়েলস্লি ...	১৭৯৮-১৮০৫	*উইলিয়ম্ বাটার্ওয়ার্থ্ বেইলি	১৮২৮
লর্ড্ কর্ণ্ওয়ালিস ...	১৮০৫	লর্ড্ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ...	১৮২৮-৩৩

(৩) ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল

(১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে)

লর্ড্ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ...	১৮৩৩-৩৫	*উইলিয়ম্ বার্ড্ ...	১৮৪৪
*সার চার্ল্স্ মেট্কাফ্ ...	১৮৩৫-৩৬	প্রথম লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ ...	১৮৪৪-৪৮
লর্ড্ অক্ল্যাণ্ড্ ...	১৮৩৬-৪২	লর্ড ডাল্হৌসী ...	১৮৪৮-৫৬
লর্ড্ এলেন্বরা ...	১৮৪২-৪৪	লর্ড্ ক্যানিং ...	১৮৫৬-৫৮

*অস্থায়ী

(৪) ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়

(১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে)

লর্ড্ ক্যানিং ...	১৮৫৮-৬২	দ্বিতীয় লর্ড্ মিণ্টো ...	১৯০৫-১০
প্রথম লর্ড্ এল্গিন্ ...	১৮৬২-৬৩	দ্বিতীয় লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ ...	১৯১০-১৬
*লর্ড্ নেপিয়ার ...	১৮৬৩	লর্ড্ চেম্স্ফোর্ড্ ...	১৯১৬-২১
*সার উইলিয়াম ডেনিসন্	১৮৬৩	লর্ড্ রেডিং ...	১৯২১-২৬
লর্ড্ লরেন্স্ ...	১৮৬৪-৬৯	লর্ড লিটন্ ...	১৯২৫
লর্ড্ মেয়ো ...	১৮৬৯-৭২	লর্ড্ আরউইন্ ...	১৯২৬-৩১
লর্ড্ নর্থব্রুক্ ...	১৮৭২-৭৬	*লর্ড্ গোসেন্ ...	১৯২৯
লর্ড্ লিটন্ ...	১৮৭৬-৮০	লর্ড্ উইলিংডন্ ...	১৯৩১-৩৬
লর্ড্ রিপন্ ...	১৮৮০-৮৪	*সার জর্জ্জ্ ষ্টান্লি ...	১৯৩৪
লর্ড্ ডফ্রিন্ ...	১৮৮৪-৮৮	লর্ড্ লিন্লিথ্গো ...	১৯৩৬-৩৮
লর্ড্ ল্যান্স্ডাউন্ ...	১৮৮৮-৯৪	*লর্ড্ ব্রাবোর্ন্ ...	১৯৩৮
দ্বিতীয় লর্ড্ এল্গিন্ ...	১৮৯৪-৯৯	লর্ড্ ওয়েভেল্ ...	১৯৪৩-৪৭
লর্ড্ কার্জ্জন্ ...	১৮৯৯-১৯০৫	*সার জন্ কল্ভিল্ ...	১৯৪৫, ১৯৪৬
*লর্ড্ এম্প্টহিল্ ...	১৯০৫	লর্ড্ মাউণ্ট্ ব্যাটেন ...	১৯৪৭

(৫) ক। ইণ্ডিয়া ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেলগণ

লর্ড্ মাউণ্ট্ ব্যাটেন ...	১৯৪৭-৪৮
চক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারী ...	১৯৪৮-৫০

(৫ খ। পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেলগণ

কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্না ...	১৯৪৭
খাজা নাজিমুদ্দীন ...	১৯৪৭-১৯৫১

* অস্থায়ী

পরিশিষ্ট (ক)

কয়েকটি ঐতিহাসিক সমস্যা.

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা

নানাকারণে পৃথিবীর মৃৎপৃষ্ঠের উপর নূতন মৃত্তিকাস্তর সঞ্চিত হয়। ঐ প্রকার একটি স্তর সঞ্চিত হইতে শত শত বৎসর লাগিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নের কোন স্তরটি কতকাল পূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়াছিল, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার একটি আনুমানিক হিসাব দিতে পারেন। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনসমূহ মৃত্তিকার যে নিম্নস্তরে পাওয়া গিয়াছে, মার্শাল প্রমুখ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে উহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫০ হইতে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই সময়ে ঐ স্তরই ভূপৃষ্ঠ ছিল। এক সময়ে যে স্থানে সমৃদ্ধ জনপদ ও নগর ছিল, কালক্রমে উহা জনমানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়। সিন্ধি ভাষায় মোহেঞ্জো-দড়ো কথার অর্থ "মরার ঢিবি"। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্ববিধানে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়কতায় এই স্থানে খননকার্য্য (excavation) আরম্ভ হইয়াছিল। মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে প্রাপ্ত সীলগুলির উপরে লিখিত লিপি আজ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন পণ্ডিত ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেছেন; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন পরিচিত বর্ণমালার অক্ষরের সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া ঐ লিপির অক্ষরের উচ্চারণ ও অর্থ নির্ণয় সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ দাবির কোনই মূল্য নাই।

Dr. Ernest Mackay প্রণীত *The Indus Civilization* নামক গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

'মহাকাব্য'—রামায়ণ ও মহাভারত

হোমার-রচিত 'ইলিয়াড্', 'অডিসি' প্রভৃতির অনুকরণে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'কে ইংরেজিতে epic বলা হয়; এই ইংরেজি শব্দের বাংলা করা হয় 'মহাকাব্য'। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা অনুসারে এই দুইখানি গ্রন্থ মহাকাব্য নহে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রমতে 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি মহাকাব্য। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' এবং অলঙ্কারবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত আছে।